উচ্চতর মাধ্যমিক "Social Studies"-এর পাঠ্যতালিকা অনুসারে লিখিত

আমাদের সমাজজীবন

(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

[নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীসুনীলকুমার সেন, এম. এ.

অধ্যাপক, বসিরহাট কলেজ ; ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোহর। ভারতবর্ষের ইতিহাস (নবম ও দশম শ্রেণী), ভারতের শাসন ব্যবস্থা (নবম ও দশম শ্রেণী) প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা

ও

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল, এম. এ., বি. টি., ডি. এস. ই

প্রধান শিক্ষক, চক্রবেড়িয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভবানীপুর, কলিকাতা

—প্রাপ্তিস্থান—

বীর নরেন্দ্র লাইব্রেরী

২১, পটুয়াটোলা লেন,

কলিকাতা-৯।

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
২১, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
চতুর্থ সংস্করণ—১৯৬০

মূল্য ৪·৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রক :
শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯।

There is only one man in the world
and his name is All Men.
There is only one woman in the world
and her name is All Women.
There is only one child in the world
and the child's name is All Children.

—Carl Sandburg

দুনিয়ায় একটি মাত্র পুরুষ বর্তমান
তার নাম সর্ব পুরুষ।
দুনিয়ায় একটি মাত্র নারী বর্তমান
তার নাম সর্ব নারী।
দুনিয়ায় একটি মাত্র শিশু বর্তমান
তার নাম সব শিশু।

—কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আজ হইতে তিন বছর আগে অনেক দ্বিধা এবং সংশয়ের সঙ্গে "আমাদের সমাজজীবন" লিখিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, এই বছর আমাদের বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। নূতন সংস্করণে বইটির সকল খণ্ডের এবং বিশেষ করিয়া প্রথম খণ্ডের বহু স্থানে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিয়াছি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা দয়া করিয়া যে সব মূল্যবান পরামর্শ এবং সমালোচনা পাঠাইয়াছেন, উহাদের ভিত্তিতেই বইটির পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হইয়াছে।

সমাজবিদ্যা সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথা উত্থাপন করা প্রয়োজন মনে করি। সমাজবিদ্যার একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে। সমাজবিদ্যার লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎকে বুঝিতে ও জানিতে সাহায্য করা। A. Binning এবং D. Binning নামে সমাজবিদ্যার বিশেষজ্ঞদ্বয় লিখিয়াছেন: "The materials of the social studies provide the basis for making the world of today intelligible to the pupils"। সমাজবিদ্যার পাঠক্রমে তাই পৃথিবীর নানা লোকসমাজের বিচিত্র জীবনযাত্রা, ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, ভারতের রাষ্ট্র এবং নাগরিকতা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই সকল বিষয় তো ভূগোল, ইতিহাস এবং পৌরবিজ্ঞানের বইতে পড়িতে পারি। তাহা হইলে সমাজবিদ্যা পড়িবার প্রয়োজন কি? সমাজবিদ্যা পড়িবার প্রয়োজন এইখানে যে, উহার সাহায্যে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পড়িতে পারি। সমাজবিদ্যায় আমরা ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়িব। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে যে অসংখ্য ঘটনা-সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাস আছে, সমাজবিদ্যার বইতে আমরা কিন্তু তাহা পড়িব না। আমরা রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিব এবং সেই সঙ্গে

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজজীবনের নানা সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইতিহাসের সমস্যা অবশ্য ছকে বাঁধা নয়। আলোচনার মাধ্যমে নূতন নূতন সমস্যা বাহির করা সম্ভব। সমস্যা বাহির করা এবং উহার সমাধান করার উপর সমাজবিদ্যা পড়ানোর সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ছাত্রদের মনে কৌতূহল জাগে।

তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই বই সমাজবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন খণ্ডে, বিশেষ করিয়া ইতিহাস এবং পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় বার বার আমরা নানা সমস্যা তুলিয়াছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী দিয়াছি।

আমরা পরিশেষে আবার পূর্বের মত পরামর্শ এবং সমালোচনা পাঠাইতে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানাইতেছি। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তাই সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা আশা করি যে, পূর্বের মত এই বছরও এই বই ছাত্রছাত্রীদের ভাল লাগিবে।

সুনীলকুমার সেন
জ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, WEST BENGAL

Higher Secondary Course

SYLLABUS

SECTION 1 : Living in Communities

(a) Living in the Local Community in our own land : How does the Community help us to meet our primary needs of food, dress, shelter ?

(i) Food-gathering Economy :

The Andamanese country and the people—fishing and hunting—collection of roots and leaves from the jungle—houses and settlements—dress, utensils, weapons—family and group life—religion, music and dancing.

(ii) Pastoral Economy :

The farmers and pastoral people of the Almora Hills—the seasonal migration—moving with the cattle—temporary shelters and permanent villages—fairs and market scenes.

(iii) Agriculture :

Cultivation of rice and jute in the south in Bengal ; plantations and forestry in the north. The country where rice and jute are grown—food and clothing in the plains—transport by bullock carts or boats in the first stage—the sale and uses of jute and foodcrops—life in the villages of Lower Bengal. Plantation and manufacture of tea in the North—scenes and life in a tea-garden—villages and towns in the hills—forests and their uses—floating down timber to the plains.

(iv) Industries in Bengal :

Coal mining in the Asansol area—scenes in the iron works in Burnpore—Chittaranjan and the manufacture of railway engines and wagons—engineering works in Calcutta and Howrah—

the organisation of rail and road transport—the port of Calcutta—the scattered small workshops—the new constructions in the DVC area. Contrast between an old town like Howrah and a new town like Chittaranjan.

(v) Villages and Towns in our country :

Scattered villages of Lower Bengal or Kerala—compact villages of the Uttar Pradesh or the Punjab—different kinds of towns—our houses. Market villages—villages with crafts like weaving or pottery. Fairs in the country-side for buying and selling of grains, cattle, cloth, implements, building materials, fineries, etc. How villages grow larger and may fuse into towns. Story of the growth of Calcutta from three small villages.

(*b*) Living in Different Regional Communities in foreign lands—(Not more than four foreign regional communities out of the eight below are to be studied) :

(i) A collective reindeer farm in North Siberia
(ii) A Malayan Community
(iii) A Community on the Bank of the St. Lawrence
(v) A Dutch Community near Zuyder Zee
(v) A North Chinese Community
(vii) Cattle and Wheat farming in the American Priaries
(vii) A Mining Community in West Australia
(viii) An Industrial Community in the Rhineland.

SECTION II : Indian culture and Contacts with the World (a review of the broad currents and significant epochs of Indian cultural evolution ; a political framework will be used only to the extent necessary to preserve continuity and the time-sequence).

(i) Basic factors in history : man and his environment—the physical features of India and the influence of geography on Indian history. Different races, languages, religions, ways

of life as well as common features. Unity in diversity in India.

(ii) Types of source-material : archaeological relics, inscriptions and coins, literary records, travel-accounts.

(iii) Our pre-historic ruins : the story of important discoveries—the romance of archaeology—the Indus Valley Culture.

•(iv) The Aryan Vedic Civilization : society, literature, religion—inter-actions with non-Aryan cultures—the emergence of the Great Epics and the social and institutional changes represented in them.

(v) Two great new religions : Buddhism and Jainism—their main teachings and importance in Indian history—the evolution of Buddhism and its advance into foreign lands.

(vi) The Maurya Age : the greatness of Asoka in history—inscriptions of Asoka—Maurya society and culture—Megasthenes' account.

(vii) The Persian and Greek impacts on India : extent and importance of Indo-Greek intercourse—the Greeks in the borderlands of India--the Indian contacts with the Roman Empire—the question of Hellenic influence on India and Indian influence on the Classical World.

(viii) The Age of Transition : the evolution in the five centuries after Asoka—art and literature, society and religion, trade and economic conditions—the reign of Kanishka—the Såkas and other foreigners in the border-country.

(ix) The Gupta Age : society and religion, art and literature, economic conditions, administration—the Hunas and the fall of the Gupta Empire—Harsha and his times—the Chinese travellers Fa-hien and Hiuen Tsang.

(x) Early History of Bengal : social, economic, and cultural life from the Guptas to the age of the Palas and the Senas.

(xi) South Indian History : early kingdoms and settlements—art and culture under the Pallavas, the Chalukyas, the Cholas—trade and economic conditions and activities—Hindu revivals from the South.

(xii) Indian Culture Abroad : Indian maritime and commercial activity—religious missions—colonial enterprise and cultural expansion.

(xiii) The Rajputs in Indian History : origins and activities —the dynastic struggles and disunion. Coming of Islam to India. The nature of the Muslim Conquest. Alberoni's account.

(xiv) Society and Culture in Early Muslim Days : the Sultanate of Delhi and conditions under it—the interaction between Hindu and Muslim cultures—conditions in the provincial regions, especially in Bengal and Vijayanagar.

(xv) The Mughal Empire : the importance of Akbar— the Mughal system of administration—art and architecture —society and economic conditions—literature—foreign travellers.

(xvi) The fall of the Mughal Empire : the advent of the Europeans—the rise and fall of the Maratha, Mysorean, and Sikh powers—life and conditions in the 18th century.

(xvii) The building-up of the British Power in India— landmarks in the process of conquest—the administrative organisation—the relation with the Home Government—popular struggles against the British—the Revolt of 1857.

(xviii) British impact on Indian economy—the destruction of the old order—the land settlements—changes in trade, transport, industry—modernisation in the economic life of the country sets in as a process.

(xix) The Western Cultural impact on India—the 19th century awakening in Bengal and elsewhere—liberal and scientific education from the West—creative literature and learning— social reform—religious reform—modern thought and outlook in the country.

(xx) The National Movement and Liberation—national consciousness in early 19th century—genesis of national movements and agitations—the birth of the National Congress and early leaders—gradual growth of a left Nationalism—Bengal's swadeshi upsurge—revolutionary terrorism—the impact of Gandhiji and his movement—the struggle for independence and its achievement. The Task Ahead—peace and prosperity for the

people—national reconstruction and a Welfare State—a socialist pattern of society as the goal.

SECTION III : Citizenship and Government :

(a) Life in the Family and in a locality—how we need the inner circle of the family and relations and the outer circle of different associations—what we learn from family life and the life in the associations—the elements of the good life and the qualities essential for developing such life.

(b) The Health of the Community—civic virtues and duties—the necessary provisions and amenities for the maintenance of public health and prevention of disease. Recreation and Culture of the Community—organisations and activities of different types. Education.

(c) The people and its government—elections from time to time in modern communities—the right to vote and participate in public affairs—parties and what they want—freedom of the press, expression, and association and consequent responsibilities—political life in a modern community. Ideals of a democratic society. Democratic conduct in everyday life.

(d) Organisation of local Administration—the Corporation in Calcutta—the Municipalities in the Towns—local self-government and local authorities in the districts and the countryside—*Modern Community Development activities.* The Protection of the Community and the necessary organisation for it.

(e) Democratic Government in our States and in the Indian Union—how Govt. is carried on ; the processes of deliberation, legislation, adjudication, and routine administration—the division of work between the Centre and the States—the various organs in the governmental system in India.

(f) Contacts with the Outside World—political, economic, and cultural contacts and the agencies for the same—Indian foreign policy—aims of peace and good will—the UNO and the ideals of moving towards a World Community.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

আমাদের সমাজজীবন

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

লোকসমাজের জীবনযাত্রার ধারা

একেবারে সুরুতে আমাদের এই পৃথিবীর এমন অবস্থা ছিল যে, তাহাতে কোন রকম প্রাণীর পক্ষেই বাস করা সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া বহু পরিবর্তন হইবার ফলেই পৃথিবীর বুকে প্রথম জীবনের সূচনা হইল। ক্রমশ দেখা দিল ছোট ছোট গাছ-গাছড়া, লতাপাতা এবং পোকামাকর। তারপর আরও লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্রমশ বড় বড় গাছপালা এবং নানা রকম জন্তু-জানোয়ারে পৃথিবী ভরিয়া উঠিল। এই সব প্রকাণ্ড জন্তু-জানোয়ার আজ আর বাঁচিয়া নাই, কিন্তু ইহাদের কিছু কিছু কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা দেখিয়া জানিতে পারা যায় যে, একসময় তাহারা পৃথিবীর বুকে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। কলিকাতার যাদুঘরে এইরূপ কঙ্কাল রক্ষিত আছে।

প্রায় একশত বৎসর হইল, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডারউইন আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ বানর এবং বানরই বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছে। বানরের অবস্থা হইতে বহু চেষ্টা, বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আদিম যুগের সেই মানুষ আজিকার সুসভ্য মানুষে পরিণত হইয়াছে। ডারউইনের এই মতকে বলে 'প্রাকৃতিক বিবর্তনের তত্ত্ব'। এই বিবর্তনের মূলে আছে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য চারিদিকের অবস্থা বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের নিরন্তর

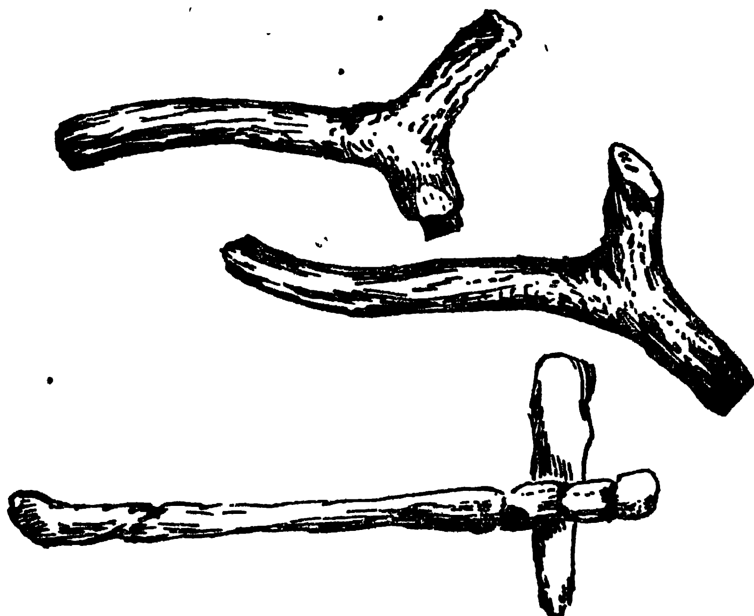
কঠোর সংগ্রাম। ডারউইন বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাণীই পারিপার্শ্বিকের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে সংগ্রাম করিয়া মানুষ এবং সমস্ত প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে।

আদিম যুগের জীবনযাত্রা

আদিম যুগে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। খাদ্য-সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার জন্য ইহা তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। দলবদ্ধ হইয়া বাস না করিলে মানুষ আহার সংগ্রহ করিতে পারিত না, কিংবা জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রবে টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রথম হইতে মানুষ নানা রকম হাতিয়ার প্রস্তুত করিতে শেখে। হাতিয়ার গড়িবার কৌশল আয়ত্ত করা মানুষের প্রথম বিশেষত্ব। প্রথম হাতিয়ার পাথরে প্রস্তুত হইত। প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ারগুলি তিনকোণা; মোটা দিক্‌টা ধরিবার জন্য, সরু দিক্‌টা কাজ সারিবার অস্ত্র। এই হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ হরিণ প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার শিকার করিত। মানুষ এইবার দলবদ্ধ হইয়া **শিকারী সম্প্রদায়** গড়িতে লাগিল। মানুষের সবচাইতে পুরানো সমাজ শিকারী দলগুলি। মানুষ ক্রমে হাতিয়ারের উন্নতি করিতে লাগিল। পাথরের ছুরি, বর্শার ফলা প্রভৃতি তৈয়ার হইল। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রথম বাহাদুরি আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার। চকমকি পাথর ঠুকিতে ঠুকিতে অথবা শুকনো কাঠে কাঠে ঘষা দিতে দিতে মানুষ একদিন আগুন আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং এই আগুনে সে তাহার খাবার রান্না করিতে শিখিল। ফলমূল ছাড়া মাংসও হইল মানুষের নিয়মিত খাদ্য; রাঁধিবার কৌশলেরও সূত্রপাত হইল।

ইউরোপে চার বার বরফের রাজত্ব চলে। চতুর্থ বার বরফ সরিয়া যাইবার পর ইউরোপে যে আবহাওয়া আসিল, এখন পর্যন্ত মোটামুটি

সেই আবহাওয়া চলিতেছে। চতুর্থ বার বরফ সরিয়া গেলে চতুর্দিকে দেখা দিল বরফ-গলা দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি। মানুষের জীবনেও আসিল পরিবর্তন। শিকারীর জীবন আর চলিল না, শিকারীর দলের স্থলে বিভিন্ন অঞ্চলে **মৎস্যজীবী দল** দেখা দিল। জলরাশির মধ্যে অফুরন্ত মাছ; এই মাছ হইল মানুষের খাদ্য। জলের ধারে ধারে মানুষ



হরিণের শিং ও পাথরের কুড়ুল

ঘর বাঁধিল। জলের জন্য ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইবার পথেও বাধা ছিল। অনেক জায়গায় হ্রদের মাঝখানে কাঠ পুঁতিয়া মানুষ তাহার উপর ঘর বানাইল। মনে হয়, খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের জন্যই মানুষ স্থির হইয়া বসিয়া লোকালয় গড়িতে শিখিল। শিকারের জন্য বনে বনে যাযাবর জীবন যাপন না করিয়া জলের ধারে ধারে মানুষ দলবদ্ধ

হইয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় নূতন হাতিয়ারের সৃষ্টি হয়। ঘর বাঁধিবার জন্য দরকার ছিল গাছ কাটিবার, আবার জলের মধ্যে যাতায়াতের জন্য নৌকার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন পূরণের জন্যই পাথরের কুড়ুল অথবা করাতের সৃষ্টি। হাতল ঢুকাইবার জন্য কুড়ুলের পাথরে ফুটা করিবার কৌশলও মানুষ এই সময়ে আয়ত্ত করিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগ শেষ হইল; সুরু হইল পাথর-ঘষা হাতিয়ারের নূতন যুগ।

স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিবার ফলে মানুষের মনে চাষের ধারণা আসে। মেয়েরা ঘরের কাছে মাটি খুঁড়িয়া জংলী মূল সংগ্রহ করিয়া



আদিম লাঙল। নীচে: আদিম যুগের জাঁতা

সেই মূল আবার মাটিতে পুঁতিয়া বেশী পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনের কৌশল শিখিল। বনে বনে ঘুরিয়া খাদ্য সংগ্রহের চাইতে এই প্রথা অনেক সহজ এবং উন্নত। চাষবাসের সূত্রপাত এইভাবে। কুড়ুলের মত আর একটি হাতিয়ার সৃষ্টি হইল—কোদাল। অনেক দিনের

অনেক পরিশ্রমের ফলে মানুষ ক্রমে গম, যব প্রভৃতি উৎপাদন করিতে শিখিল। এইভাবে শিকারী সমাজ এবং পরে মৎস্যজীবী সমাজের স্তর পার হইয়া মানুষ **কৃষিজীবী সমাজের** স্তরে পৌছিল। মানুষকে এখন আর শিকার অথবা মাছ ধরার উপর নির্ভর করিতে হইত না। মানুষ ক্রমে পশুপালন শিখিল। ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি ছোট ছোট পশুই প্রথম গৃহপালিত পশু। গৃহপালিত পশুর আদব ছিল খুব বেশী, ইহা হইতে তাহারা পাইত মাংস এবং চামড়া। ভেড়ার লোম গরম কাপড় প্রস্তুত করিবার কাজে ব্যবহৃত হইত। এই সময় মানুষের মধ্যে আব একটি নূতন বিদ্যা দেখা দিল—মাটির হাঁড়ি নির্মাণ। কুমোরের চাকে নরম মাটি দিয়া মানুষ নানা রকম হাঁড়ি, ঘটিবাটি প্রভৃতি নির্মাণ করিতে শিখিল। মেয়েদের আর একটি নূতন বিদ্যা হইল সূতা কাটা ও কাপড় বোনা। কৃষিকার্যের বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোদালের বদলে লাঙলের ব্যবহার দেখা দিল। লাঙলের ফলা পাথরের, হাতল কাঠের। লাঙল কোদালেরই উন্নত রূপান্তর। লাঙলের ব্যবহার আয়ত্ত করিয়া মানুষ খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়াইতে শিখিল। অবশ্য কোন কোন অঞ্চলে চাষের বিশেষ সুবিধা ছিল না, সেখানে মানুষ বাধ্য হইয়া গরু, মহিষ প্রভৃতি পশুপালনের মধ্য



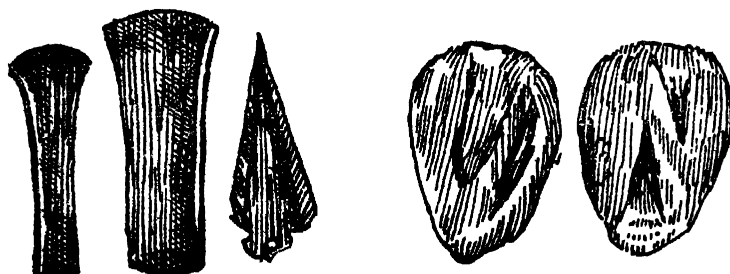
কুমোরের চাক



আদিম যুগের কাস্তে

দিয়া জীবন যাপন করিত। ইহারা **পশুপালক সমাজ**। পশুপালক সমাজ ঠিক এক জায়গায় দীর্ঘ দিন বাস করিতে পারে না, পশু পালনের জন্য তাহাদের হাজার হাজার গরু, মহিষ প্রভৃতি লইয়া গোচারণ মাঠের উদ্দেশে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করিতে হইত। তাহারা বাস করিত তাঁবু অথবা কুটিরে। গৃহপালিত পশুর মাংস এবং দুধ ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। পশুর চামড়া ও লোম হইতে তাহাদের কাপড় তৈয়ার হইত।

ধাতু লইয়াও মানুষের পরীক্ষা চলিতেছিল। প্রথমে **তামা**, তারপর তামার সহিত টিন মিশাইয়া সে **ব্রোঞ্জ** তৈয়ার করিতে শিখিল।



তামার অস্ত্র : কুড়ুল এবং ছুরি   তামার অস্ত্র তৈরীর জন্য পাথরের ছাঁচ

ব্রোঞ্জের হাতিয়ার তৈয়ার হইল। ইহা প্রস্তরের হাতিয়ারের চাইতে উন্নত। সকলের শেষে লোহা গলাইয়া মানুষ তাহার ইচ্ছামত কাজের জিনিস তৈয়ার করিতে লাগিল। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ধাতুর ব্যবহার একটি প্রধান মাপকাঠি। লোহার ব্যবহার শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে সে বর্বর স্তর হইতে সভ্যতার স্তরে পৌঁছাইল।

প্রাচীন যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার **ইঁট**। বাড়ি তৈরীর জন্য ইঁটের প্রয়োজন। নূতন পাথরের যুগে চাষবাস শিখিয়া যাযাবর জীবন ত্যাগ করিয়া মানুষ লোকালয় গড়িয়া তোলে। এক

জায়গায় বৎসরের পর বৎসর স্থায়ী ভাবে বাস করিবার ফলে লোক-সমাজের সামনে বাড়িঘরের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অনেক দিন বাস করা এবং রোদ-বৃষ্টি-শীত ঠেকানোর মত মজবুত বাড়ি তৈয়ার করিবার জন্য লোকসমাজ আবিষ্কার করে ইঁট। প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র, যথা মিশর, সুমের, ব্যাবিলন, মোহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে ইঁটের ঘরবাড়ি তৈরী হইয়াছিল। কাদামাটির সংগে খড়কুটো মিশাইয়া কাঠের ছাঁচের মধ্যে ফেলিয়া প্রথমে ইঁট তৈয়ার হইত। এই ইঁটকে পরে রোদে শুকাইয়া বাড়িঘর তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হইত। কাদামাটির পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রচুর ইঁট তৈয়ার করিবার পথে কোন বাধা ছিল না। মানুষ ক্রমশ আগুনের চুল্লীতে ইঁট পোড়াইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলে। ফলে অনেক তাড়াতাড়ি প্রচুর এবং শক্ত ইঁট তৈয়ার হইতে থাকে। যাদুঘরে গেলে প্রাচীন যুগের ইঁট দেখিতে পাইবে।

কুমোরের চাক, কোদাল, লাঙল, তামা, ব্রোঞ্জ, ইঁট প্রভৃতি আবিষ্কারগুলি মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক-একটা বিজয়-স্তম্ভ। এই আবিষ্কারগুলির মাধ্যমেই মানুষ বর্বর অবস্থা হইতে ক্রমশ সভ্যতার পথে আগাইয়া চলে।

প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি

প্রাচীন যুগেই লোকসমাজের মধ্যে সংস্কৃতির উদয় হয়। ভাষা বিকাশ লাভ করে, ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাস এবং ধর্মের সূচনা হয়, শিল্পকলার উৎপত্তি হয়।

শিকারের সময় হাত-পায়ের সাহায্যে সংকেত, জন্তুকে ভয় দেখানো বা ভুলানোর চেষ্টা প্রভৃতি হইতেই মানুষের মুখে ভাষার আরম্ভ। মানুষের কণ্ঠনালীর মধ্যে অবস্থিত ল্যারিংক্স্ (Larynx) বা

বাক্‌যন্ত্র,—এই বাক্‌যন্ত্র হইতে কতকগুলি ধ্বনি বাহির হয়, সেইগুলিই কথ্য ভাষার ভিত্তি।

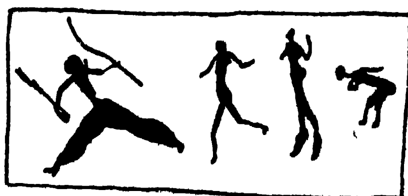
প্রকৃতির সামনে অসহায় মানুষ প্রকৃতিকে তুষ্ট করিবার জন্য অলৌকিক উপায়ের আশ্রয় নেয়, এবং এই ভাবেই ধর্মের সূচনা। ধরা যাক, দেশে অনাবৃষ্টির আশঙ্কা। অনাবৃষ্টি হইলে তো মানুষের সর্বনাশ, ফসল ফলিবে না। ফসল না ফলিলে মানুষ বাঁচিবে না। তখন সুরু হয় প্রকৃতিকে তুষ্ট করার চেষ্টা। জলের আশায় মানুষ বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা করে। প্রাচীন যুগে এই ভাবেই প্রকৃতির নানা শক্তি, যথা রৌদ্র, বৃষ্টি, জল প্রভৃতির আরাধনা আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে মেয়েরা "বসুধারা ব্রত" পালন করেন। বৃষ্টি কামনা করিয়া মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করিয়া বট, পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়া তাঁহারা বসুধারা ব্রতটি করেন। ব্রতের ছড়ার মধ্যে তাঁহারা কামনা কবেন জল আর জল ঃ

তিন কুলে পড়বে জলগঙ্গাব ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে, অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে।

অলৌকিক উপায়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা হইতেই মানুষেব মধ্যে ম্যাজিক বা জাদুবিশ্বাসেব উৎপত্তি হয়। জাদুবিশ্বাস হইতেই জাদু অনুষ্ঠান, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'ম্যাজিক'। জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের অনেক তফাত। জাদুবিশ্বাসের মধ্যে প্রার্থনা, উপাসনা, মানত প্রভৃতির স্থান নাই। জাদুবিশ্বাসের একটা নমুনা দেওয়া যাক। শত্রুকে বধ করিতে হইবে। শত্রুর একটা মূর্তি তৈরী করা হইল। ধর কুশ দিয়া মূর্তি তৈরী হইল। আমরা ইহাকে বলি কুশপুত্তলী। এই কুশপুত্তলীকে দাহ করা হইল। মানুষ মনে করিল যে, শত্রুর কুশপুত্তলী দাহ করিলেই আসল শত্রুটিরও মৃত্যু হইবে। ইহাই জাদুবিশ্বাস। ইংরাজীতে ইহাকে বলে—'ইমিটেটিভ ম্যাজিক'।









আদিম যুগের গুহাচিত্র : নাচের মধ্যে কামনা সফল হওয়ার পরিকল্পনা।
এই গুহাচিত্রের পিছনে আছে জাদুবিশ্বাস।

এই জাতুবিশ্বাসের রেশ টানিয়া আমাদের গ্রামদেশের লোকেরা বলেন,—জোড়া ফল খাইলে যমজ ছেলে হইবে। জাতুবিশ্বাসের মূল কথা অনুকরণ। অনুকরণের সাহায্যে কামনাকে সফল করিবার আয়োজন। শত্রুর কুশপুত্তলী দাহ করিয়া আসল শত্রু বধ করিবার আয়োজন। অথচ আমরা জানি কুশপুত্তলী আর আসল শত্রু এক হইতে পারে না। আমাদের কাছে এইরূপ কল্পনা আজগুবি। কিন্তু প্রাচীন যুগে প্রকৃতির সামনে অসহায় মানুষ এইরূপ আজগুবি কল্পনার সাহায্যে মনের কামনাকে সফল করিবার চেষ্টা করিত। জাতুবিশ্বাস অসহায় মানুষের মনে বলের যোগান দিত। জাতুবিশ্বাস হইতে তাহারা লাভ করিত নানা কাজে প্রেরণা।

জাতুবিশ্বাসের সহিত আদিম মানুষের শিল্প-সৃষ্টির সম্পর্ক আছে। তাহাদের নাচ, গান, ছবির মধ্যে থাকে কোন কামনা সফল হওয়ার নকল সৃষ্টি। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : অসভ্য আদিবাসীদের একটা দল যুদ্ধযাত্রা করিবে। যুদ্ধযাত্রার আগে তাহারা রণ-নৃত্য করিবে। রণ-নৃত্যের মূল কথাটা হইল, যুদ্ধে সফল হইবার একটা নকল সৃষ্টি করা। শিকারের আগে তাহারা নাচে। নাচের মূল কথাটা কি? শিকারে সফল হইবার কামনা শিকারের পূর্বেই সফল দেখিবার আয়োজন। আদিবাসীদের গানের মধ্যেও থাকে একই জিনিস—কামনা সফল হইবার কথা। তাহাদের বিশ্বাস গানের মধ্যে কামনা সফল করিবার এই আয়োজন করিতে পারিলে কামনা সত্যিই সফল হইয়া যাইবে। গুহার দেওয়ালে মানুষ প্রথম ছবি আঁকিতে শুরু করিয়াছিল। এই রকম অনেকগুলি গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদিম মানুষের এই সকল গুহা-চিত্রের মধ্যে নানা কামনা সফল করিবার আয়োজন চোখে পড়ে। প্রাচীন যুগের কয়েকটি চিত্রের নমুনা দেওয়া হইল। জাতুবিশ্বাসের সহিত এই চিত্রগুলির সম্পর্ক স্পষ্ট চোখে পড়ে।





আদিম যুগের গুহাচিত্র। এর পিছনে আছে গো-সম্পদ লাভের কামনা সফল করিবার আয়োজন।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আদিম মানুষ ছবি আঁকিয়াছিল গুহার দেওয়ালে। মানুষকে ছবি দেখানোর উদ্দেশ্যে তাহারা ছবি আঁকে নাই। তাহারা লোকালয়ের মধ্যে কোন স্থানে ছবি আঁকে নাই। তাহাদের ছবি দেখিতে হইলে তুর্গম গুহার মধ্যে মশাল জ্বালিয়া হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইবে। আবার বেশীর ভাগই শিকারের ছবি কিংবা যুদ্ধের ছবি, কিছু কিছু নাচের ছবি। গুহার মত অদ্ভুত জায়গায় এই সকল শিকারের বা যুদ্ধের ছবি আঁকিবার পিছনে আছে জাতুবিশ্বাস।

আদিম সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(ক) আদিম যুগ হইতেই মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ দলবদ্ধ হয়। খাদ্য সংগ্রহ করা এবং জন্তু-জানোয়ারের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়।

(খ) পরিবেশ মানুষের সমাজজীবনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে। পরিবেশ অনুযায়ী তাহার সমাজজীবন গড়িয়া উঠে। শিকারীর দল, মৎস্যজীবী সমাজ, পশুপালক সমাজের জীবনে ইহা আমরা দেখিয়াছি।

(গ) পরিবেশের সহিত মানুষ নিরন্তর সংগ্রাম করে। প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষ জয় করিতে চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা হইতেই নানা হাতিয়ার তৈয়ার হয়—পাথরের অস্ত্র, কোদাল, লাঙল, কুমোরের চাক, চরকা, তাঁত ইত্যাদি। সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি হাতিয়ারের উন্নতি। উন্নত হাতিয়ার মানুষের সমাজজীবনকে উন্নত করে। ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, তারপর লোহার হাতিয়ার মানুষকে বর্বর স্তর হইতে সভ্যতার স্তরে উন্নীত করে। হাতিয়ারের উন্নতির ফলেই কৃষিকার্যের বিস্তার

সম্ভব হইয়াছে। হাতিয়ারের আরও উন্নতির ফলে মানুষ ক্রমে নানা রকম হস্তশিল্প এবং আধুনিক যুগে যন্ত্রশিল্প স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

(ঘ) আদিম সমাজে এবং আধুনিক সমাজেও মানুষের মৌলিক প্রয়োজন একরকম—খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। এই মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই মানুষের সমাজজীবন। বিভিন্ন লোকসমাজ বিভিন্ন ভাবে এই মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে। বিভিন্ন লোকসমাজের জীবন তাই নানা বৈচিত্র্যে ভরা। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ভারতের এবং পৃথিবীর কয়েকটি লোকসমাজের জীবনযাত্রা আলোচনা করিব।

অনুশীলনী

১। আদিম সমাজে কিভাবে শিকারীর দল, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং কৃষিজীবী সমাজ গড়িয়া উঠে?

২। মানুষের সমাজজীবনে হাতিয়ারের ভূমিকা কি?

৩। আদিম সমাজে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত কেন? আদিম মানুষ কিভাবে এবং কখন লোকালয় গড়িয়া তুলিল?

৪। সভ্যতার বিকাশে নিম্নলিখিত হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর:
(ক) কুমোরের চাক, (খ) লাঙল, (গ) চরকা।

৫। পরিবেশ কিভাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দামানের লোকসমাজ

পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক অঞ্চলে নানা লোকসমাজের বাস। গভীর অরণ্যে চিরহরিৎ বৃক্ষের সমারোহের মধ্যে, দিগন্ত-বিস্তৃত তৃণভূমির দেশে, ঊষর মরুভূমিতে, বরফের দেশে বিভিন্ন লোকসমাজ তাহাদের সমাজজীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। লোকসমাজগুলির জীবন বৈচিত্র্যময়। তাহাদের বেশভূষা, আচার, রীতি-নীতি বিভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় ইহাদের জীবনযাত্রার ধরনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ইহাদের জীবনধারায় একটি মৌলিক ঐক্যের সন্ধান মেলে। সকলেরই মৌলিক প্রয়োজন একরকম—খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ। জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ সকলেরই কাম্য। নিজ নিজ দেশ বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সকলেই বাঁচিতে এবং তাহাদের সমাজজীবনকে সংগঠিত করিবার চেষ্টা করে। জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা বিভিন্ন লোক-সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। মনে হয়, পৃথিবীর সকল লোক-সমাজগুলি মিলিয়া যেন একটি মানব-পরিবার গঠিত হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন দেশে বাস করিলেও এই একটি মানব-পরিবারের অঙ্গ।

আমাদের দেশের কথাই ধর। ভারতবর্ষ একটি দেশ, তবু ইহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ভৌগোলিক পরিবেশ এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রধানত দায়ী। বিভিন্ন অঞ্চলে দেখি লোকসমাজের বৈচিত্র্যময় জীবন। আমরা এইবার কয়েকটি অঞ্চলের লোকসমাজের সমাজজীবন আলোচনা করিব,—আন্দামানের ফলমূল আহরণকারী লোকসমাজ, আলমোরার পশুপালক ও কৃষিজীবী লোকসমাজ এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবী এবং শিল্পজীবী লোকসমাজ।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ

মানচিত্রের দিকে তাকাইলে তোমরা বঙ্গোপসাগরের কোলে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইবে। ছোট ছোট পাঁচটি দ্বীপ সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া আছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ গভীর অরণ্যে আবৃত, উহার মাঝে মাঝে পর্বতশ্রেণী। উপকূল-ভাগ অতিশয় ভগ্ন, তাই এখানে সুন্দর বন্দর স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম পোর্ট ব্লেয়ার।

শত শত বৎসর ধরিয়া এই দ্বীপপুঞ্জে উপজাতিরা বাস করিয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতকে আন্দামানে ইংরাজদের আগমন ঘটে। ইংরাজেরা উপজাতিদের সভ্য করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায়, উপজাতিরা তাহা মোটেই সুনজরে দেখে নাই। ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের অনেক খণ্ড যুদ্ধ ঘটে। ইহার ফলে উপকূল-ভাগের উপজাতিদের একটি বিরাট অংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আদিবাসীদের মধ্যে নানা সংক্রামক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৮৮৫ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪৮০০, ক্রমশ ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পায়। অবশ্য অরণ্যে উপজাতিদের একটা বড় অংশ বাস করে। ইংরাজরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দীর্ঘ মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের আন্দামানে চালান করিতে থাকে। আন্দামানে স্থাপিত হয় একটি বিরাট বন্দীশালা। ক্রমে কয়েদীরা এই দ্বীপেই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকে। বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। ইহাদের মধ্যে আছে বাঙালী, বর্মী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, মালয়ালী, মাদ্রাজী প্রভৃতি নানা জাতির মানুষ।

আন্দামানের উপজাতি

আন্দামানের আদিম বাসিন্দারা ছোট ছোট উপজাতিতে (tribe) বিভক্ত। উপজাতিগুলির বিভিন্ন ভাষা। এই উপজাতিগুলি প্রধানত দুটি দলে বিভক্ত—বড় আন্দামান দল ও ছোট

আন্দামান দল। প্রত্যেক দল কয়েকটি উপজাতি লইয়া গঠিত। উপজাতিগুলি আবার কতকগুলি স্থানীয় গোষ্ঠীতে (Local Group) বিভক্ত। গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া আদিবাসীদের সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। এক-একটি স্থানীয় গোষ্ঠীতে বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ৪০ হইতে ৫০ জন লোক থাকে। প্রত্যেক স্থানীয় গোষ্ঠী একস্থানে বাস করে। ইহাদের ভূমিখণ্ড নির্দিষ্ট থাকে। ঐ নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে গোষ্ঠীর লোকেরা ফলমূল আহরণ করে এবং শিকার করে। অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া আন্দামানের আদিবাসীরা জীবন যাপন করে। সম্পত্তি ভাগাভাগির কথা তাহারা চিন্তা করে না। গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট অঞ্চলে যত বন, যত ফলমূল, যত মধু উহাতে গোষ্ঠীর সকলেরই সমান অধিকার। শিকারে কোন জন্তু মিলিলে উহার মাংস তাহারা সমান ভাবে ভাগ করিয়া নিবে। সকলে মিলিয়া প্রত্যেকের গৃহ তৈয়ার করিবে।

এই সাম্য উহাদের মধ্যে কি করিয়া টিকিয়া আছে? ইহারা ফলমূল আহরণকারী সমাজ বলিয়াই ইহাদের মধ্যে সাম্য টিকিয়া আছে। যদি ইহারা কৃষিকার্য শিখিত, তাহা হইলে কি হইত? ইহাদের তখন ফসল ফলাইবার জন্য নিজ নিজ ক্ষেত থাকিত, ক্ষেতের নির্দিষ্ট সীমানা রাখিতে হইত, নিজ নিজ ক্ষেতের ফসল কাটিয়া ঘরে তুলিতে হইত। স্বভাবতই এই অবস্থায় জমিজমা ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্ন উঠিত। কিন্তু ফলমূল আহরণ এবং শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয় বলিয়া তাহারা যৌথ জীবন এবং সাম্যের আদর্শ আঁকড়াইয়া আছে।

লোকসমাজের খাদ্য

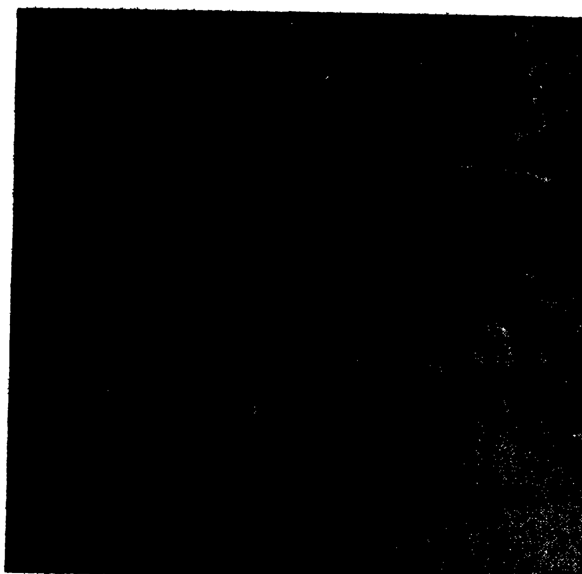
আন্দামানের লোকসমাজ প্রধানত ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করে। বনে-জঙ্গলে ফলমূল পর্যাপ্ত। বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া

ঘুরিয়া তাহারা ফলমূল সংগ্রহ করে। শীতকালে ফলমূল সংগ্রহের জন্য ইহাদের মধ্যে কাজের সাড়া পড়ে। বনের বহু দূর পর্যন্ত তাহারা চলিয়া যায় এবং ফলমূল, শাকসবজি আহরণ করে। শীতের শেষে বনের গাছে গাছে বড় বড় মৌচাকে মধু মেলে। মধু আদিবাসীদের প্রিয় খাদ্য। মধু আহরণে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে। পুরুষেরাই গাছে উঠিয়া চাক কাটে। অবশ্য মধু বেশী দিন তাহারা রাখিতে পারে না, বেশী দিন থাকিলে মধু মদে পরিণত হইয়া যায়। বেশীর ভাগ মধু তাই ইহারা খাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা নামে, তখন বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহারা তখন ঘরে ফেরে। সমুদ্রের উপকূলে যাহারা বাস করে, তাহাদের প্রিয় খাদ্য মাছ। সমুদ্রে মাছের বিপুল সমারোহ, সারা বৎসর ইহারা মাছ ধরে। কচ্ছপ, কচ্ছপের ডিম প্রভৃতিও ইহাদের প্রিয় খাদ্য। শিকারও লোকসমাজের আর একটি জীবিকা। বনে-জঙ্গলে ইহারা বুনো শূয়োর এবং খাটাসের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শিকারে তাহারা তীর ব্যবহার করে। শিকারে সংগৃহীত খাদ্য তাহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নেয়। আন্দামানের মানুষ ইঁদুর এবং সাপ শিকার করিয়াও খায়। পাখী শিকার তাহারা করে না, যদিও বনে-জঙ্গলে পাখী প্রচুর। ইহার কারণ এই যে, পাখী বাস করে উঁচু উঁচু গাছে। হঠাৎ যদি তীর পাখীকে বিদ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে তো তীরটা নষ্ট হইয়া যায়। একটা তীরও তাহারা নষ্ট করিতে চায় না।

বাসস্থান

আন্দামানের আদিবাসীরা অরণ্যে এবং সমুদ্রের উপকূলে বাস করে। যাহারা অরণ্যে বাস করে, তাহারা স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে। গাছের পাতা, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি যোগাড় করিয়া তাহারা ঘর নির্মাণ

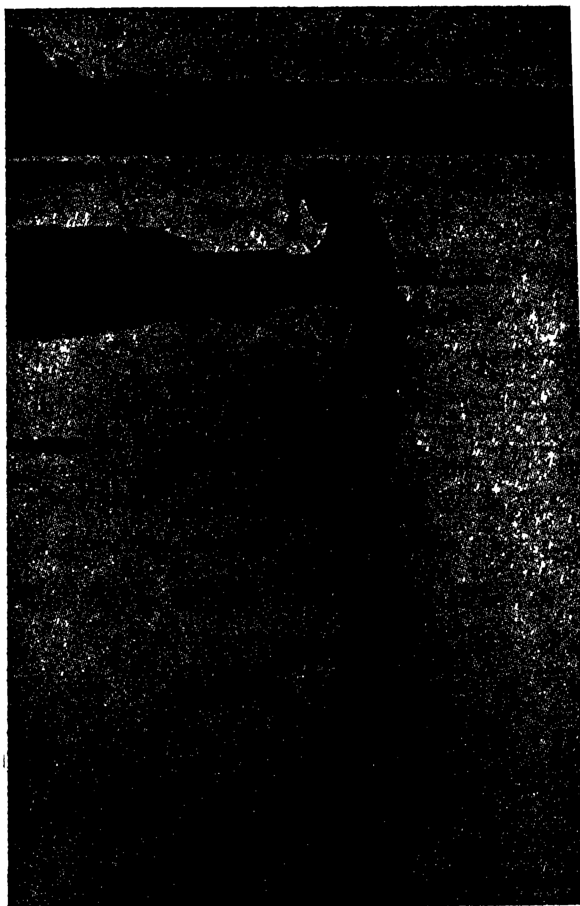
করে। সারা বর্ষাকাল তাহারা এই স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে। শীত ও গ্রীষ্মে অবশ্য তাহারা ফলমূল আহরণের কাজে বাহির হয়, বর্ষা সুরু হইলে ঘরে ফেরে। ঘরের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নাচের স্থান। সন্ধ্যায় দল বাঁধিয়া মেয়ে-পুরুষ মনের আনন্দে নাচে, গান করে। সমুদ্রের উপকূলে যাহারা বাস করে, তাহারা কিন্তু অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ



আন্দামানের লোকসমাজের অস্থায়ী বাঁশের ঘর

করে, কেননা কোন এক স্থানে তাহারা দু'-এক মাসের বেশী বাস করিতে পারে না। নানা কারণে তাহারা বাসস্থান পরিবর্তন করে। কেহ মারা গেলে তাহারা সেই বাসস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সমুদ্রে মাঝে মাঝে ঝড় উঠে, তখন তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কোন স্থির অঞ্চলে ঘর বাঁধে। সমুদ্রে এবং খাড়িতে মাছ ধরে বলিয়া তাহারা এক স্থানে মাছ ধরিয়া আবার অন্যত্র চলিয়া যায়। যখন যেখানে মাছ ধরে,

তখন সেখানে তাহারা বাসা বাঁধে। বাসস্থানের পাশেই তাহারা আবর্জনা ফেলে। আবর্জনায় পচন ধরে, দুর্গন্ধ বাহির হয়. তখন



তীরধনুক দ্বারা মাছ শিকার

তাহারা বাসস্থান পরিবর্তন করে। উপকূলবাসীরা তাই অনেকটা

যাযাবর জীবন যাপন করে। উপকূলবাসীদের নৌকা থাকে, তাই জিনিসপত্র নিয়া বাসস্থান পরিবর্তন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব। অরণ্যবাসীদের এই সুবিধা নাই।

পোশাক, আসবাব ও হাতিয়ার

আন্দামানের লোকসমাজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। তাহারা পূর্বে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করিত। মেয়েরা কোমরে গাছের পাতা ঝুলাইয়া রাখিত। আজকাল অবশ্য ইহাদের মধ্যে বস্ত্রের ব্যবহার সুরু হইয়াছে। তাহাদের রান্নাবান্নার আসবাবও অতি সাধারণ। শামুকের খোল, ঝিনুক, হাড় প্রভৃতি দিয়া তাহারা রান্নার বাসনপত্র তৈয়ার করে। মাটির হাঁড়ি রাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে যে নরম মাটিতে হাঁড়ি তৈয়ার হয়, তাহা সর্বত্র পাওয়া যায় না। তাই হাঁড়ির খুব চাহিদা। ছোট ছোট হাটে হাঁড়ি বিক্রী হয়। শিকার এবং আত্মরক্ষার জন্য ইহারা নিজেরাই নানা হাতিয়ার বানায়; যথা—তীর, ধনুক, বর্শা, মাছ ধরিবার জাল, কাঠের ছোট ছোট ডিঙ্গিনৌকা। পূর্বে কাঠ, হাড়, শামুকের খোল প্রভৃতি দিয়া তাহারা হাতিয়ার বানাইত। অধুনা তাহারা লোহার ব্যবহার শিখিয়াছে। তীর-ধনুকই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তীর ছুঁড়িয়া তাহারা শিকার করে এবং মাছ ধরে। শিকারের কাজে বর্শাও ব্যবহৃত হয়। লোকসমাজের জীবনযাত্রার সহিত হাতিয়ারগুলির সুন্দর মিল রহিয়াছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনেই মানুষ হাতিয়ার তৈয়ার করে, আর এই হাতিয়ার তৈয়ার করিতে হাতের কাছে যে উপকরণ প্রচুর মেলে উহাই ব্যবহৃত হয়। আন্দামানের লোকসমাজ শিকার করে এবং মাছ ধরে। তাই তাহাদের তীর-ধনুক ও বর্শার প্রয়োজন। হাতের কাছে কাঠ, হাড়, শামুকের খোল পর্যাপ্ত মেলে, তাই হাতিয়ার নির্মাণে এইগুলি ব্যবহৃত হয়।

তারপর তাহারা একদিন লোহার ব্যবহার শেখে এবং স্বভাবতই তখন লোহার উন্নত হাতিয়ার তৈয়ার হইতে থাকে।



আন্দামানের লোকসমাজের নানা হাতিয়ার

লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন

সকাল হইতেই লোকসমাজের দিনের কাজ সুরু হইয়া যায়। অরণ্য-বাসীদের স্থায়ী বাসস্থানে রান্নার যোগাড় হয়। পুরুষেরা শিকার করিতে

বাহির হয়। অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে কুকুর থাকে। গভীর অরণ্যে তাহারা শিকার করে। তাহাদের সঙ্গে থাকে তীর-ধনুক এবং বর্শা। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য বুনো শূয়োর। পশুর পায়ের দাগ দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হয়, কিংবা কুকুর পশুর গন্ধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া পথ দেখাইয়া চলে। তীরবিদ্ধ করিয়া বরাহ শিকার হয়। শিকারের সন্ধানে বনে বনে ঘুরিবার সময় ইহারা ফলমূলও আহরণ করে। শিকারলব্ধ শূয়োর লইয়া তাহারা ঘরে ফেরে। তারপর সাধারণ রান্নার জায়গায় শূয়োর সিদ্ধ করা হয়। এই মাংস তাহারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া নেয়। যাহারা উপকূলে বাস করে তাহারাও দিনের বেলা মৎস্যশিকারে বাহির হয়। দুপুরে লোক-সমাজের ঘরে কর্মক্ষম মেয়ে-পুরুষ প্রায় থাকে না। শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শিশুদের লইয়া ঘরে থাকে। মেয়েরা বনে ফলমূল সংগ্রহ করে, কাঠ কুড়ায়, জল আনে। সন্ধ্যার পর আহারপর্ব শেষ করিয়া ঘরের সামনে খোলা আঙ্গিনায় মেয়ে-পুরুষ নাচে, গান করে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালদের নাচের সহিত ইহাদের নাচের সাদৃশ্য আছে। দৈনন্দিন জীবনের কথা লইয়াই তাহারা গান রচনা করে। গানে থাকে জীবজন্তু বা মৎস্য শিকারের কথা, কিংবা ফলমূল আহরণের বিষয়।

লোকসমাজের ধর্ম

আদিম সমাজে প্রকৃতির সামনে অসহায় মানুষ কিভাবে প্রকৃতির নানা শক্তিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিতে শিখিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। আন্দামানের অধিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ ধর্মীয় চেতনা আছে। ইহারা প্রকৃতির অজানা শক্তির মধ্যে দেবদেবীকে কল্পনা করে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে মৌসুমী বায়ু বহিতে থাকে, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে।

উহারা মনে করে ইহার মধ্যে আছে এক দেবতা। এই দেবতা "টেরিয়া" নামে অভিহিত। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে মৌসুমী বায়ু বহিতে থাকে, প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠে। উহারা ভাবে ইহার মধ্যে আছে দেবী—বিলিকা। টেরিয়া বৃষ্টির এবং বিলিকা ঝড়ের দেবী। এই দুই দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা মৌচাক পোড়ায় অথবা নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করে। আকাশে তাহারা দেখে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগুলি.। তাহারা মনে করে চন্দ্রের স্ত্রী সূর্য, আর নক্ষত্রগুলি চন্দ্র সুর্যের ছেলেমেয়ে। তাহারা ভূতপ্রেতও বিশ্বাস করে। কেহ মারা গেলে সে ভূত হয় এবং বাড়িব চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—এই বিশ্বাস হইতে তাহারা ভূতের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য ঘবে আগুন জ্বালিয়া রাখে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস আছে।

অনুশীলনী

১। আন্দামানের লোকসমাজকে খাদ্য আহরণকারী বলা হয় কেন?

২। আন্দামানের লোকসমাজ কিভাবে জীবন ধারণ করে?

৩। আন্দামানের লোকসমাজের জীবিকা এবং হাতিয়ারগুলির মধ্যে কি সম্পর্ক আছে?

৪। আন্দামানের লোকসমাজ কিভাবে মৎস্য এবং বন্য বরাহ শিকার করে? শিকারলব্ধ মাংস তাহারা কিভাবে ভাগ করে?

৫। আন্দামানের উপকুলবাসীদের মধ্যে অস্থায়ী বাসস্থানের প্রচলন কেন রহিয়াছে? অরণ্যবাসীরা স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে কেন?

৬। আন্দামানের লোকসমূহের ধর্ম এবং নাচগানের বর্ণনা কর। তাহাদের গানের বিষয়বস্তু কি?

৭। খাদ্য-সংগ্রাহক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কি কি?

নিম্নলিখিত উক্তিগুলির ভুল বাহির কর এবং সঠিক উত্তর দাও:—

(ক) আন্দামানের লোকসমাজ পশুজীবী।

(খ) আন্দামানের লোকসমাজের প্রিয় খাদ্য চাউল এবং সবজি।

(গ) আন্দামানের লোকসমাজ জাল দিয়া নদীতে মাছ শিকার করে।

(ঘ) আন্দামানের উপকূলবাসী স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে।

তৃতীয় অধ্যায়

আলমোরার লোকসমাজ

আন্দামানের লোকসমাজ প্রধানত খাদ্য-সংগ্রাহক। খাদ্য উৎপাদন নয়, বনে-জঙ্গলে খাদ্য সংগ্রহ তাহাদের জীবিকা। পণ্ডিতেরা বলেন, মানবসমাজের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে খাদ্য-সংগ্রাহক অর্থনীতিই চালু ছিল। ভারতের আর একটি লোকসমাজের কথা আমরা আলোচনা করিব। ইহারা পশুপালক এবং কৃষিজীবী। উভয় লোকসমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের মূলে আছে উভয় অঞ্চলের ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ।

আলমোরা

ভারত-তিব্বত সীমান্তে হিমালয়ের কোলে পার্বত্য জেলা আলমোরা অবস্থিত। আলমোরার পশ্চিমে প্রসিদ্ধ পার্বত্য সহর সিমলা, মুসৌরী ও নৈনিতাল। স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে এই স্থানগুলির খ্যাতি সুবিদিত। আলমোরা জেলা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত।

প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে আলমোরা অতি মনোরম। পাহাড়-পর্বত অরণ্যে ঘেরা এই অঞ্চল। বনে বনে ওক, পাইন এবং রডো-ডেনড্রন গাছের সমারোহ। গভীর অরণ্যে হাতী, বাঘ এবং ভল্লুকের ছড়াছড়ি। পাহাড়ী খরস্রোতা নদীগুলিতে প্রচুর মাছ। পাহাড়ের কোলে নদীর উপত্যকায় কিংবা নদীর কিনারায় ছোট ছোট ক্ষেত, ক্ষেতের কাছে জনবসতি। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া আলমোরার সর্বত্র চাষ হয় না। কঠিন পরিশ্রম করিয়া আলমোরার লোকসমাজ ছোট ছোট ক্ষেতে ফলায় নানা শস্য—গম, বার্লি, মারুয়া, আলু। কোন কোন অঞ্চলে চা-বাগিচা গড়িয়া উঠিয়াছে।

আলমোরাকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—পাহাড়ের উপরের অরণ্যভূমি এবং পশুচারণ ভূমি, মধ্যভাগের শুষ্ক অঞ্চল, আর নদীর ধারে ধারে অবস্থিত উর্বর ভূমি। বেশীর ভাগ চাষবাসের জমি ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফুট উচুতে।

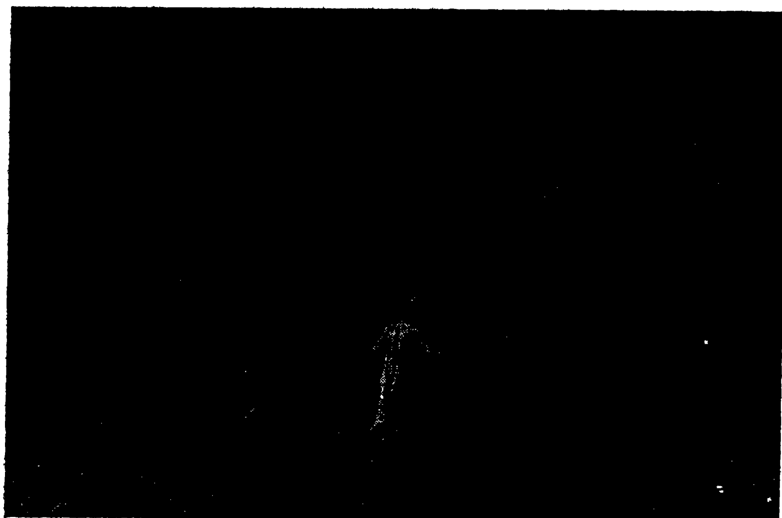
লোকসমাজের জীবিকা

আলমোরার লোকসমাজ কৃষিজীবী এবং পশুপালক। কোন কোন গ্রামের মানুষ চাষবাস এবং পশুপালন একসঙ্গে করে। সাধারণত গ্রামের একদল চাষবাস এবং আর একদল পশুপালন করিয়া জীবন ধারণ করে। কোন কোন গ্রামের মানুষের পশুপালনই প্রধান জীবিকা। "ভবর" এলাকায় এই গ্রামগুলি অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলে ভরা ছোট ছোট অঞ্চলকে "ভবর" বলে। "ভবর" এলাকার ঘাস লম্বা এবং ঘন। ইহাদের গৃহপালিত পশু—ভেড়া, ছাগল এবং গরু। ভেড়ার লোম হইতে লোকসমাজ কম্বল ও চাদর তৈয়ার করে। শীতের দেশে কম্বল ও চাদরের যে কত প্রয়োজন, তাহা তো সহজেই বোঝা যায়। ইহারা গরুর দুধ হইতে ঘি বানায়, আলমোরা সহরে এবং অন্যত্র এই ঘি বিক্রী হয়। আলমোরার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বাসিন্দা 'ভোট'রা অভিনব পদ্ধতিতে চাষবাস করে। ভোটরা নিজেরাই পশুর মত লাঙল টানে, পিছনে একজন হাল ধরিয়া থাকে। কৃষিকার্যে মেয়ে ও পুরুষ অংশ গ্রহণ করে। জমি চাষ করা ও ফসল বোনা পুরুষের কাজ, ফসল কাটা মেয়েদের কাজ।

লোকসমাজের পশুপালন

আল্পস ও পীরেনিজের মানুষদের মত আলমোরার লোকসমাজকেও পশুপালনের জন্য এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করিতে

হয়। আলমোরার উত্তরাঞ্চলে শীতকালে বরফ পড়ে, গ্রামের পর গ্রাম বরফের শুভ্র চাদরে ঢাকা পড়ে। এই বরফভূমিতে গাছপাতা জন্মাইবে কি করিয়া ? পশুর খাদ্যের জন্য তখন লোকসমাজ নীচে নামে। নীচের উপত্যকায় খাদ্য মেলে। গ্রামের লোকজন তাই ছেলেপুলে, জিনিসপত্তর, গরু-বাছুর-ভেড়া লইয়া দক্ষিণ দিকে নামিতে



পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্য

থাকে। সুবিধামত একটা জায়গা বাছিয়া লইয়া তাহারা অস্থায়ী বাসস্থান তৈয়ার করে এবং সারা শীত এখানেই কাটায়। শীতের শেষে বরফ সরিয়া যায়, উত্তরের পার্বত্যভূমির রূপ বদলাইতে থাকে। কচি কচি ঘাস ও লতাপাতায় পার্বত্যভূমি ভরিয়া উঠে। লোকসমাজ তখন উপরে উঠিতে থাকে। নীচের উপত্যকার খাদ্যও ততদিনে ফুরাইয়া আসে, তাই উপরে যাওয়া ছাড়া তাহাদের উপায় থাকে না।

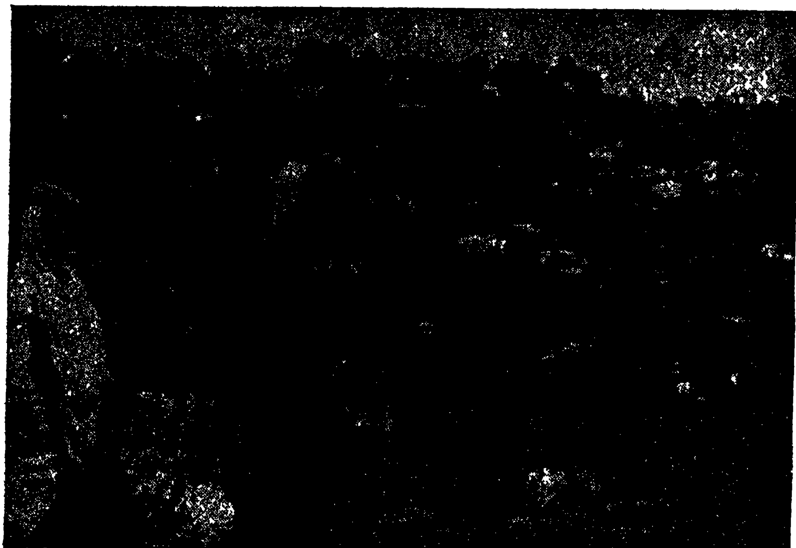
পথঘাট ভাল থাকিলে তাহারা উপর হইতে খাদ্য নীচের উপত্যকায় আনিতে পারিত। কিন্তু আলমোরার পথঘাট দুর্গম। তাই তাহাদের উপরে উঠিতেই হয়।

পাহাড়ের উপরে আট-দশ হাজার ফুট উঁচুতে ওক গাছের ঘন বন আছে। গ্রীষ্মে লোকসমাজ পশু লইয়া ওক বনে যায় এবং বাসা বাঁধে। পাহাড়ী রাস্তা দিয়া চলে গরুর মিছিল। সারা গ্রীষ্মকাল ওক গাছের বনেই ইহারা বাস করে। ওক গাছের পাতা পশুর খাদ্য। বর্ষার সময় জলে জঙ্গল ভাসিয়া যায়, পাতা পচিতে থাকে। তাই তখন তাহারা পশুর দল লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে।

আলমোরার লোকসমাজ সাধারণত চারবার উঠা-নামা করে। চৈত্র মাসে তাহারা যাত্রা করে, জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে আসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহারা ধান বোনে, ধান কাটে। আষাঢ়ের প্রথমে আবার যাত্রা সুরু হয়, কিছুদিন পরে তাহারা ফিরিয়া আসে। বর্ষায় গ্রামেই প্রচুর ঘাসপাতা মেলে। শ্রাবণের শেষে তাহারা আবার উপরের দিকে যাত্রা করে। এখানকার ঘাস খুব পুষ্টিকর, তাই তাহারা এখানে আসে। তারপর শীতকালে যখন বরফ পড়ে, তখন আবার তাহারা নীচের উপত্যকায় নামিয়া আসে।

আলমোরার লোকসমাজ সত্যই এক বিচিত্র জীবন যাপন করে। তাহাদের গ্রাম আছে, ঘরবাড়ি আছে, কিন্তু তবু তাহাদের অনেকটা যাযাবরের মত স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হয়। তাহারা এক স্থানে থিতাইয়া বাস করিতে পারে না কেন? প্রথমত, পশুর খাদ্য তাহাদের সংগ্রহ করিতে হয় এবং একই স্থানে সারা বছর পশুর খাদ্য মেলে না। দ্বিতীয়ত, রাস্তাঘাট দুর্গম বলিয়া পশুর খাদ্য গাড়িতে করিয়া আনাও অসম্ভব। তৃতীয়ত, শীতকালে উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড বরফের মধ্যে ঘাসপাতা জন্মাইতেই পারে না। চতুর্থত, পাহাড়ের

উপরে ওক গাছের বন থাকায় লোকসমাজ পশুর খাদ্য সংগ্রহের জন্য ওখানে যাওয়া সুবিধাজনক মনে করে।



পাহাড়ের উপরে জনবসতি

যাযাবর জীবন যাপন করিলেও আলমোরার লোকসমাজ আন্দামানের লোকসমাজের তুলনায় উন্নত জীবন যাপন করে। ইহারা কৃষিজীবী এবং পশুপালক, ফলমূল আহরণকারী যাযাবর লোকসমাজ নয়।

সাময়িক ও স্থায়ী বাসস্থান

প্রয়োজনের তাগিদে স্থানীয় লোকসমাজ সাময়িক বাসস্থান নির্মাণ করে। পশুর খাদ্য সংগ্রহের জন্য যখন তাহারা গোচারণ-ভূমিতে আসে, কিংবা শীতকালে যখন তাহারা নীচে নামে, তখন তাহাদের সাময়িক বাসস্থান তৈয়ার করিতে হয়। গোচারণ-ভূমির কাছেই গ্রামবাসী আস্তানা তৈয়ার করিয়া একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করে।

গাছের ডাল, খড়, কাঠ দিয়া ঘর তৈরী হয়। ঘরগুলি মাত্র আট-দশ ফুট উঁচু। দরজাগুলি সংকীর্ণ, যাহাতে জন্তুজানোয়ার ঘরে ঢুকিতে না পারে। সন্ধ্যায় গোচারণ-ভূমি হইতে পশুগুলি আনিয়া ঘরের কাছে তাহারা রাখিয়া দেয়। দক্ষিণ নিম্ন উপত্যকা অঞ্চলের লোক-সমাজ স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে। উপত্যকার কোলে নদীর ধারে



সাময়িক বাসস্থান

ধারে গ্রামের পর গ্রাম। চাষের জন্য জলের প্রয়োজন, তাই সাধারণত নদীর পারেই গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রামের মধ্যেই ঘরবাড়ি এবং কৃষিক্ষেত্র। ঘরগুলিতে খড়ের চাল এবং কাঠ অথবা পাথরের দেয়াল। দেয়ালের গায়ে অনেক সময় মাটি অথবা গোবর লেপিয়া দেওয়া হয়। এক একটি পরিবারের মাত্র তু'-একটি ঘর থাকে। ঘরের কাছে গৃহপালিত পশুদের রাখিবার ব্যবস্থা থাকে। অনেক সময় গৃহ-পালিত পশুদের জন্য স্বতন্ত্র কুটির নির্মিত হয়।

হাট-বাজার

লোকসমাজের প্রয়োজনেই দেশে দেশে হাট-বাজার গড়িয়া উঠে। হাট-বাজারে লোকসমাজ দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম এবং অঞ্চলের জিনিসপত্র হাটেই মেলে।

আলমোরায় হাট গড়িয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট হাট বসে। হাটে নানা রকম জিনিসপত্রের কেনাবেচা হয়। কম্বল, চাদর, জুতা, ঘি, বাসনপত্র ইত্যাদি হাটে আমদানি হয়। সীমান্তেই তিব্বত দেশ। তিব্বতীরা আলমোরাব হাটে আসে তাহাদের বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর পশমের কম্বল লইয়া। শত শত বৎসর ধরিয়া তিব্বতীদের সহিত আলমোরার লোকসমাজের বাণিজ্য চলিতেছে। তিব্বত প্রতিবেশী দেশ বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

উৎসব ও মেলা

স্থানীয় লোকসমাজের জীবনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উৎসব ও মেলা। জন্মাষ্টমী, দশহরা, শিবরাত্রি, হোলি, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি উৎসব লোকসমাজ পালন করে। উৎসবের সময় ইহাদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে। উৎসব উপলক্ষেই গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। মেলায় গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লোক আসে। বড় বড় মেলায় দশ-পনের হাজার লোকের সমাগম হয়, আর ছোট ছোট মেলায় পাঁচ-সাত হাজার। মেলায় নানা জিনিস কেনা-বেচা হয়, যথা—বাঁশের তৈরী লাঠি ও মাছ ধরিবার ছিপ, পশুর শিং ও চামড়া, মৃগনাভি ও কস্তুরী, গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধ, ধাতুনির্মিত বাসনপত্র ইত্যাদি। তিব্বতীরাও মেলায় আসে, তাহারা সঙ্গে আনে পশমী চাদর ও কম্বল। মেলায় কেনা-বেচার মাধ্যমে লোকসমাজের দু' পয়সা আয় হয়, গ্রামে মেলে না এইরূপ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও তাহারা মেলায় সংগ্রহ করিতে পারে।

আলমোরার একটি প্রসিদ্ধ মেলা বাগেশ্বরের মেলা। সরযূ এবং গোমতী নদীর সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। প্রতি বৎসর মকর

সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে এক বিরাট মেলা বসে। প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। আলমোরার ভোটিয়া এবং অন্যান্য লোকেরা তো বটেই, তিব্বত ও উত্তরপ্রদেশের লোকেরাও মেলায় আসে। পাহাড়ী ভোটিয়ারা সারা বৎসর গ্রামে বসিয়া যে কম্বল, শাল, গালিচা প্রভৃতি তৈয়ার করে তাহা মেলায় বেচিতে আনে। তিব্বতীরা আনে কস্তুরী, মোম ও ঔষধপত্র। আলমোরা সহরের ব্যাপারীরা আমদানি করে সূতী কাপড়, ছাতা, চিনি, গুড়, সাবান, আয়না, বোতাম, তালাচাবি, তাস, খেলনা, বাসনকোসন, টর্চ ইত্যাদি। পাহাড়ীরা এই সব মনিহারী জিনিস বিস্তর কেনে, কেননা তাহাদের গ্রামে তো এইগুলি মেলে না। সহরে পাড়ায় পাড়ায় দোকান থাকে, দোকানে মনিহারী জিনিস কিনিতে পারা যায়। আলমোরার পাহাড়ী গ্রামে এই রকম দোকান নাই। স্বভাবতই মেলা এই সকল জিনিস সংগ্রহের কেন্দ্র।

শুধু আলমোরাতেই নয়, ভারতের সর্বত্র মেলা বসে। মেলা শত শত বৎসরের প্রাচীন অনুষ্ঠান। কৃষিপ্রধান দেশে মেলা বসা স্বাভাবিক। চাষীর সব সময় ক্ষেতে কাজ থাকে না। ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে চাষী কিছুটা অবসর পায়। সে ফসল বেচিয়া দু' পয়সা সংগ্রহ করে। এই সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতের প্রায় সর্বত্র ঠাকুরদেবতার পূজা উপলক্ষে মেলা বসিবার রীতি প্রচলিত আছে। ধর্মানুষ্ঠানের সহিত মেলা মিশিয়া গিয়াছে। চাষী মেলায় দল ধরিয়া আসে শুধু আনন্দের জন্যই নয়, মেলায় সে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সংগ্রহ করে। সব গ্রামে সব জিনিস মেলে না। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ জিনিস আমদানি হয়। লোকসমাজের কাছে তাই মেলার আদর এত বেশী। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বড় বড় সহরে মেলা সাধারণত বসে না। সহরে বড় বড় দোকানে সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিসই পাওয়া যায়, তাই মেলার প্রয়োজনীয়তা সেখানে কম।

অনুশীলন

১। পশুজীবী লোকসমাজের বিবরণ দাও। খাদ্য-সংগ্রাহক লোক-সমাজের সহিত ইহার জীবনধারার পার্থক্য দেখাও ?

২। আলমোরার লোকসমাজ কিভাবে পশুপালন করে এবং কৃষিকার্য চালায় ?

৩। বিভিন্ন ঋতুতে লোকসমাজ ঘরবাড়ি ছাড়ে কেন ?

৪। লোকসমাজের বাসস্থানের বিবরণ দাও। কি কারণে এইরূপ বাসস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে ?

৫। আলমোরায় এত মেলা বসে কেন ? মেলায় এত লোকসমাগম হয় কেন ?

৬। আলমোরার হাট-বাজারের বিবরণ দাও।

৭। আলমোরার লোকসমাজকে বছরে বিভিন্ন ঋতুতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হয় কেন ?

নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে ভুল বাহির কর এবং সঠিক উত্তর দাও :—

(ক) আলমোরার লোকসমাজ প্রধানত কৃষিজীবী।

(খ) আলমোরার লোকসমাজ স্থায়ী ভাবে পাহাড়ের উপরে বাস করে।

(গ) আলমোরার লোকসমাজ গ্রামের দোকান হইতে কম্বল, ঘি, বাসনপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে।

(ঘ) তিব্বতীয়া বাগেশ্বরের মেলায় ছাতা, চিনি, সূতীবস্ত্র আমদানি করে।

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ ও কৃষি

আমরা ভারতের দুটি লোকসমাজের জীবনযাত্রা আলোচনা করিয়াছি, উহার একটি ফলমূল আহরণকারী, অপরটি কৃষিজীবী এবং পশুপালক। প্রাকৃতিক পবিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অনুযায়ী উহারা স্ব স্ব সমাজজীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। এইবার আমরা পশ্চিমবঙ্গে যে লোকসমাজের বাস উহাব সমাজজীবন আলোচনা করিব। পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজের সমাজজীবন যথেষ্ট উন্নত এবং বৈচিত্র্যময়, আন্দামান ও আলমোরাব লোকসমাজেব জীবনযাত্রার সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ লোকসমাজের জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। তাই প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ উহার ভৌগোলিক পরিবেশ একটু জানা দরকার।

প্রাকৃতিক দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চল। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত একট সুনির্দিষ্ট অঞ্চল রহিয়াছে। রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন। এই অঞ্চলে অবস্থিত তিনটি জেলা—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে এই অঞ্চল অপরূপ। ইহার শিয়রে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী দিনের বেলায় সূর্যালোকে উদ্ভাসিত থাকে। দুরন্ত পাহাড়ী নদীগুলি নীচে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে পর্বতের বরফ গলিয়া ঝরনার জলধারা বিপুল উচ্ছ্বাসে নীচে নামিয়া আসে। চারিদিকে গভীর অরণ্য, মাঝে মাঝে পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া সংকীর্ণ উপত্যকা এবং সমভূমি। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত অঞ্চলকে "তরাই" বলা হয়। শিলিগুড়ি

পশ্চিম বঙ্গ

(প্রাকৃতিক)

০ ৫০ ১০০

মাইল

নেপাল

ভুটান

গঙ্গা নং

বিহার

অজয়

দামোদর

মেদিনীপুর

উড়িষ্যা

বঙ্গোপসাগর

মহকুমা ও কার্সিয়াং-এর পূর্বাংশের সংকীর্ণ অঞ্চল "দার্জিলিং-তরাই" এবং কালিম্পং ও ভূটানের দক্ষিণে, তিস্তা ও সংকোশের মধ্যবর্তী অংশ "ডুয়ার্স" নামে পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে অবস্থিত মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও বর্ধমান জেলা। ২৪ পরগণার ভূমির উচ্চতা খুবই কম, ইহার দক্ষিণাংশে অসংখ্য খাড়ি, উহাদের মধ্য দিয়া সমুদ্রের জল জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা রুক্ষ প্রস্তরময় ভূমি। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও সদর মহকুমার একাংশ ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের মত জঙ্গলাকীর্ণ। এ জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর এবং কাঁথি থানার দক্ষিণ প্রান্ত সমুদ্র-বিধৌত।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য হইলেও উহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। উত্তরের হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল এবং দক্ষিণের সমতল অঞ্চল—মোটামুটি দুই ভাগে এই রাজ্যকে ভাগ করা যায়। আবার আসানসোল মহকুমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া ইহার লোক-সমাজের সমাজজীবনেও বৈচিত্র্য আছে। হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের কৃষিকার্য আর সমতল অঞ্চলের কৃষিকার্য একরূপ নয়। হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলে চোখে পড়িবে চা-বাগান এবং ঘন বন, আর সমতল অঞ্চলে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের মাঠ, মাঝে মাঝে পানের বরোজ, পাটের ক্ষেত ও রবিশস্যের বাগান।

কৃষি

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। প্রাচীনকাল হইতেই তাই বাঙ্গালী 'ভাতের ভক্ত'। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বলিয়া বাংলার খ্যাতি সুবিদিত। এই দেশের মধ্য দিয়া বহু নদ-নদী প্রবাহিত বলিয়া ইহা সুজলা। আমাদের

প্রথম হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির জলসিঞ্চিত ক্ষেতের মাটি নরম হওয়ায়, উহাতে চাষের খুবই সুবিধা।

পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন শস্য দুই ভাগে বিভক্ত,—খারিফ ও রবি বর্ষাকালে যে শস্য বপন করা হয়, তাহাকে খারিফ শস্য বলে। ধান, ভুট্টা, পাট, তুলা, আখ, তামাক, তিল প্রভৃতি প্রধান খারিফ শস্য। গম, যব, ছোলা, মটর, আলু, সরিষা প্রভৃতি রবি ফসলের অন্তর্গত।

সমতল অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের সব জমিতে সব ফসল সমান উৎপন্ন হয় না, কেননা প্রাকৃতিক অবস্থা এবং জমির উপর বিশেষ বিশেষ ফসলের উৎপাদন নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চল ধানের দেশ এবং পাটের দেশও বটে।

সমতল অঞ্চলে তিন রকমের ধান ফলে,—আউশ, আমন ও বোরো। বেশীর ভাগ জমিতেই আমন ধান উৎপন্ন হয়। অগ্রাণ মাসে এই ধান কাটা হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে আউশ এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে বোরো ধান পাওয়া যায়। আউশ এবং বোরো কিন্তু সব জেলায় উৎপন্ন হয় না, ইহার পরিমাণও কম। একই জমিতে তিনটি বা দুটি ফসল ফলান গেলে তো চাষীর খুবই সুবিধা হয়, কিন্তু জমির উপরই ফসল ফলা নির্ভর করে, তাহা মনে রাখা দরকার। নদীয়া জেলার কথাই ধরা যাক্। অন্য সব জেলায় আমনের পরিমাণই বেশী, কিন্তু এই জেলায় আউশ অনেক বেশী ফলে, আমন ফলে অনেক কম। বোরো ধানও সর্বত্র হয় না, নদীর চরে বিলের ধারে কিংবা জলাভূমিতে বোরো ধান রোপণ করিতে হয়।

বাংলায় কৃষক আইল-বাঁধা টুকরা টুকরা জমিতে পৃথক ভাবে চাষ করে। পিতার মৃত্যুর পরে ছেলেদের মধ্যে জমিজমা ভাগ

হইয়া যায়, ফলে একটি জমি বহু টুকরায় বিভক্ত হয়। টুকরা টুকরা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে চাষ করা কঠিন। এইরূপ জমিতে ফসল ভাল ফলে না। জমির উন্নতিও দুঃসাধ্য। এইরূপ জমিকে "অলাভজনক জোত" (Uneconomic holding) বলা হয়। মান্ধাতা আমলের পুরানো লাঙ্গল-বলদের সাহায্যে আজও কৃষক চাষ-বাস করে। ইহাতে পরিশ্রম হয় প্রচুর, উৎপাদন কম হয়। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেশে নাই বলিলেই চলে। কৃষি-যন্ত্রপাতির অনেক দাম, একটি ট্র্যাক্টর কিনিতে হাজার হাজার টাকা লাগে। দরিদ্র চাষী অত টাকা পাইবে কোথায়? তাছাড়া ভারতে ট্র্যাক্টর তৈরীর কারখানাও নাই।



আইল-বাঁধা টুকরা টুকরা জমি

চিত্রে তোমরা দেখিতেছ যে, একটি কৃষক আইল-বাঁধা এক টুকরা জমিতে চাষ করিতেছে। ইহাই সমতল অঞ্চলের সাধারণ ছবি। অন্য টুকরাগুলি অন্য চাষীদের। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পশ্চিম-বঙ্গের প্রতি কৃষক পরিবারের ভূমির গড় পরিমাণ মাত্র ৪.৮২ একর অর্থাৎ প্রায় ১৫ বিঘা। এক একটি পরিবারে অন্তত পাঁচ জন লোক থাকে। পাঁচ জনের একটি পরিবার কি ১৫ বিঘা জমি দিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে? যদি জমির ফলন খুব ভাল হয়, তাহা হইলে হয়তো ইহা সম্ভব। কিন্তু সরকারী কৃষি বিভাগ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতি একরে মাত্র ১৬ মণ ধান জন্মে, অর্থাৎ বিঘায় মাত্র ৫ মণ। বাংলার কৃষি অবনতির মুখে, জমির ফলন ক্রত

হ্রাস পাইতেছে। অপর দিকে জিনিসপত্রের দর ঊর্ধ্বমুখী, ফলে চাষীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচও বাড়িয়া চলিয়াছে। চাষীকে অনেক কিছুই বাজার হইতে কিনিতে হয়; যথা—কাপড়, জামা, তেল, নুন ইত্যাদি। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ আছে, রোগ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়, জমির জন্য বাৎসরিক খাজানা দিতে হয়



হালচাষ

স্বভাবতই চাষীর জীবনে দুঃখ ও দারিদ্র্য বাসা বাঁধিয়াছে। অগ্রাণ মাসে মাঠে মাঠে ধান, চাষী তখন মাঠের সম্রাট; চৈত্র-বৈশাখ মাসেই সে ফকির, তাহার ঘরে তখন ধান থাকে না। তাই তো দেখি চাষীর খাদ্য ভাত, ডাল ও শাকপাতা, তাহার পরনে মোটা ধুতি ও মলিন জামা। অধিকাংশই নগ্নপদে চলাফেরা করে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো তাহাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। স্বেচ্ছায় নয়, অবস্থার চাপেই তাহারা অশিক্ষিত থাকিতে বাধ্য হয়।

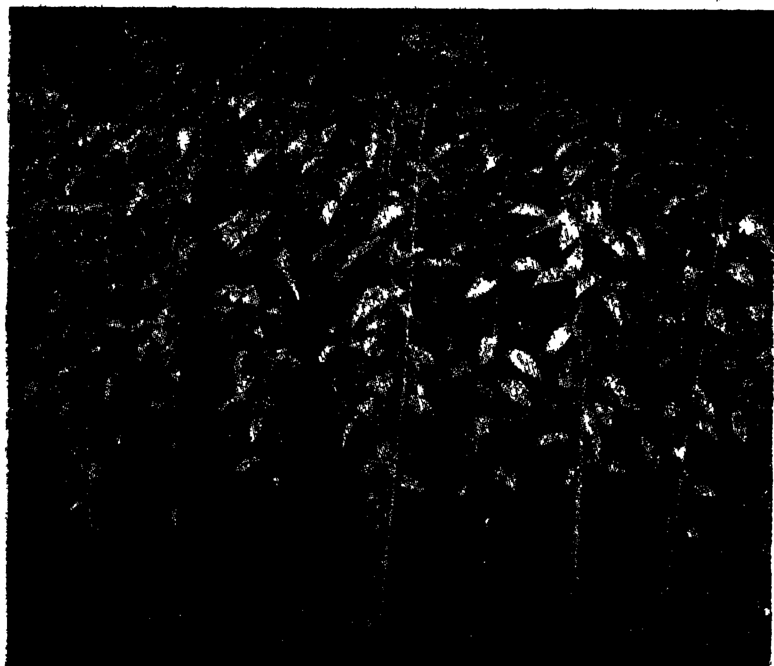
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে,—তাহা হইলে এত ধান যায় কোথায়? চাষী অগ্রাণ মাসে ধান কাটিয়া মনের আনন্দে নবান্ন উৎসব করে। পৌষ ও মাঘ মাসে সে ধান বিক্রী করিতে থাকে। সমতল অঞ্চলের হাটে-বাজারে তখন দারুণ কর্মচাঞ্চল্য। হাটের একটা বড় অংশ জুড়িয়া "ধানের হাট"। ধানের হাটে শুধু ধান। সহর হইতে ব্যাপারীরা আসে ধান কিনিতে। গরুর গাড়ি, নৌকা, রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি যোগে এই ধান তাহারা চালান দেয়। গ্রাম হইতে ধান বাহিরে চলিয়া যায়, সহর-বন্দরের চাউল কলগুলি এই ধান ব্যাপারীদের কাছ হইতে কিনিয়া লয়। চাউল-কলে ধান হইতে চাউল হয়। সহরবাসী বাজার হইতে ঐ চাউল কেনে। অবশ্য সব ধানই যে চাষী বেচে, তাহা নয়। বৎসরের খোরাকির জন্য কিছু ধান সে রাখে, কিছু ধান বাজারে বেচে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ধান সে বেচে কেন? ধান না বেচিলেই তো সে সুখে থাকিতে পারে। না, তা পারে না। ধান তাহার বেচিতেই হয়। ধান বেচিয়া যে পয়সা সে পায়, উহা হইতেই সে কাপড়, তেল, নুন কেনে ও খাজানা পরিশোধ করে। শুধু ভাতই তো মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণ করে না—বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও মানুষের জীবনে কম প্রয়োজনীয় নয়।

ফলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান খুবই নীচু। তাহাদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ পশ্চিমের সভ্য দেশের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। ইহারা যেন কোনরকমে বাঁচিয়া আছে। অনেক সময় ইহাদের অনেকের দু'বেলা অন্নও জোটে না। মাঝে মাঝে আবার অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন ও বন্যা আসে, কৃষকের জীবন তখন দুঃখ, হতাশা ও গ্লানিতে ভরিয়া উঠে।

কিন্তু কৃষক শুধু কি ধানই উৎপন্ন করে? আর কিছু হইতে কি

তাহার দু'পয়সা আয় হয় না? সমতল অঞ্চলে শুধু ধানই হয় না, পাটও উৎপন্ন হয়। পাট প্রধানত উৎপন্ন হয় কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, ২৪-পরগণা, হুগলী ও নদীয়া জেলায়। অর্থাৎ সব জেলায় পাট হয় না। আবার যে জেলায় পাট

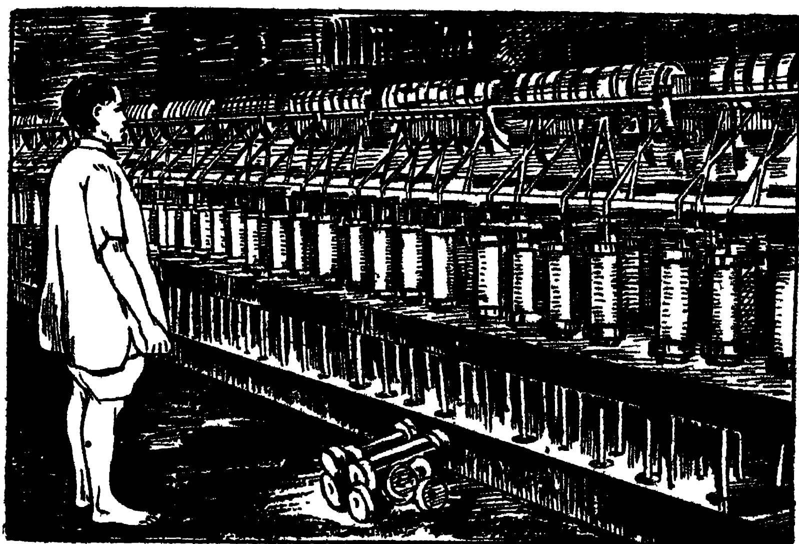


পাট গাছ

হয়, উহা জেলার বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। সুতরাং পাটের সুফল সব জেলার কৃষকই ভোগ করিতে পারে না।

বাংলার সোনার ফসল পাট। পৃথিবীর মধ্যে বাংলা দেশেই সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। ভাগীরথীর তীরে যে পাটকলগুলি

অবস্থিত উহাদের যে কাঁচা পাটের প্রয়োজন উহা বাংলার গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন হয়। পাট হইতেই তৈয়ারী হয় বস্তা, দড়ি, থলে ইত্যাদি। দেশ-বিদেশে উহার বিপুল চাহিদা। তাই পাট কৃষকের অর্থকরী ফসল।



একটি চটকলের অভ্যন্তরভাগ

পাট সে খায় না, বেচে এবং ইহা বেচিয়া তাহার অর্থ আয় হয়। অনেক আশা লইয়া কৃষক তাই পাট উৎপন্ন করে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে নিম্নবঙ্গের গ্রামে গেলে তোমরা দেখিবে ডোবায় ও পুকুরে পাট পচান হইতেছে। পচা পাটের গন্ধে বাতাস ভরপুর। একহাঁটু জলে কৃষক পচা পাটগাছ কাঠে আছড়াইয়া রেশমের মত নরম পাট বাহির করিতেছে। তারপর পাট শুকাইবার পালা। পাট গাছ শুকাইয়া পাটকাঠি পাওয়া যায়। জ্বালানিরূপে, ঘর ও ক্ষেতের বেড়ার কাজে পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়

ধানের মত পাটও বাজারে আসে। হাটে হাটে তখন গাদা গাদা পাট। সহর হইতে ব্যাপারীরা ছুটিয়া আসে, গ্রাম-গ্রামান্তরের হাটে হাটে। ইহারা পাট কেনে। গরুর গাড়ি, নৌকা, মোটর ও রেলগাড়ি যোগে পাট তাহারা সহরে চালান দেয়। আর এই পাট কেনে পাটকলগুলির মালিকেরা।

কিন্তু পাট বেচিয়া কৃষকের কি খুব বেশী লাভ হয়? বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, তাহা হয় না। কৃষক পাটের ন্যায্য দর পায় না, কারণ ব্যাপারীরা পাট সস্তায় কেনে, এবং বেশী দরে পাটকল মালিকদের কাছে বেচে। ব্যাপারীরা উপর টপ্‌কা লাভ লোটে বলিয়া কৃষক দর কম পায়। তাহারা যদি সরাসরি পাটকলগুলির মালিকদের কাছে পাট বেচিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের আয় বেশী হইত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কৃষক মণপ্রতি পাটের দর পায় প্রায় ২৪।২৫ টাকা, অথচ কলিকাতার বাজারে মণপ্রতি পাটের দর ৩০।৪০ টাকা। এই হিসাব সব বছরেই অবশ্য সমান হয় না। কিন্তু হিসাবে উনিশ-বিশ হইলেও ইহা স্পষ্ট যে, চাষী পাট বেচিবার সময় যে দর পায়, উহা মিল-মালিকদের কাছে বেচিয়া ব্যাপারীরা অনেক বেশী দর পায়। অর্থাৎ ফরিয়া ও ব্যাপারীরা উপর টপ্‌কা লাভ লইয়া যায়, আর চাষী ন্যায্য দর হইতে বঞ্চিত হয়।

দর পাটচাষের আরও একটি দিক আছে। ধানের জমিতেই কৃষককে পাট উৎপন্ন করিতে হয়; ফলে ধানের জমি হ্রাস পায়। সমতল অঞ্চলে গত কয়েক বৎসরে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, ধানের জমিতে কৃষক পাট লাগাইতেছে,—বেশী আয়ের আশায়। দেশ-বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের পাট অঞ্চল পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গেই উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে পাটকলগুলি অবস্থিত। তাই কাঁচা পাট না হইলে তো চলেই না। পাটে স্বয়ংসম্পূর্ণ

হইবার জন্য রাজ্যসরকার চাষীকে পাট উৎপন্ন করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহারই ফলে পাটের জমির পরিমাণ গত কয়েক বৎসরে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় পূর্বে পাট বিশেষ উৎপন্ন হইত না, বর্তমানে কিন্তু এই সব জেলাতেও ধানের জমিতে পাট লাগান হইতেছে। কিন্তু পাটের ন্যায্য দর চাষী যদি না পায়, তাহা হইলে ধানের জমিতে পাট লাগাইয়া তাহার কি লাভ?

পাটচাষীর এই সমস্যা অতি বাস্তব। সরকার পাটচাষীকে রক্ষা করিবার জন্য তাই সমবায় আন্দোলন ও সমবায় সমিতি গঠনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। সমবায়-সমিতির পাটচাষীরা পাট ব্যাপারীদের কাছে না বেচিয়া সরাসরি সরকারী গুদামে জমা দিবে এবং কিছু টাকা অগ্রিম পাইবে। সরকার ঐ পাট সুবিধাজনক দরে বেচিয়া চাষীর প্রাপ্য মিটাইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থাই পাটচাষীদের রক্ষা করিতে পারে। /

হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চল যেমন ধান ও পাটের দেশ, উত্তরের হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল তেমনি প্রধানত চা-বাগানের দেশ। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স অঞ্চলেই চা-বাগানগুলি কেন্দ্রীভূত। জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫৮টি এবং দার্জিলিং জেলায় ১৩৮টি চা-বাগান বর্তমানে চালু আছে।

পাটের মত চা-ও পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। বিদেশের বাজারে চা-এর বিপুল চাহিদা, যেহেতু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রাত্যহিক অভ্যাস চা-পান। বিদেশে চা বেচিয়া আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি, আর এই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া আমরা বিদেশ

হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করি। কলিকাতা বন্দরে দেশ-বিদেশের জাহাজ নোঙর ফেলে চা ও পাটের জন্য।

পাটের জমি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকের নিজস্ব সম্পত্তি, জমির পাটের মালিকও সে নিজে। চা-বাগানের মালিক কিন্তু চা-শ্রমিকেরা

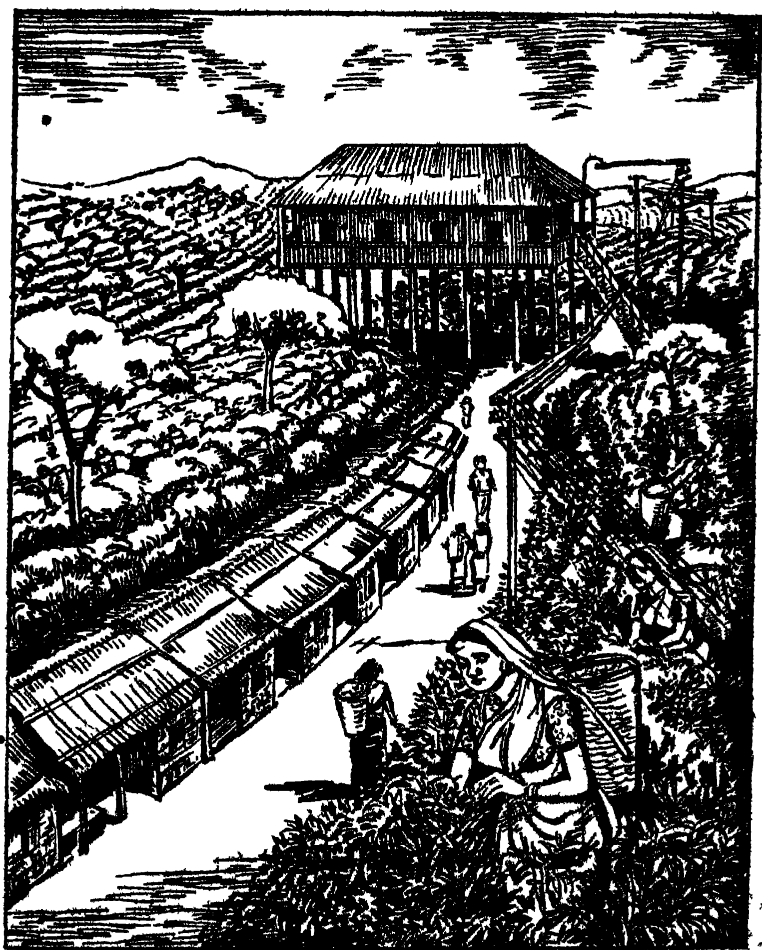


চা-বাগান

নয়, একদল ইউরোপীয় ও দেশী ধনী চা-বাগানের মালিক। ইহাদের মূলধনে এবং পরিচালনায় চা-বাগানগুলি চলে। শ্রমিকেরা দৈনিক মজুরির বিনিময়ে বাগানে কাজ করে। নানা জাতির শ্রমিক বাগানে দেখা যায়—ভুটিয়া, নেপালী, ওরাওঁ, মুণ্ডা ও সাঁওতাল।

ডুয়ার্স অঞ্চলে কিংবা দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে গেলে তোমাদের চোখে পড়িবে মাঠের পর মাঠ শুধু সবুজ চায়ের বাগান। মজুর-মজুরনীরা বাগানে পিঠে বাঁধা ঝুড়িতে দুটি পাতা, একটি কুঁড়ি তুলিতেছে, উদয়াস্ত নিঃশব্দে ঐ একই কাজ তাহারা করিয়া চলিয়াছে। বাগানের মধ্যেই মজুরদের বস্তি, কাজের শেষে ওরা বস্তিতে চলিয়া আসে, ছেলে-মেয়েদের সংগে মিলিত হয়। বাগানের মধ্যেই সুন্দর সুন্দর বাংলো,

ম্যানেজার ও কর্মচারীরা সেখানে বাস করেন। বাগানের মাঝখান দিয়া সরু সরু রাস্তা, ঐ পথেই লোকে যাতায়াত করে। মস্ত বড় গুদামঘরে



চা-বাগানের দৃশ্য

পরে চা-পাতাগুলি রাখা হয় এবং শুকাইবার ব্যবস্থা হয়। শুকাইবার

পরে সবুজ পাতাগুলি কাল্‌চে শ্যামবর্ণ হইয়া যায়। চা-পাতার উপরে চায়ের ভালমন্দ নির্ভর করে। নানা গন্ধ ও রকমের চা বাক্স-বোঝাই হইয়া দেশ-বিদেশে চালান যায়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রশস্ত ঝকঝকে রাস্তা চোখে পড়িবে, এই রাস্তাগুলি দিয়া ট্রাক-বোঝাই চা বাহিরে চালান যায়।

চা-বাগানের আশেপাশে ছোট ছোট জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় আড়াই লক্ষ মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিক চা-বাগানে কাজ করে। চা-বাগানের কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবারবর্গের সংখ্যাও কম নয়। দোকান-পাট, হোটেল, খাবারের দোকান, বাস ও ট্রাকের জন্য পেট্রল পাম্প প্রভৃতি এই সব জনপদে গড়িয়া উঠিয়াছে। মজুর-কর্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা চাহিদা ইহারা পূরণ করে। কয়েকটি চা-বাগানে সুন্দর হাসপাতাল, পার্ক ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। তবে বেশীর ভাগ চা-বাগানেই শ্রমিকদের বস্তিগুলি অপরিসর এবং নোংরা। বাগানে পানীয় জলের অভাব খুব বেশী। বহু দূরে অবস্থিত ঝরনা হইতে ইহাদের জল আনিতে হয়।

হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের লোকসমাজের জীবিকার উৎস কি শুধু চা-বাগান? না। এই অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, মারুয়া, তামাক প্রভৃতিও জন্মে। কোচবিহারের বিরাট অঞ্চলে তামাকের চাষ। পাটের মত তামাকও একটি অর্থকরী ফসল। হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের মানুষকে তাই কৃষিজীবীও বলিতে হয়, তাহারা শুধু চা-বাগানের মজুরই নয়। ইহাও অনেক সময় দেখা যায় যে, একই পরিবার চা-বাগানেও মজুরি করে, আবার মাঠেও লাঙল দেয়; চা-বাগানের কাজ সারা বৎসর থাকে না। তাই ইহারা কৃষিকার্যও করিতে পারে। একই গ্রামে কিছু দূরে দূরে চা-বাগান এবং ধান, ভুট্টা, মারুয়ার ক্ষেত চোখে পড়ে।



নদীর স্রোতে কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে

এই অঞ্চলের লোকসমাজের আর একটি জীবিকা কাঠের ব্যবসায়। শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছ এই অঞ্চলে বিস্তর জন্মে। ডুয়ার্সে ঘন শালের বন চোখে পড়ে। এই অঞ্চলে কাঠের চাহিদাও বিপুল। ঘরবাড়িগুলি বেশীর ভাগই কাঠের তৈরী। পাহাড়ের উপর ইটের ঘর তোলা খুবই কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। ইট, সুরকি, সিমেন্ট দূর দূর পার্বত্য অঞ্চলে বহন করিয়া নেওয়াও সহজ নয়। তাই সহজলভ্য কাঠই স্থানীয় লোকসমাজ ব্যবহার করে। বাড়ির মেঝে ও ছাদও কাঠের তৈরী। খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র তো সর্বত্রই কাঠের তৈরী। তোমাদের স্কুলের চেয়ার, বেঞ্চগুলিও কাঠের তৈরী। তাই কাঠের চাহিদা শুধু এই অঞ্চলেই নয়, রাজ্যের সর্বত্রই আছে। কাঠের ব্যবসায় স্বভাবতই খুব লাভজনক।

কাঠের ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলে ছোট ছোট কারখানাও তৈরী হইয়াছে। কাঠের কারখানায় নানা কাঠের জিনিস তৈরী হয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উহা চালান যায়। আলিপুর দুয়ার, শিলিগুড়ি, মাল, জলপাইগুড়িতে বড় বড় কারখানা আছে। অর্থাৎ কাঠ হইতে বহু লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হয়।

পাহাড়ের বন-জঙ্গল হইতে কাঠ সত্বর কিভাবে আসে? তোমরা বলিবে—কেন, রেলগাড়িতে? কিন্তু রেললাইন তো সর্বত্র নাই, মোটরের রাস্তাও নাই। মনে রাখিবে এই অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চল। উঁচু উঁচু পাহাড়ের উপর গ্রাম ও জনবসতি। তাই রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি ছাড়াও কাঠ পাঠাইবার এক অভিনব পদ্ধতি স্থানীয় লোকসমাজ আবিষ্কার করিয়াছে। উহারা ভারী কাঠের গুঁড়ি এবং কাঠ নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। পাহাড়ী নদীগুলি খরস্রোতা, তাই লম্বা কাঠ স্রোতের টানে ভাসিতে ভাসিতে ছুটিয়া যায়। স্রোতের টানে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে কাঠগুলি পৌঁছায়।

নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে একদল লোক নদীর পারে হাজির হয় এবং ভাসিয়া-আসা কতক কাঠ ডাঙ্গায় তোলে এবং কতক বাঁধিয়া স্থানে স্থানে চালান দেয়। কিছু লোকও কাঠের সঙ্গে থাকে।

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে লোকসমাজ প্রধানত ধান চাষ করে কেন?
২। পাটের চাষ সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে কেন?
৩। পাটের এত চাহিদা কেন?
৪। চাষী কি পাটের ন্যায্য দর পায়?
৫। কৃষক টুকরা টুকরা জমিতে ধান চাষ করে কেন?
৬। জমিগুলি আইল-বাঁধা কেন?
৭। কৃষক ধান বেচে কেন?
৮। কৃষক সহরবাসীর অন্নদাতা—এই কথা বলা হয় কেন?
৯। ধান ও পাট চাষ করা সত্ত্বেও কৃষক এত দরিদ্র কেন?
১০। চা-বাগানের মালিক কাহারা?
১১। চা-শ্রমিকদের পিঠে ঝুড়ি থাকে কেন?
১২। চা-বাগানের মধ্যেই মজুরদের বস্তি থাকে কেন?
১৩। হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের লোকসমাজ কাঠের বাড়িতে বাস করে কেন?
১৪। উহারা নদীতে কাঠ ভাসাইয়া দেয় কেন?
১৫। চা-বাগানের জনপদ কাহাদের লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে?

শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :—

(১) পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলের লোকসমাজ প্রধানত—উৎপন্ন করে।
(২) চাষী পাটের—দর পায় না।
(৩) কৃষকরা—জমিতে ধান চাষ করে।
(৪) হিমালয়াঞ্চলিক লোকসমাজ—বাড়িতে বাস করে।
(৫) হিমালয়াঞ্চলিক লোকসমাজ প্রধানত—উৎপন্ন করে।
(৬) হিমালয়াঞ্চলিক লোকসমাজ—কাঠ ভাসাইয়া দেয়।
(৭) চা-বাগানগুলি—অঞ্চলে অবস্থিত।
(৮) চা-বাগানে মজুর-মজুরনীরা—তোলে।

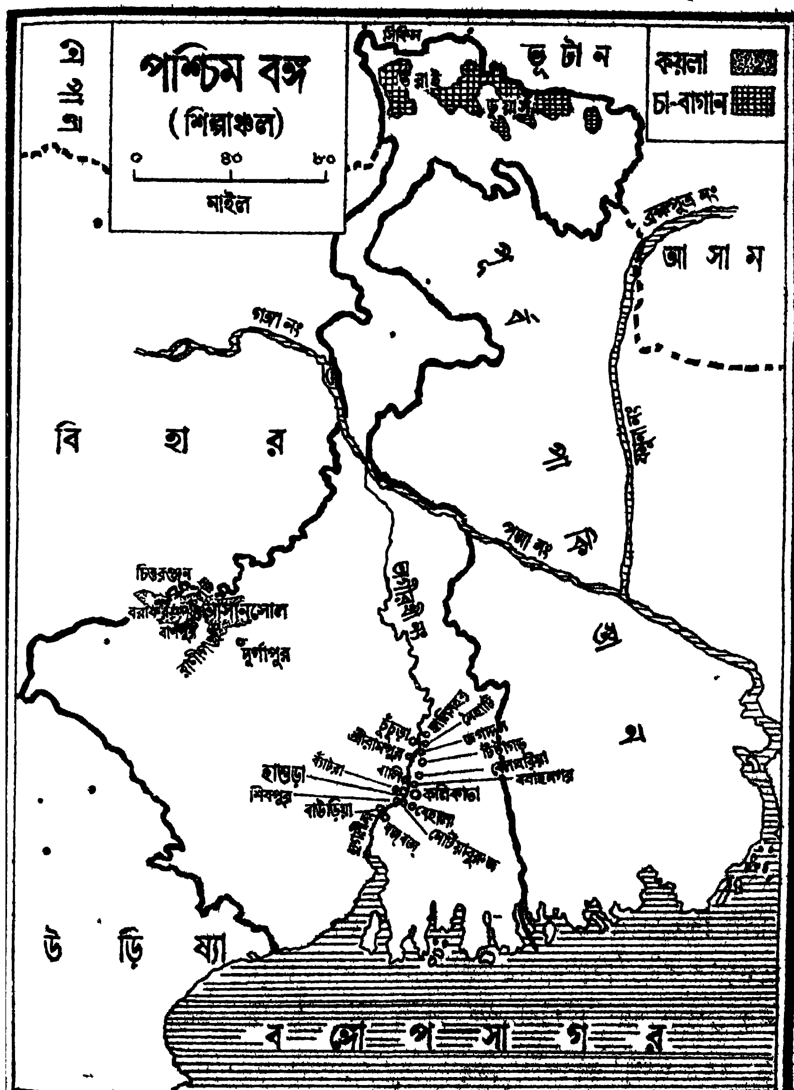
পঞ্চম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ ও শিল্প

লোকসমাজের অর্থনৈতিক জীবনের তুটি স্তম্ভ—কৃষি ও শিল্প। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ, লোকসমাজের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য উভয়েরই উন্নতি প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষির বিবরণ তোমরা পড়িয়াছ। এইবার উহার লোকসমাজ কি কি শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা বলা হইবে। শিল্প গড়িয়া তুলিবার ফলেই স্থানীয় লোকসমাজের জীবন-যাত্রার গভীর পরিবর্তন আসিয়াছে।

লোকসমাজেব জীবনে শিল্প এত গুরুত্বপূর্ণ কেন তাহা প্রথমেই জানা দরকার। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সমাজজীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে হইলে শিল্পের একান্ত প্রয়োজন। গৃহনির্মাণের জন্য আমাদের টিন, সিমেণ্ট, লোহার জিনিসপত্র লাগে। পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত কাপড়। জ্বালানির জন্য কয়লা চাই। ইঞ্জিন, রেললাইন, মোটরগাড়ি, সাইকেল, উড়োজাহাজ প্রভৃতি নির্মাণের জন্য প্রচুর লোহা এবং ইস্পাতের প্রয়োজন। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি পদে শিল্প মানুষের নানা চাহিদা পূরণ করে। তাই পৃথিবীর উন্নত লোকসমাজগুলি কাপড়ের কল, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, সিমেণ্টের কারখানা, কাগজের কল ইত্যাদি নির্মাণ করে এবং এই ভাবে সস্তায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে লোকসমাজে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করে। শিল্প দেশের সম্পদও সৃষ্টি করে। শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে বেচিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং হইতেছে। দেশের শিল্প উন্নত হইলে আমরাও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিব।

কিন্তু সব দেশই কি শিল্পে উন্নত হইতে পারে? শিল্পে উন্নত হইতে


পশ্চিম বঙ্গ
(শিল্পাঞ্চল)
০ ৪০ ৮০
মাইল
ভুটান
কয়লা
চা-বাগান
আসাম
বিহার
উড়িষ্যা
গঙ্গা নং
পদ্মা নং
চিত্তরঞ্জন
আসানসোল
দুর্গাপুর
চুঁচুড়া
শ্রীরামপুর
হাওড়া
শিবপুর
বাউড়িয়া
কলিকাতা
টিটাগড়
বরাহনগর
বঙ্গোপসাগর

হইলে কি কি জিনিসের প্রয়োজন? এইখানেই প্রাকৃতিক সম্পদের কথা আসে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর লোক-সমাজের জীবন অনেকটা নির্ভর করে। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে দীন, উহার লোকসমাজের পক্ষে উন্নতি লাভ কবা খুব কঠিন। শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, দেশের খনিজ সম্পদ আছে কি-না। খনিজ সম্পদকে ভিত্তি করিয়াই কোন দেশ বা কোন দেশের কয়েকটি অঞ্চলে শিল্প গড়িয়া তোলে।

অবশ্য শুধু খনিজ সম্পদ থাকিলেই শিল্পে উন্নতি লাভ কবা যায় না। খনিজ সম্পদ কাজে লাগাইবার দায়িত্ব লোকসমাজেব। বিজ্ঞানেব জ্ঞান না থাকিলে লোকসমাজ খনিজ সম্পদকে কাজে লাগাইতে পাবে না।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক্। খনিজ সম্পদে এই রাজ্য দীন নয়। কয়লা, লোহাপাথর, চীনামাটি, অভ্র, তামা, পেট্রল, বালি প্রভৃতি নানা খনিজ সম্পদ পশ্চিমবঙ্গে অল্পবিস্তব আছে। কিন্তু এই সকল খনিজ সম্পদের সদ্ব্যবহার কি আমরা শিখিতে পারিয়াছি? না, পারি নাই, এবং ইহা পারি নাই বলিয়া সম্ভাবনাব তুলনায় আজও আমবা শিল্পে অনুন্নত। অবশ্য কিছু কিছু শিল্প এই রাজ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিছু কিছু খনিজ সম্পদকে আমরা কাজে লাগাইয়াছি। ইহাব ফলে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই শিল্পে সবচেয়ে সমৃদ্ধ বাজ্যরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে; যথা—কয়লা শিল্প, পাট ও চা-শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাপড়ের কল, কাগজের কল, দিয়াশলাই কারখানা, অ্যালুমিনিয়ম কারখানা, কাঁচ শিল্প, চাউল-কল, চিনির-কল, ময়দা-কল, তেল-কল ইত্যাদি।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলি কয়েকটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল চারিটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত; যথা—(১) আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল, (২) হুগলী-হাওড়া

অঞ্চল, (৩) ব্যারাকপুর-কলিকাতা অঞ্চল এবং (৪) দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স অঞ্চল। ইহার কারণ কি? খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, কাঁচা মালের সরবরাহ, যানবাহনের সুবিধা, মজুর সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এই চারিটি অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই শিল্পগুলি এই অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কয়লা শিল্প

বর্ধমান জেলার আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা শিল্প কেন্দ্রীভূত। এই অঞ্চলেই কয়লাখনিগুলি অবস্থিত। ইহাই ভারতের প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল। কয়লার সন্ধানেই মানুষ এই অঞ্চলে ছুটিয়া গিয়াছে এবং ক্রমশ কয়লা শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে ২৭৯টি কয়লাখনি চালু আছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বৃটিশ মূলধনে এবং পরিচালনায় এই অঞ্চলে খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের কাজ সুরু হইয়াছিল। বর্তমানেও এই শিল্পে বৃটিশ মূলধনই প্রধান। কয়লার গুরুত্ব অপরিসীম। রেলগাড়ি, স্টিমার, জাহাজ, পাটকল, কাপড়ের কল, লোহালক্করের কারখানা প্রভৃতিতে কয়লা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রতিদিন হাজার হাজার মণ কয়লার প্রয়োজন।

বর্ধমানের কাছেই আসানসোল। আসানসোল স্টেশন হইতে একটু ভিতরের দিকে গেলেই কয়লাখনি চোখে পড়িবে। শত শত মজুর এখানে কাজ করে। পার্শ্ববর্তী বীরভূম, মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলা হইতে মজুরেরা কাজ করিতে আসে। মজুরদের মধ্যে মেয়ে এবং পুরুষ দুই-ই আছে। খনির স্তর চার ফুট হইতে দুই হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর। যন্ত্রের সাহায্যে মজুরেরা নীচে নামিয়া যায় এবং স্তরে স্তরে রক্ষিত কয়লা কাটিয়া যন্ত্রের সাহায্যে উপরে পাঠায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই পাতালপুরীতে মজুরেরা কয়লা কাটে। পাতালপুরীতে

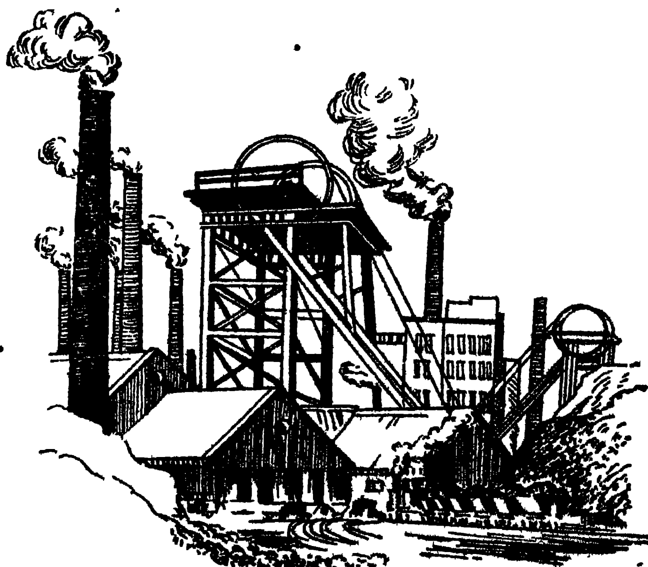
নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তাই এখানে আলোর ব্যবস্থা থাকে। চলাফেরার জন্য সংকীর্ণ রাস্তাও আছে। মাটি খুঁড়িলেই জল বাহির হয়, তাই পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশিত করিবার ব্যবস্থা প্রথমেই করিতে হয়। খনির উপরে আর একদল মজুর কাজ করে। ইহারা যন্ত্র চালায়; এই যন্ত্রই নীচ হইতে কয়লা উত্তোলন করে। আর একদল মজুর উত্তোলিত কয়লা গাড়িতে করিয়া গুদামে পাঠায়। প্রত্যেক খনিতে একজন ম্যানেজার থাকেন, খনির যাবতীয় 'কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পবিচালনার দায়িত্ব তাঁহার।

খনির নিকটেই মজুরদের বস্তি, ম্যানেজাবের বাংলো এবং কর্মচারীদের বাড়ি। ছোট ছোট দোকানপাট। চা-এর দোকান, পান-বিড়ির দোকান ইত্যাদি। দুই-এক মাইলের মধ্যেই হাট-বাজার।

হাজার হাজার মজুর কয়লাখনিতে কাজ করে। ১৯৪৯-৫০ সনে মেয়ে এবং পুরুষ মজুরের মোট সংখ্যা ছিল ৮১,৫৭৬ জন। মজুরেরা কাজের জন্য দৈনিক মজুরি পায়। যাহারা মাটির নীচে কাজ করে, উহারা দিনে ২ টাকা ৫ আনা ৬ পাই মজুরি পায়। যাহারা উপরে কাজ করে, তাহাদের মজুরি ২ টাকা ৩ আনা ৬ পাই। সর্দার ও ফোরম্যানরা গড়ে ৩ টাকা ৪ আনা ৬ পাই মজুরি পায়।

পাতালপুরীতে নিঃসীম অন্ধকার। খনিতে কাজ করা যেমনি কঠিন, তেমনি উহা বিপজ্জনক। খনিতে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। প্রবল বন্যায় মাটির ধস ভাঙ্গিয়া পড়ে, খনি জলপ্লাবিত হইয়া যায়। হঠাৎ খনিতে আগুন ধরিয়া যায়, এবং কর্মরত মজুরেরা আগুনে পুড়িয়া মরে। এই তো সেদিন আসানসোলের চিনাকুড়ি খনির খাদে আগুন ধরিয়া যায়, সেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং কর্মরত প্রায় দুই শত মজুর মারা যায়। তবু মজুরেরা খনির খাদে কাজ করিতে ছুটিয়া যায়, কাজ না করিলে তাহারা কি করিয়া বাঁচিবে আর তাহারা কাজ না করিলে

কয়লা—যাহাকে বলা হয় "কালো মাণিক"—তাহার সুফল তো লোক-সমাজ ভোগ করিতে পারিবে না! কয়লা আমরা রন্ধনে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করি। রেলগাড়ি, জাহাজ, কাপড়ের কল, পাটকল এবং আরও অনেক কলকারখানায় কয়লা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতেই কোক তৈয়ারী হয়।



কয়লাখনি

কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চল এক সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছে। মৌচাকের মত ইহার চারিদিকে রহিয়াছে কয়লাখনি, বড় বড় কারখানা, মজুরদের বস্তি, কর্মচারীদের বাড়ি, দোকানপাট, সুন্দর সুন্দর রাস্তা। বৈদ্যুতিক আলো সমগ্র অঞ্চলটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। আসানসোল একটি বড় রেলস্টেশন।

কলিকাতা, উত্তরপ্রদেশ, ধানবাদ, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত অসংখ্য রেললাইন দ্বারা ইহা সংযুক্ত। এই পথেই সারা ভারতে কয়লা চালান যায় এবং মজুর-কর্মচারীরা দলে দলে অল্প সময়ে এই অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

আসানসোলের নিকটেই, মাত্র দুই মাইল দূরে বার্নপুর। ভারতের অন্যতম প্রধান লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, "দি ইণ্ডিয়ান আয়রন



বার্নপুরের ইস্পাত কারখানার চুল্লী

এণ্ড স্টীল কোম্পানী" এই বার্নপুরে অবস্থিত। বৃটিশ প্রতিষ্ঠান মার্টিন-বার্ন কোম্পানী এবং বাঙালী শিল্পপতি স্যার আর. এন. মুখার্জির পরিচালনায় এই কারখানাটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইতিপূর্বে কুলটিতে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী নামে একটা লৌহ কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৩৬ সনে এই কোম্পানীটি বার্নপুরের আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায় এবং উহার নূতন নাম হয় স্টীল করপোরেশন অব বেঙ্গল (SCOB)। ১৯৫৩ সনে স্টীল করপোবেশন অব বেঙ্গল (SCOB) এবং ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর (IISCO) মিলন ঘটে। বর্তমানে এই মিলিত কোম্পানীর নাম—দি ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড। এই মিলনের ফলে বার্নপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আরও বড় আকার ধারণ কবিয়াছে এবং উহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সন হইতে ১৯৫৫-৫৬ সন—এই পাঁচ বৎসরে বার্নপুরের কারখানাগুলিতে প্রতি বৎসর গড়ে নিম্নলিখিত পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে ঃ

পিগ আয়বন……………	৪, ৮০, ০০০	টন
কোক……………………	৬, ৯০, ০০০	,,
স্টীল ইনগোট্‌স……… ..	৪, ৪০, ০০০	,,
বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত……	৩, ৬০, ০০০	,,
আলকাতরা……………	২৯, ০০০	,,
সালফেট অব অ্যামোনিয়া…	১০, ০০০	,,
সালফিউরিক অ্যাসিড………	১২, ০০০	,,

বার্নপুরের ইস্পাত কারখানা (IISCO) ভারত সরকার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। উহার লক্ষ্য, বৎসরে ইস্পাতের উৎপাদন ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা।

বার্নপুরে ঢুকিতেই চোখে পড়িবে আকাশ-ছোঁয়া চুল্লী এবং চিমনি, জলের ট্যাঙ্ক, পেট্রোল পাম্প, দৈত্যকায় কারখানা। হাজার হাজার মজুর-কর্মচারীর কলকোলাহলে মুখর নগরী। দিবারাত্র এখানে কাজ

হইতেছে। কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিলে নানা বিচিত্র যন্ত্রপাতি চোখে পড়িবে, যন্ত্রগুলি স্বয়ংক্রিয়, চলমান যন্ত্রগুলিই যেন কারখানার হাত-পা। সব কাজ যেন যন্ত্রগুলিই করিতেছে। একটি যন্ত্র রাশি রাশি লৌহপাথর (Iron ores) বহন করিয়া একটি বিরাট চুল্লীতে (Blast furnace) ফেলিতেছে। চুল্লীতে লৌহপাথর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত হইতেছে। আবার একটি যন্ত্র ঐ লৌহপিণ্ড আর একটি চুল্লীতে ফেলিতেছে, উহাতে লৌহপিণ্ড গলান হইতেছে। তরল লৌহ হইতেই আর একটি প্রক্রিয়ায় স্টীল বা ইস্পাত তৈরী হইতেছে। ইস্পাত হইতেই লম্বা লম্বা রেললাইন, রেলগাড়ির চাকা, এবং অন্যান্য নানা জিনিস তৈরী হইতেছে "রোলিং মিলে"। এখানে যেন একটা বিরাট যন্ত্রদানব কাজ করিতেছে। উহার পেটের মধ্যে লৌহ গলান হইতেছে, উত্তপ্ত তরল লৌহ দৈত্যদানব উহার হাত দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতেছে, তারপর ছাঁচে ফেলিয়া তৈরী করিতেছে রেললাইন, চাকা ইত্যাদি। সব কাজ-গুলিই দ্রুত এবং অদ্ভুত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে।

কিন্তু এই যন্ত্র-দানবকে চালায় কে? বিদ্যুৎ, বিদ্যুতের শক্তি। আর এই বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগায় মানুষ। নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে নানা কল আছে, মানুষই উহা চালায়। আগুনের চুল্লীর সামনে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সবুজ চশমা-পরা এই মানুষদের দেখা যায়, ক্রেনের উপর ইহারা আছে, পাওয়ার হাউসে ইহারা বসিয়া সতর্ক ভাবে বিদ্যুৎশক্তি পরিচালনা করে, ল্যাবরেটরীতে বসিয়া ইহারা তরল লোহা ও ইস্পাত পরীক্ষা করে। ইহাদের কাজে একটু অসতর্কতা বা অসাবধানতা আসিলেই সর্বনাশ, ইহারা কাজ না করিলে যন্ত্র-দানবটিও হাত-পা গুটাইয়া অচল হইয়া পড়িবে।

যে চুল্লীতে লৌহপাথর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত হয়, উহা কিন্তু [illegible] কোক (Coke)। খনি হইতে প্রাপ্ত কয়লার ইংরাজী নাম কোল

(Coal)। রুদ্ধ পাত্রে কোল পোড়াইয়া কোক তৈয়ার হয়, লৌহ নিষ্কাশনের জন্য এই কোক অপরিহার্য। সুতরাং কারখানায় কোল হইতে কোক তৈরী করিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

আসানসোলের মত বার্নপুরও এক সমৃদ্ধ জনপদ। আসানসোলে খনিগুলি ইতস্তত ছড়ানো, কিন্তু বার্নপুরে একটি দৈত্যকায় কারখানার মধ্যেই নানা প্রক্রিয়ায় লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ার হয়। ফলে বার্নপুরে একটি সুঠাম নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। কারখানার আশেপাশে মজুরদের বস্তি, ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের সুন্দর সুন্দর বাড়ি, প্রশস্ত ঝকঝকে রাস্তা। নগরী বিদ্যুতে আলোকিত।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা

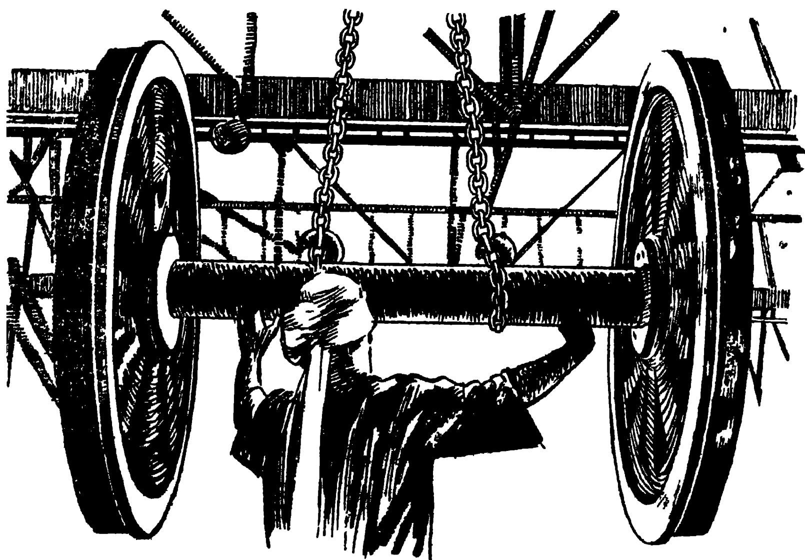
আসানসোলের নিকট বার্নপুরের মত আর একটি শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে চিত্তরঞ্জনে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় এখানে স্থাপিত হইয়াছে একটি লোকোমোটিভ কারখানা। 'লোকোমোটিভ' অর্থে বুঝায় চলিষ্ণু ইঞ্জিন। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ভারতে রেলগাড়ি চলিতেছে, কিন্তু রেলগাড়ির ইঞ্জিন ভারতে তৈরী হইত না, বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। আর এই ইঞ্জিন আমদানি করিতে প্রতি বৎসর ভারতের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। ১৯৪৮ সনে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে রেলগাড়ির ইঞ্জিন দেশেই তৈরী হইতে পারে। ১৯৫৫ সনের নভেম্বর পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনে ৩০০ ইঞ্জিন তৈরী হইয়াছে।

একটি বিরাট এলাকা জুড়িয়া চিত্তরঞ্জন কারখানা। এই কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। ইঞ্জিন তৈরী হয় ইস্পাতে, তাই লোহা হইতে ইস্পাত তৈরীর জন্য কারখানায় ব্যবস্থা আছে। ইঞ্জিন তৈরী [illegible] লাগে, কয়লাও লাগে, হুইল

বা চাকা লাগে। কারখানার বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন রকমের কলকব্জা



বয়লার তৈরীর বিভাগ



ইঞ্জিনের চাকা তৈরী হইয়া নীচে নামিতেছে

তৈরী হয়। একটি বিশেষ বিভাগে বয়লার প্রস্তুত হয়। কারখানার একটি প্রকাণ্ড ঘর আছে, উহার নাম "মেইন এ্যাসেম্ব্লি শপ" (Main Assembly Shop), এই "শপ"-এ ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশগুলি জমা বা assemble করা হয় এবং তারপর অংশগুলি জোড়া দিয়া একটি



এ্যাসেম্ব্লি শপ

আস্ত ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হয়। ছবিতে তোমরা দেখিতেছ যে, "এ্যাসেম্ব্লি শপ"-এ কয়েকটা ইঞ্জিন এই ভাবে প্রস্তুত হইতেছে।

আসানসোল, বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন—পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চল দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলে এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার কাজে লাগাইতে পারিলে একটি লোকসমাজ কিরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে এই অঞ্চল। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ শিল্পে কতখানি

উন্নতিলাভ করিতে পারে, তাহারই দিকে অঙ্গুলী সংকেত করিতেছে আসানসোল, বার্নপুর এবং চিত্তরঞ্জন।

কলিকাতা-হাওড়া-হুগলীর শিল্পাঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে হুগলী নদীর দুই পাড়ে। হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে হুগলী-হাওড়া শিল্পাঞ্চল; শ্রীরামপুর, বালী, ব্যাঁটরা, বাউড়িয়া প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। হুগলী নদীর পূর্বদিক ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে বারাকপুর-কলিকাতা-বজবজ শিল্পাঞ্চল। এই অঞ্চলে অবস্থিত কলিকাতা, বেহালা, বেলঘরিয়া, টিটাগড়, জগদ্দল, মেটিয়াবুরুজ, বাটানগর, বজবজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্রগুলি।

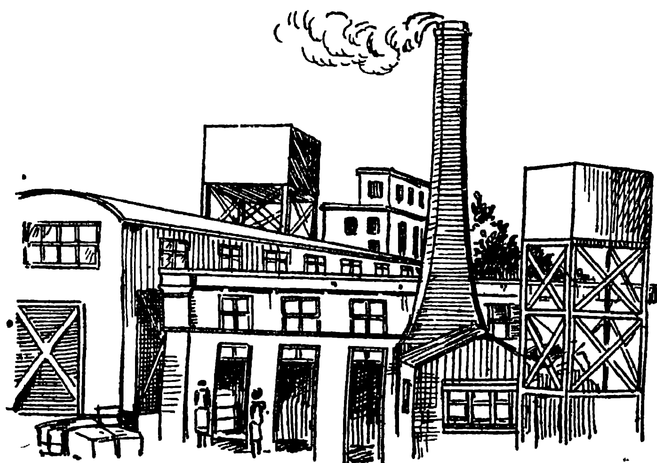
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাছিয়া বাছিয়া পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলে এত বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিল কেন? পশ্চিমবঙ্গে তো আরও অনেক জেলা আছে, কিন্তু সেখানে এই শিল্পাঞ্চল গঠিত হয় নাই কেন? প্রসিদ্ধ হুগলী নদীই এই অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধির মূলে আছে। হুগলী নদীর সাহায্যে গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে কাঁচামাল (যথা পাট, তূলা প্রভৃতি) সহজে এবং সস্তায় এই অঞ্চলে জমা করা সম্ভব, আবার কলকারখানায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য নদীপথে আমদানি-রপ্তানি করাও সুবিধাজনক। ইংরাজরা প্রথমে কলিকাতাতেই বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদের পক্ষে হুগলী নদী দিয়া সাগর পাড়ি দিয়া বিদেশে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা সুবিধাজনক মনে হইয়াছিল।

পাটশিল্প

বাংলা, তথা ভারতের পাটশিল্প এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। হুগলী নদীর দুই পাড় দিয়া চটকলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই

অঞ্চলে মোট ৯৮টি চটকল চালু আছে। এই কলগুলিতে দৈনিক গড়ে ২,৫৪,০০০ জন মজুর কাজ করে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার জন্য পাটের দড়ি এবং বস্তার সমকক্ষ কোন কিছু দুনিয়ায় নাই। তাই বিদেশেও এই জিনিসগুলির চাহিদা বিপুল। চটকলগুলি প্রধানত তৈরী করে পাটের দড়ি, বস্তা এবং হেসিয়ান বা চট। কয়লাশিল্পের মত পাট-শিল্পেও বিদেশী মূলধনই প্রধান। বিগত কয়েক বৎসরে কিছু মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীও পাটকলের মালিক হইয়াছেন।

ইতিপূর্বে তোমরা পড়িয়াছ যে, পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে পাট উৎপন্ন হয়। গ্রামে উৎপন্ন ঐ পাটই এই শিল্পের কাঁচামাল



পাটকলের বহির্ভাগ

সরবরাহ করে। চটকল আছে বলিয়াই পাটের চাহিদা এত বেশী। আবার বিদেশে পাটদ্রব্যের বিরাট চাহিদা আছে বলিয়া পাটশিল্প লাভজনক। পাটদ্রব্য বিদেশে বেচিয়া আমরা বৈদেশিক মুদ্রা (Foreign exchange) সংগ্রহ করি, উহার দ্বারাই বিদেশ হইতে

শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমরা কিনিতে পারি। পশ্চিম-বঙ্গ তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে তাই পাট শিল্পের গুরুত্ব খুবই বেশী।

পাটকলে যে মজুররা কাজ করে, তাহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশী। এই মজুরদের গায়ে মাটির গন্ধ, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার গ্রামে ইহাদের ঘরবাড়ি। ইহারা চাষী-পরিবারভুক্ত। শনিবার ছুটি হইলে ইহারা গ্রামের বাড়িতে ছুটিয়া যায়। বাঙালী ছাড়া পাটকলে হিন্দুস্থানী এবং উড়িয়া মজুরেরাও কাজ করে। পাটকলের সংলগ্ন বস্তিতে মজুরদের বাস। বার্নপুর বা চিত্তরঞ্জনের তুলনায় এই বস্তিগুলি অপরিসর, নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। বস্তি অঞ্চলে ময়লা নিষ্কাশন এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

লোহালক্করের কারখানা

কলিকাতা এবং হাওড়া অঞ্চলে অনেকগুলি লোহা-লক্করের কারখানা (Engineering Works) আছে। বার্নপুর বা চিত্ত-রঞ্জনের মত কোন দৈত্যকায় কারখানা এই অঞ্চলে নাই। কারখানাগুলি ছোট ছোট, ইতস্তত ছড়ানো। কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যাও বার্নপুর বা চিত্তরঞ্জনের তুলনায় অল্প।

হাওড়া সহরের বেলিলিয়াস অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। এই অঞ্চলে অনেক লোহা-লক্করের কারখানা। বেলিলিয়াস রোডের দুই পাশে সারি সারি কারখানাগুলি অবস্থিত। স্টীলট্রাঙ্ক, সুটকেশ, ছুরি-কাঁচি, বল্টু, নাট, পেরেক, স্প্রিং, শিকলি—লোকসমাজের প্রয়োজনীয় হরেক রকমের জিনিস এখানে তৈরী হয়। অর্থাৎ রেললাইন, রেলের চাকা, ইঞ্জিনের বয়লার প্রভৃতির মত বিরাট ভারী জিনিস এই সব কারখানায় প্রস্তুত হয় না। হালকা জিনিস কিন্তু লোহালক্করের তৈরী,

—উহাই এই অঞ্চলের শিল্পদ্রব্য। হালকা জিনিস তৈরী করিতে হয় বলিয়া কারখানাগুলি আকারেও অনেক ছোট।

হালকা জিনিস হইলে কি হয়, লোকসমাজের জীবনে এইগুলির গুরুত্ব মোটেই কম নয়। নাট, বল্টু, পেরেক, বৈদ্যুতিক কলকব্জা, চাষের যন্ত্রপাতি, ধান ও গম-পেষাই কল—এইরূপ যে সমস্ত জিনিস কলিকাতা ও হাওড়ার কারখানাগুলিতে প্রস্তুত হয়, উহা লোকসমাজের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনেই এই কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্নপুর বা চিত্তরঞ্জনের কারখানায় এইগুলি নির্মাণের ব্যবস্থা নাই, কেননা উহাদের যন্ত্রপাতি বিরাট এবং ভারী দ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী।

রেল ও রাস্তা

পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজের অর্থনৈতিক জীবনে রেল ও রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। পাকা রাস্তাগুলি যেন দেশের ধমনী। ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হইয়া দেহকে সজীব রাখে। রাস্তাগুলিও সেইরূপ দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সবল ও সজীব রাখে।

ইতিপূর্বে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান শিল্পের আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, কয়েকটা অঞ্চলে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত। কলকারখানায় যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়, মানুষকে দেখাইবার জন্য নয়। এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে, হাটে-বাজারে, বন্দরে-গঞ্জে, দূর দূর গ্রামে কাপড়, সাবান, বস্ত্র, লোহালক্করের জিনিস পৌঁছাইয়া দিতে হয় এবং এইভাবেই লোকসমাজের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বাজারের প্রয়োজন। দূর দূর গ্রামে যে হাজার হাজার মানুষ বাস করে তাহাদের কাছে জিনিসপত্র পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকিলে, কলকারখানায় প্রস্তুত

জিনিসপত্র বিক্রয়ের বড় বাজার পাওয়া যাইবে। বাজার যত বড় হইবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তত বেশী হইবে। আসানসোলের কয়লা, বার্নপুরের ইস্পাত ও লোহা, কলিকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চলের লোহালক্করের জিনিস যদি দেশের ভিতরে এবং বাহিরে পাঠানোর ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অত কয়লা, অত ইস্পাত ও লোহা, অত নাট, বল্টু, ছুরি, কাঁচি, বাক্স-প্যাটরা কোন্ কাজে আসিবে?

লোকসমাজের জীবনকে উন্নত করিবার জন্য শিল্পদ্রব্যের বাজারের জন্য, শিল্পের জন্য কাঁচা মাল নিয়মিত সরবরাহের জন্য প্রয়োজন রেল ও রাস্তা। শিল্পের উন্নতি এবং রেল ও রাস্তার উন্নতি তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তোমরা হয়তো বলিবে, রেল ও রাস্তা তো মানুষের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহা হয় সত্য। যাতায়াতের ব্যবস্থাটাও আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রেল ও রাস্তা শুধু এই প্রয়োজনেই নির্মিত হয় না। শিল্প-বাণিজ্যের প্রয়োজনেও এবং সেই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও ইহা নির্মিত ও পরিকল্পিত হয়। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রীরা যাতায়াত করে, কিন্তু মালগাড়ি কি কাজ করে? মালগাড়িতেই ভারী জিনিসপত্র যথা—কয়লা, কাপড়ের গাঁইট, লোহালক্করের জিনিস, যন্ত্রপাতি, পেট্রল প্রভৃতি এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে পাঠান হয়। রাস্তায় তোমরা নিশ্চয়ই ট্রাক দেখিয়াছ। ট্রাকও মালপত্র বহন করে, গ্রামদেশ হইতে ট্রাক-বোঝাই কাঁচা পাট, শাকসবজি, তরিতরকারি সহরে আসে। অবশ্য লোহালক্করের ভারী জিনিসপত্র ট্রাকে বহন করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন মালগাড়ি। মালগাড়িতে দূর দূর অঞ্চলে, সহরে সস্তায় এবং দ্রুত মাল আমদানি-রপ্তানি করা যায়।

কলিকাতায় ভারতের দু'টি প্রধান রেলপথ ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ের সদর কার্যালয় অবস্থিত। ইস্টার্ন রেলওয়ের

বহু শাখা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গকে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। হাওড়া এবং শিয়ালদহ পশ্চিমবঙ্গের দু'টি প্রধান রেলস্টেশন। বানপুর এবং বনগ্রাম রাজ্যের সীমান্ত স্টেশন, পূর্ব পাকিস্তানে এই পথেই যাতায়াত করিতে হয়।

হাওড়া এবং শিয়ালদহ রেলস্টেশনে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে রেলগাড়িতে কি ভিড়! দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ প্রভৃতি লাইনে যাইতে হইলে দুই একদিন আগে টিকিট না কিনিলে গাড়িতে ওঠাই প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা, চাকরি-বাকরির বিস্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাতায়াত বাড়িয়াছে। উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা হইতে মজুর, দোকানদার, কেরানী কর্মচারীরা কলিকাতা-হাওড়া-হুগলীর শিল্পাঞ্চলে কাজ করিতে আসে। ব্যবসায়ীদের প্রায়ই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করিতে হয়। আর একটি বিরাট যাত্রীদল আছে যাহাদের বলা হয় ডেইলি প্যাসেঞ্জার। নিজ নিজ জেলার গ্রামে ও সহরে বাস করিয়া ইহারা প্রতিদিন সকালে কলিকাতা ও হাওড়ায় চাকরি করিতে আসে। দিনান্তে অফিস ছুটি হইলে আবার বাড়ি ফিরিয়া যায়। মানুষের মত জিনিসপত্রের চলাচলও খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা, পাট, কয়লা তো আছেই, শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও নানা জিনিস এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে পাঠাইতে হয়; যথা—কাপড়ের গাঁইট, হালকা যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পেট্রল, সিমেন্ট প্রভৃতি।

গত কয়েক বৎসর ধান-চাউলের চলাচলও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অত মালগাড়ি কোথায়? শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িতেছে, লোক-সমাজের পক্ষে উহার প্রয়োজনও দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু মালগাড়ির অভাবে মাল চলাচল দ্রুত হইতেছে না। ফলে দিনের পর

দিন শিল্পদ্রব্য, ধান চাউল, কাপড়ের গাঁইট রেলস্টেশনের গুদামেই পড়িয়া থাকে। দূরের অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে জিনিসপত্রের আমদানি-রপ্তানিতে প্রচুর সময় লাগে।

ইহার প্রতিকার কি? আরও রেলগাড়ি, মালগাড়ি ও রেললাইন। দেশের শিল্পায়ন এবং পরিবহণের উন্নতি একই সঙ্গে না করিতে পারিলে শিল্পায়নের কাজ ব্যাহত হইতে বাধ্য।

কলিকাতার বন্দর

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কলিকাতার বন্দরের (Port of Calcutta) গুরুত্ব খুবই বেশী। ইহার কারণ কি? পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

তোমরা ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্পের কথা পড়িয়াছ। রাজ্যের কৃষিজাত দ্রব্য এবং শিল্পদ্রব্য শুধু স্থানীয় লোকসমাজের প্রয়োজনই পূরণ করে না, ইহা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিদেশেও রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাটের দড়ি, থলি ও চট, চা, কয়লা, লাক্ষা, চামড়া, তৈলবীজ প্রভৃতি। আবার বিদেশ হইতে অনেক জিনিস দেশে আমদানি করিতে হয়। বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, কলিকাতা-হাওড়া-হুগলী শিল্পাঞ্চলে এবং অন্যত্র যে সব শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং বর্তমানে হইতেছে উহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত হয় না, বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের বিদেশ হইতে খাদ্য (প্রধানত গম ও চাউল) আমদানি করিতে হয়। এই বিপুল এবং ক্রমশ সম্প্রসারণশীল আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্যই কলিকাতার বন্দর এত গুরুত্বপূর্ণ। এই বন্দর হইতেই পাট, চা, কয়লা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাহাজ নানা দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত হইয়া এই বন্দরে নোঙর ফেলে। হুগলী নদীর বুকে সারি সারি দৈত্যকায় জাহাজগুলি দেখিতে

পাইবে। জাহাজগুলি নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা উড্ডীন রাখে। এই পতাকা দেখিয়া বোঝা যায় জাহাজগুলি কোন্ দেশের।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, কলিকাতায় এই বন্দরটি স্থাপিত হইল কেন? ইহার মূলে রহিয়াছে হুগলী নদী। সাগর হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ৮০ মাইল। বন্দর হইতে সোজা সাগরে পাড়ি দেওয়া যায়। আবার এই বন্দরের পশ্চাতে অনেকগুলি রাজ্য—পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি। এই রাজ্যগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের নির্গমন-পথ কলিকাতার বন্দর। বোম্বাইতেও বৃহৎ বন্দর আছে, কিন্তু উহার ব্যবহার প্রধানত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। উত্তর-পূর্ব ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য কলিকাতা বন্দরই ব্যবহৃত হয়।

বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলিও মোটেই সহজ নয়। বন্দরের জন্য কর্তৃপক্ষের অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমেই ওঠে নদীগর্ভ খননের কাজ। হুগলী নদী এবং উহার মোহানা পলিমাটি পড়িয়া প্রায়ই অগভীর হইয়া পড়ে। নদী অগভীর হইলে বড় বড় জাহাজ চলাচল করিতে পারে না। তাই নদীগর্ভ খনন করিতে হয় এবং পলিমাটি সরাইয়া উহার গভীরতা রক্ষা করিতে হয়। জাহাজের সামনে চলে পথপ্রদর্শক স্টীমার। ইহা নদীগর্ভ পরীক্ষা করে। মাঝনদীতে জাহাজ পলিমাটিতে আটকাইয়া পড়িলে তো সর্বনাশ। তাই পথপ্রদর্শক স্টীমার ব্যবহৃত হয়। তারপর আসে জাহাজ হইতে মাল নামানোর কাজ। সাধারণ বাক্স-প্যাটরা নয়, ভারী যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, ইঞ্জিন, মালভরতি বিরাট ওজনের বস্তা। কুলীর পক্ষে এগুলি নামানো আদৌ সম্ভব নয়। তাই যন্ত্রচালিত ক্রেন থাকে, জাহাজ হইতে দ্রুত ক্রেনে মাল নামাবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সব সময় খালাস করা হয় না, তাই অনেক গুদামের প্রয়োজন হয় মাল জমা করিবার জন্য। বন্দরের মধ্যে রেললাইন পাতা থাকে, ঐ রেললাইন দিয়া মালগাড়িতে মাল

পাঠান হয়। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় জাহাজ বিকল হইয়া যাইতে পারে, ইহার ছোটখাটো সংস্কারের প্রয়োজন ঘটিতে পারে। তাই বন্দরেব সংলগ্ন ডক থাকে। এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ ডক হইল খিদিরপুর ডক।

হাজার হাজার কুলী, কেরানী-কর্মচারী বন্দরে কাজ করে। বন্দরের



কলিকাতা বন্দরেব কর্মব্যস্ততার দৃশ্য

মধ্যে ইহাদের অফিস। বন্দবের মধ্যে প্রবেশ করিলেই চতুর্দিকে অসংখ্য মানুষের কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে। ক্রেন হইতে মাল নামিতেছে, কুলীরা মাল খালাস করিতেছে, গুদামে মাল জমা হইতেছে, মাল-গাড়িতে মাল ভরতি হইতেছে, অফিসে অফিসে মালের হিসাবপত্র

রাখা হইতেছে। কোনও কাজে একটু বিশৃঙ্খলা হইলে অনেক ক্ষতি হইতে পারে। মাল জাহাজ হইতে খালাস হইল না, কিংবা গুদামে মাল পড়িয়া রহিল—আর লোকসমাজ এবং কল-কারখানা সময়মত অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাইল না। ইহাতে কলকারখানার কাজের গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা।

দামোদর উপত্যকায় নূতন শিল্পকর্ম

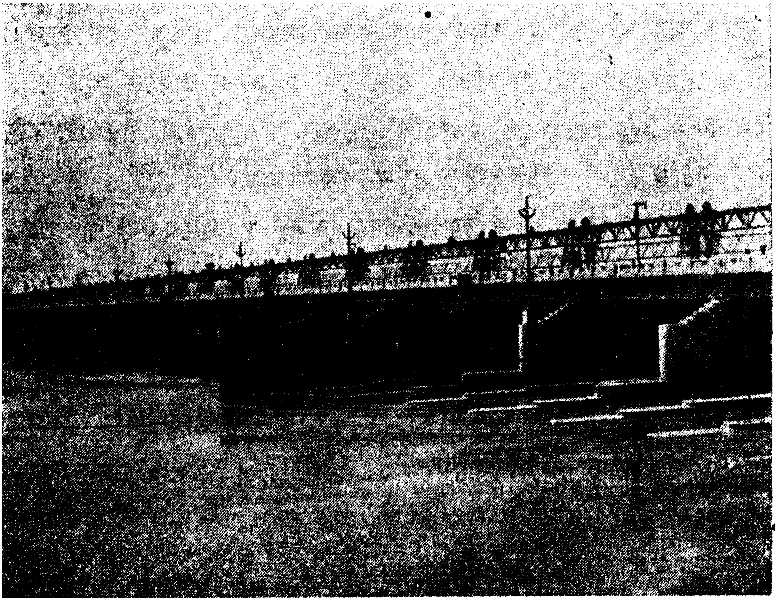
আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের মত দামোদর উপত্যকায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতে পারিলে, লোকসমাজের জীবনকে কতখানি সমৃদ্ধ ও উন্নত করা যায় উহারই দীপ্ত দৃষ্টান্ত দামোদর উপত্যকার নূতন শিল্পকর্ম।

ছোটনাগপুর পাহাড়ে উৎপন্ন দামোদর নদী। গ্রীষ্মে ইহা শীর্ণ শুষ্ক, বর্ষায় ফুলিয়া-ফাঁপিয়া বিরাট আকার ধারণ করিয়া এই দুরন্ত নদী বন্যা সৃষ্টি করে। দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতখামার, বাড়িঘর ফসল ধ্বংস হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের "দুঃখ নদী" দামোদর। এই দামোদরকে লোকসমাজের কল্যাণে নিয়োগ করিবার জন্য বিরাট দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ১৯৪৮ সনে ইহার কাজ সুরু হইয়াছে এবং দশ বৎসর অক্লান্ত প্রচেষ্টার পরে বর্তমানে ইহার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে।

দামোদর এবং উহার শাখানদীগুলির উপর আটটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধগুলি তিলায়া, বেলপাহাড়ী, মাইথন, আয়ার, পাঞ্চেৎ পাহাড়, কোনার, বোকারো এবং বরাকরে অবস্থিত।

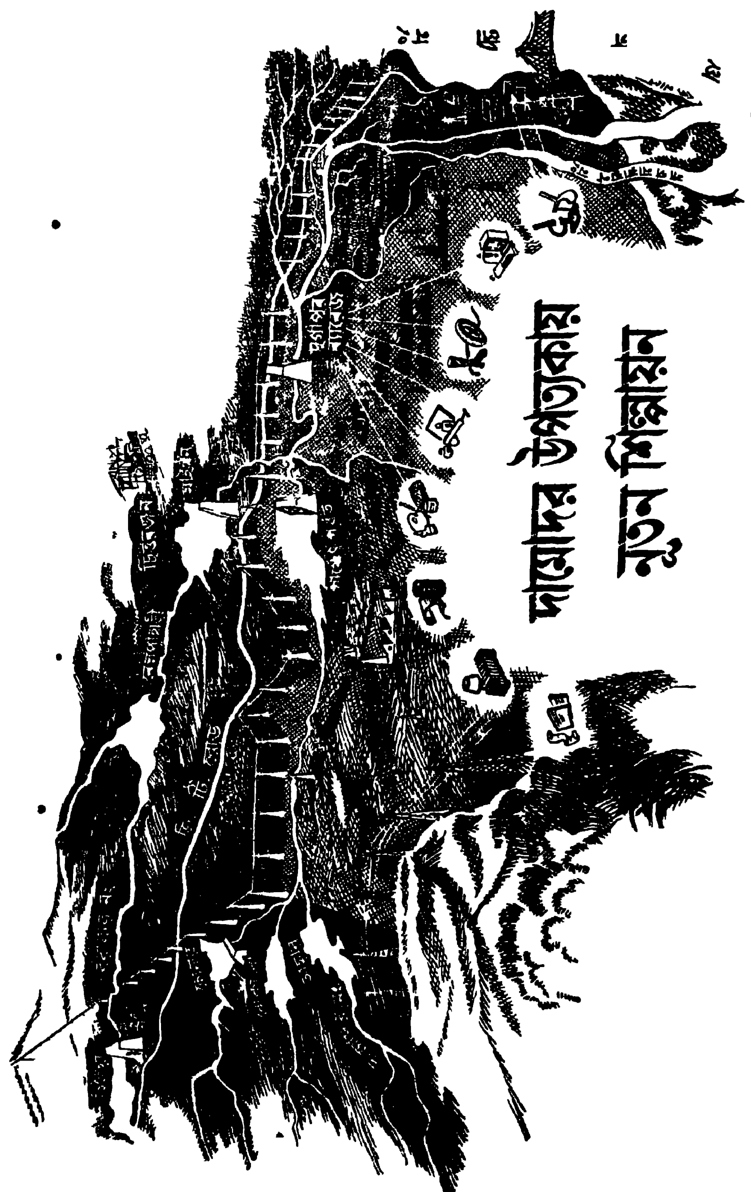
দামোদর উপত্যকার বৃহত্তম শিল্পকর্ম চলিতেছে দুর্গাপুর অঞ্চলে। প্রসিদ্ধ খনি অঞ্চলে রানীগঞ্জের মাত্র ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দুর্গাপুর গ্রাম। দুর্গাপুরে দামোদর নদীর উপর এক বিশাল ব্যারেজ বা

সেতুবাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২, ৫০০' ফুট, উচ্চতা ২৫ ফুট। এই সেতুবাঁধে জল সংরক্ষিত থাকিবে, আর অসংখ্য খালের মধ্য দিয়া উহার জল সেচের জন্য ছাড়া হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে ১০ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। জলের আশায় চাষী আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে। জল না হইলেই অজন্মা। তাই সেচের গুরুত্ব অপরিসীম।



দুর্গাপুর সেতুবাঁধ

শুধু এই সেতুবাঁধটিই নয়, দুর্গাপুরে নূতন নূতন শিল্প-সৃষ্টির ব্যবস্থা হইতেছে। ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় দুর্গাপুরে একটি আধুনিক যন্ত্রপাতি-সজ্জিত বৃহৎ ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার প্রাথমিক কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার স্থাপন


দামোদর উপত্যকায়
নূতন শিল্পায়ন
দুর্গাপুর ব্যারেজ
চিত্তরঞ্জন

করিয়াছেন কয়লা-চুল্লী (Coke Oven Plant) এবং গ্যাস উৎপাদনের কারখানা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোল হইতে কোক প্রস্তুত করা হয় এবং এই কোক লৌহ-নিষ্কাশনের জন্য অপরিহার্য। দুর্গাপুরের কয়লা-চুল্লীতে প্রচুর কোক প্রস্তুত হইবে। কিন্তু শুধু কোকই নয়, এই কয়লা-চুল্লী স্থাপনের ফলে নানা রকম উপজাত (bye-products) পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হইবে এবং এই গ্যাস কলিকাতা সহরে এবং অন্যত্র রান্নার ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। রান্নার জন্য আমরা ব্যবহার করি কয়লা, এই কয়লা হইতে প্রচুর ধূম বাহির হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই ধূম খুবই খারাপ। গ্যাস ছাড়া আরও নানা উপজাত পাওয়া যাইবে; যথা, কোল-টার (বা আলকাতরা), বেন্‌জিন, কার্বলিক অ্যাসিড, নানাবিধ রঙ ইত্যাদি। কয়লা-চুল্লী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই নানা উপজাতকে ভিত্তি করিয়া বেসরকারী প্রচেষ্টায় আরও নূতন নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুর্গাপুরের শালের অরণ্য পরিণত হইবে এক কর্মচঞ্চল আধুনিক শিল্পনগরীতে। সহস্র সহস্র মজুর, কেরানী, কর্মচারী, দোকানদার ছুটিয়া যাইবে এই নগরীতে কাজ ও জীবিকার সন্ধানে।

দামোদর উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) উৎপন্ন হইতেছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বর্ধমানে পৌছিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহা এক সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হইবে। বর্তমানে হাওড়া-বর্ধমান, হাওড়া-তারকেশ্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ-চালিত রেলগাড়ি (Electric train) বিদ্যুৎগতিতে যাতায়াত করিতেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লোকসমাজের জীবনকে প্রভাবিত করে সত্য, কিন্তু লোকসমাজ প্রকৃতির দাস নয়। বিজ্ঞানের

কল্যাণে প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি আজ লোকসমাজ জয় করিতেও পারে। "দুঃখের নদী" দামোদরকে সে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারে, দুর্গাপুরের মত অখ্যাত শালবনের গ্রামকে এক কর্মচঞ্চল বিদ্যুৎ-আলোকিত শিল্প-নগরীতে পরিণত করিতে পারে।

একদিন যাহা ছিল শুধু রঙীন কল্পনা, আজ তাহা জীবন্ত বাস্তবে পরিণত হইতেছে।

হাওড়া ও চিত্তরঞ্জন

হাওড়া এবং চিত্তরঞ্জন রাজ্যের দু'টি প্রধান শিল্পকেন্দ্র। একটি প্রাচীন, অপরটি নবীন। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের বয়স প্রায় এক শত বৎসর, আর চিত্তরঞ্জন স্থাপিত হইয়াছে ১৯৪৮ সনে। বয়সের এই পার্থক্য সহর দু'টির উপর গভীর ছাপ ফেলিয়াছে।

হাওড়া সহরে বাড়ির গায়ে বাড়ি, রাস্তাগুলি সরু সরু। পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য অলিগলি। খোলা মাঠ প্রায় চোখেই পড়ে না। বড় রাস্তা দিয়া প্রায় প্রতি মুহূর্তে ট্রাম, বাস, ট্রাক ছুটিয়া চলে। ট্রামে বাসে যাত্রীর ভিড়। মানুষ যেন ঠাসাঠাসি করিয়া সহরে বাস করিতেছে। ১৯৫১ সনে সহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪,৩৩,৬৩৮ জন, অথচ সহরের আয়তন ১০ বর্গমাইলের কিছু বেশী।

বাড়িগুলি প্রাচীন, জীর্ণ। অলিগলিও সেইরকম। অনেক কালই সংস্কার হয় নাই। বর্ষার সময় কোন কোন পাড়ার পথে-ঘাটে হাঁটুজল, পথচলা একটি কঠিন ব্যাপার। রাস্তার নালা-নর্দমাগুলিও আবর্জনায় ভরতি। বস্তিগুলির অবস্থাই সব চেয়ে শোচনীয়। সহরে বহু বস্তি, কারখানার মজুর এবং গরীব মধ্যবিত্তরা এই বস্তিগুলিতে বাস করে। বস্তিগুলি আলোবাতাসহীন, স্যাঁতসেঁতে। বেশীর ভাগই মাটির ঘর।

অবশ্য সহরে আধুনিক হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, পাকা বাজার আছে। প্রসিদ্ধ বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ শিবপুরে

অবস্থিত। বেড়াইবার স্থান হিসাবে শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন খুবই উপভোগ্য। জেলার কেন্দ্র বলিয়া সহরে আদালত, পোস্ট অফিস, অন্যান্য সরকারী অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

(অপরদিকে চিত্তরঞ্জন সহরের ধরনই আলাদা। ইহা একটি পরিকল্পিত সহর। সরকারই সহরের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।



চিত্তরঞ্জনের একতলা বাড়ি

হাওড়ার মত এই সহর মোটেই ঘিঞ্জি নয়। এখানে মানুষ ঠাসাঠাসি করিয়া বাস করে না। খোলামেলা পরিবেশে হাত-পা ছড়াইয়া তাহারা বাস করে। রাস্তার দুই পাশে সারি সারি একতলা বাড়ি। এই রকম প্রায় পাঁচ হাজার বাড়ি। মোট লোকসংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার। প্রত্যেক বাড়িতেই অন্তত দু'খানা ঘর, স্বতন্ত্র স্নান ও পায়খানার ঘর। বাড়ির সংলগ্ন একটি ছোট্ট উঠান। উঠানে কেহ ফুলের বাগান

করিয়াছেন, কেহ বা শাকসবজির। প্রত্যেক বাড়িতেই পরিশুদ্ধ জল কলে সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

সহরটি কয়েকটা মহল্লায় বিভক্ত। প্রতিটি মহল্লা স্বয়ংসম্পূর্ণ। মহল্লার মধ্যেই আছে একটি পাকা বাজার। বাজারের মধ্যে মাছ, তরিতরকারির দোকান, মুদির দোকান, ধোপা-নাপিতের দোকান। মহল্লায় আরও আছে মাতৃসদন, চিকিৎসালয়, খেলার মাঠ, পার্ক, পাঠাগার।

রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ঝকঝকে। রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক আলো। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া রাস্তাগুলি উঁচু-নীচু। সন্ধ্যায় সহরের সংলগ্ন ছোট্ট পাহাড় হইতে নীচে তাকাইলে মনে হয় কে যেন সহরটিকে আলোকমালায় সাজাইয়া রাখিয়াছে।

কম জনবসতি, মহল্লার বাজারেই সব জিনিস পাওয়া যায়, ওয়ার্কশপও নিকটে। ফলে, রাস্তায় যানবাহনের ভিড় নাই। ট্রাম-বাস-ট্রাকের দিবানিশি ঘড়ঘড়ানি নাই। সহরে সাইকেল-রিক্সাই প্রধান বাহন। কয়েকটা বাসও চলে।

প্রাচীন সহর এবং পরিকল্পিত সহর—এই দুইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য তাহারই দৃষ্টান্ত হাওড়া ও চিত্তরঞ্জন।

১। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কেন?

২। এই অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ জনপদ কেন গড়িয়া উঠিয়াছে?

৩। বীরভুম, মানভুম, সিংভুম হইতে অত লোক এই অঞ্চলে কেন যায়?

৪। আসানসোল রেলস্টেশনটি এত বিরাট কেন?

৫। কোল এবং কোকে তফাৎ কি? বাড়ির রান্নাবান্নায় ইহার কোন্‌টি ব্যবহৃত হয়?

৬। লৌহপাথর কিভাবে ইস্পাতে পরিণত হয়?

৭। বার্নপুরের কারখানায় চুল্লী এবং চিমনি আছে কেন?

৮। চিত্তরঞ্জনে অ্যাসেমব্লি শপ-এ কি কাজ হয়?

৯। লোকোমোটিভ কারখানা বাছিয়া বাছিয়া চিত্তরঞ্জনে স্থাপিত হইল কেন?

১০। একটি চাউল কল বা পাটকল স্থাপনের বদলে বিরাট অর্থব্যয়ে লোকোমোটিভ কারখানা স্থাপনের সার্থকতা কি?

১১। হাওড়া ও হুগলী জেলায় এত পাটকল স্থাপিত হইল কেন?

১২। দেশ-বিদেশে পাটের এত চাহিদা কেন? এই চাহিদা কিভাবে পূরণ করা হয়?

১৩। বার্নপুরের কারখানা এবং বেলিলিয়াস রোডের কারখানাগুলির মধ্যে তফাৎ কি? বেলিলিয়াস রোডের অত কারখানা অদ্যাবধি চালু আছে কেন?

১৪। রেল ও রাস্তার প্রয়োজন আছে কি? তুমি কি আরও রেললাইন ও রাস্তা চাও? কেন চাও?

১৫। কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা কর। কলিকাতায় এই বন্দর স্থাপিত হইল কেন?

১৬। দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ কি?

১৭। মানুষ কি প্রকৃতির দাস? দৃষ্টান্তদ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

১৮। প্রাচীন সহর এবং পরিকল্পিত সহরের মধ্যে তফাৎ কি? হাওড়া পরিকল্পিত সহর নয় কেন? ইহার উন্নতি কি ভাবে সম্ভব?

শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর:—

১। — অঞ্চলে কয়লাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

২। কয়লাখনিতে কাজ করিতে — জেলাগুলি হইতে লোক আসে।

৩। চিত্তরঞ্জনে — কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৪। পাটকল — জেলায় স্থাপিত হইয়াছে।

৫। কলিকাতা বন্দর হইতে — রপ্তানি হয়।

৬। বার্নপুরে — কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৭। বেলিলিয়াস রোডের কারখানায় — জিনিস তৈরী হয়

৮। হাওড়ার বাড়িগুলি —।

৯। চিত্তরঞ্জন সহরে — প্রধান বাহন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের গ্রাম ও সহর

পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ গ্রাম ও সহরে বাস করে। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২৫ জন সহরে এবং ৭৫ জন গ্রামে বাস করে। জনবসতি আছে এমন গ্রামের সংখ্যা ৩৫ হাজার। সহর মাত্র ১১৪টি। সহরে যাহারা বাস করে তাহারা চাকরি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিযুক্ত। গ্রামের লোক প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। সহরের মানুষ খাদ্যের জন্য গ্রামের উপর নির্ভর করে, আবার গ্রামের মানুষ পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, লোহা, টিন, সাবান, ছুরিকাঁচি প্রভৃতি জিনিসের জন্য সহরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সহর ও গ্রামের লোকসমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, ইহারা যেন একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বাস করে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম

চিরকালই কিন্তু এই রকম অবস্থা ছিল না। গ্রামগুলি মোটের উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রামেই উৎপন্ন হইত। গ্রামের লোকসমাজ নিজেদের মধ্যে সমাজজীবনের কাজগুলি ভাগ করিয়া লইত। পারস্পারিক সহযোগিতার বন্ধনে গ্রামের সকল মানুষ আবদ্ধ ছিল।

বেশী দিনের কথা নয়। ১৮১২ সনে মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চল এইরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ইহার বিবরণ আমরা সরকারী নথিতে পাইয়াছি। গ্রামাঞ্চলে তখন নিম্নলিখিত চাকুরিয়া ছিল ; যথা—(১) গ্রামের প্রধান, (২) হিসাবরক্ষক, (৩) চৌকিদার, (৪) সীমানা পরিদর্শক, (৫) জলাশয় এবং জল সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, (৬) পুরোহিত,

(৭) পাঠশালার পণ্ডিতমশাই, (৮) জ্যোতিষী, (৯) কামার, (১০) ছুতার, (১১) কুমার, (১২) ধোপা, (১৩) নাপিত, (১৪) রাখাল, (১৫) বৈদ্য, (১৬) নর্তকী, (১৭) বাজনদার ও কবি। এই তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গ্রামটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, পণ্ডিতমশাই হইতে সুরু করিয়া আনন্দের ব্যবস্থার জন্য নর্তকীও বাজনদার পর্যন্ত সকলেই আছে। গ্রাম হইতেই ইহাদের জীবনধারণের জন্য মাহিনা বা বৃত্তি দেওয়া হইত। ফলে সকলেই নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিত।

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। গ্রামের নাপিত গৃহস্থের কাছে মাথাপিছু এক "মান" বা চার সের ধান পায়, তাহাকে সম্বৎসর প্রত্যেকের চুল কাটিয়া ও দাড়ি কামাইয়া দিতে হয়। কামার সকলের কাস্তে, কোদাল মেরামত করে, বিনিময়ে সে হাল-পিছু দশ-বারো "মান" অর্থাৎ প্রায় আধ মণ ধান পায়। ছুতার ও ধোপাও আছে, কিন্তু তাহাদের পাওনা স্থির নাই; কাজ অনুসারে তাহারা মজুরি পায়। গ্রামের কবিরাজ ঘরপিছু চার কুড়ি বা এক মণ পাঁচ সের ধান হইতে ছয় কুড়ি বা দেড় মণ ধান পান।

একদিন সারা ভারতের গ্রামের আর্থিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, উহারই আভাস পাওয়া যায় গড়বেতায়। কিন্তু এখন কি সেকালের ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে চালু আছে?

বর্তমান গ্রাম

বর্তমানে গ্রামের আর্থিক ব্যবস্থা পাল্‌টাইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসিতেছে। এই পরিবর্তন এতই ব্যাপক যে, বর্তমানের গ্রাম দেখিয়া সেকালের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম কল্পনা করাই কঠিন।

বর্তমানে গ্রাম মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। গ্রাম এখন সহরের বাজারের উপর নির্ভরশীল। যে কোন গ্রামে গেলে আমরা দেখিব জামা-কাপড়ের দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মুদি দোকান এমন কি পান বিড়ি চা-এর দোকান। গ্রামের মানুষকে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস দোকান হইতে কিনিতে হয়, আর এই জিনিসপত্র আসে সহরের বাজার হইতে। এখনও গ্রামে কামার, ছুতার, কবিরাজ, পণ্ডিতমশাই আছেন কিন্তু তাহাদেরও জিনিসপত্র কিনিতে হয়, গ্রাম হইতে তাহাদের জীবনধারণের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা নাই। কামার কোদাল এখনও মেরামত করে, কিন্তু তার জন্য হালপিছু ধান পায় না, পায় নির্দিষ্ট পয়সা এবং এই পয়সা দিয়া তাহাকে ধান, তেল, লবণ কিনিতে হয়।

এখন গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সমস্তই গ্রামে উৎপন্নও হয় না। ঘরের জন্য টিন ও পেরেক. পরনের কাপড়জামা, রোগের ঔষধ এবং আরও নানা জিনিস তাহাকে হাট-বাজারের দোকান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আবাব এই জিনিসপত্র আসে সহর হইতে। গ্রামের প্রাচীন কুটিরশিল্পগুলি প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিছু কিছু মুমূর্ষু অবস্থায় টিকিয়া আছে। ফলে সহরের বাজার ছাড়া গ্রামবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের আর কোন রাস্তা নাই।

ধান-চাউল শাক-সবজির কথাও ধরা যাক। গ্রামেই এই সব উৎপন্ন হয়। কিন্তু উৎপন্ন সমস্ত ফসলই কি গ্রামের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়? না, তা হয় না। চাষী খোরাকীর জন্য কিছু রাখে, কিছু হাটে-বাজারে বেচে। এখানেও সে সহরের বাজারের সহিত যুক্ত। সহর হইতে ব্যাপারীরা হাটে হাটে সওদা করে, ধান-চাউল, তরিতরকারি, পাট, মরিচ, তামাক কেনে এবং পরে উহা সহরে চালান দেয়। গ্রামের

জিনিস গ্রামের বাহিরে চলিয়া যায়। গ্রাম কি করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকিবে ?

আবার সহরেরও গ্রাম ছাড়া গতি নাই। সহরে ধান চাউল, তরিতরকারি, পাটমরিচ উৎপন্ন হয় না। সহরের মানুষকে খাদ্যের জন্য গ্রামের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। সহরে যে সমস্ত শিল্প আছে, উহার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। গ্রামে উৎপন্ন পাট হইতেই রাজ্যের পাটকলগুলি চলে।

আধুনিক কালে রেলগাড়ি, বাস, ট্রাক চলে। রাস্তাঘাটেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং ক্রমশ হইতেছে। ফলে সহর ও গ্রামের মধ্যে কেনাবেচার কাজ সহজ হইয়াছে। দ্রুত এবং সহজে এক অঞ্চলের উৎপন্ন জিনিস অন্য অঞ্চলে আমদানি করা যায়। হাটবাজার, দোকানপাট আমদানির ক্ষেত্র। এই আমদানির পরিমাণও প্রচুর। প্রয়োজনমত যে কোনদিন এই সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা যায়। ফলে আজ আর গ্রামবাসীকে নিজ গ্রামের উৎপন্ন পরিমিত জিনিসের উপরই নির্ভর করিতে হয় না।

এই ভাবেই পুরানো দিনের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রাম ও সহর এখন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, আগামী দিনে এই নির্ভরশীলতা আরও বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়।

মেলা

পুরানো দিনের গ্রামের গড়ন বর্তমানে বদলাইয়া গেলেও একটি গ্রাম্য অনুষ্ঠান আজও টিকিয়া আছে। এই অনুষ্ঠানটি হইল গ্রামের মেলা। ভারতের গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। এই মেলা খুবই একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান।

চাষীর সকল সময়ে ক্ষেতে ভারী কাজ থাকে না। যে সময়ে ধান-কাটা শেষ হইয়া যায়, ধান বিক্রয়ের পর চাষীর হাতে কিছু পয়সা

আসে, সেই সময়ে গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। সাধারণত কোনও ঠাকুর-দেবতার পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলা বসিবার রীতি। মেলায় বিস্তর কেনাবেচা হয়। বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস কেনাবেচার ব্যবস্থা থাকে। মেলায় চাষী একটু আনন্দ করিতেই যায় না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কেনাবেচাও সারিয়া আসে। মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হইল এই যে, গ্রামে কিংবা নিকটস্থ গঞ্জ বা সহরে পাওয়া যায় না এমন অনেক জিনিসের আমদানি মেলায় হয়। চাষীর কাজে লাগে এমনি নানা জিনিস মেলায় আসে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে।

দিনাজপুর জেলার নেকমর্দের মেলা খুব প্রসিদ্ধ। মেলায় ঘোড়া, গরুবাছুর, উট আমদানি হয়। দিনাজপুরের লোক তো বটেই, ঢাকা, ময়মনসিংহ,ধুবড়ী প্রভৃতি জেলা হইতেও অসংখ্য খরিদ্দার মেলায় উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে হাওড়া ময়দানে ও মাহেশে রথের মেলা বসে। নানারকম গাছগাছড়া ও পাখীর আমদানি হয় এই দু'টি মেলায়। হাওড়ার রামরাজাতলায় চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলা প্রায় পাঁচ মাস স্থায়ী হয়। দূর-দূরান্তর হইতে শত শত লোক মেলায় আসে। সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছোট-বড় ১৩৭টি মেলা বসে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কেঁদুলির (বা কেন্দুবিল্বের) জয়দেব মেলা। কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব কবি জয়দেবের জন্মস্থান। পশ্চিমবঙ্গের বৈষ্ণবরা দলে দলে মেলায় আসেন। মালদহ জেলায় ২২টি মেলার কথা জানা যায়। এর মধ্যে ইংরেজবাজারের রামকেলি মেলাটিতে বিপুল জনসমাগম হয়। প্রায় দশ হাজার লোক মেলায় আসে। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তি হইতে সাত দিন মেলা চলে। রামকেলি একটি পবিত্র স্থান। এই রামকেলিতেই শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। মালদহের গাজোল থানার ধাওয়ানের মেলাটিও বেশ বড়।

মাঘী পূর্ণিমা হইতে ১৪ দিন মেলা চলে। প্রায় ২০ হাজার লোক মেলায় জমা হয়।

/রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে এইরকম অসংখ্য মেলা বসে। কোন মেলা অল্প কয়েক দিন, আবার কোন মেলা মাসাধিক কাল ধরিয়া চলে। শুধু জেলার লোকই নয়, দূর দূর জেলার লোকও মেলায় আসে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রায় সব মেলাতেই গরুবাছুরের হাট, কাপড়জামার দোকান, লাঙলের দোকান, মনিহারীর দোকান থাকে।/

পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও মেলা বসে। আগ্রা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে যমুনা নদীর ধারে কার্তিক মাসে বটেশ্বর মহাদেবের মেলা বসে। প্রায় এক মাস মেলা চলে, সেখানে অনুমান এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মেলায় ঘোড়া, উট, গরুবাছুর, মহিষ, হাতী, গরুর গাড়ি আমদানি হয়। উত্তরপ্রদেশের বুদাউন জেলায় কাকোরা গ্রামে কার্তিক মাসে একটি বিরাট মেলা বসে। প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ লোক মেলায় আসে। ঘরের আসবাবপত্র, বাসনকোসন, জুতা, কাপড়চোপড় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। মাদ্রাজে গুণ্টুর জেলায় কোটাপ্পাকোণ্ডায় মাসে মাসে একটি মেলা বসে। প্রায় ষাট হাজার লোক মেলায় আসে। ইহা একটি পাহাড়ী অঞ্চল। মেলায় বাঁশ ও কাঠের গুঁড়ি আমদানি হয়।

ইতস্তত ছড়ানো গ্রাম

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ হাজার গ্রাম। এই গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য কি? সহরের সহিত ইহাদের পার্থক্য কোথায়?

গ্রামগুলি ইতস্তত ছড়ানো, রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠে নাই। উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ, দক্ষিণ-বঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রামগুলি খুবই ছাড়া-

ছাড়া। শুধু মাঠের পর মাঠ চোখে পড়িবে। উহারই মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম। এ যেন নদীব মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ। একটি গ্রাম হইতে আব একটি গ্রাম বেশ দূরে। দুই গ্রামের মাঝে দেখা যায় মাঠ, নারিকেল ও খেজুবগাছেব সারি। কয়েক ঘর চাষীপরিবার লইয়া এক একটি ছোট্ট গ্রাম। আবাব ঘনবসতির গ্রামও আছে।



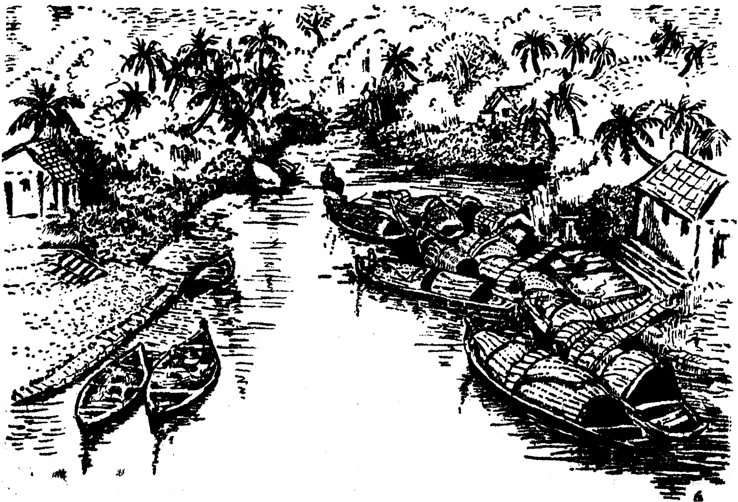
গ্রামের দৃশ্য

অনেকঘর মানুষ পাশাপাশি বাড়িতে বাস করে। অবশ্য এইগুলি চাষী গ্রাম নয়। মধ্যবিত্ত ও চাষী পরিবার মিলিয়া এইরূপ গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বর্ধিষ্ণু গ্রামের মধ্যেই দোকানপাট, বাজার, স্কুল, ডাক্তারখানা, খেলার মাঠ দেখা যায়। এইরূপ বর্ধিষ্ণু গ্রামের সংখ্যা বেশী নয়।

গ্রামগুলি সারিবদ্ধ না হইয়া এইরূপ ছড়ানো থাকে কেন? উত্তরবঙ্গ এবং নিম্নবঙ্গের গ্রামে বসতি ঘন নয়। আবার নিম্নবঙ্গে, বিশেষ করিয়া ২৪ পরগনা জেলায় গ্রামগুলির মধ্য দিয়া অসংখ্য খাড়ি, নদী-নালা গিয়াছে। এই সব গ্রামের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। গ্রামে মধ্যবিত্তের বাস খুব কম, বেশীর ভাগই কৃষক-পরিবার। এইরূপ গ্রামের মধ্যে সাধারণত দোকানপাট নাই, হাটও বসে না। গ্রামেব বাইবে এমন এক জায়গায় হাট বসে, যেখানে অনেকগুলি গ্রামের মানুষ আসিয়া জমা হইতে পারে। এই গ্রামগুলি আবার সহর বা গঞ্জ হইতে বহু দূরে। পথঘাটও দুর্গম। নিম্নবঙ্গের গ্রামগুলি তাই ইতস্তত ছড়ানো।

কেরালার গ্রাম

দক্ষিণবঙ্গের মত কেরালার গ্রামও ইতস্তত ছড়ানো এবং অসংবদ্ধ। কেরালার লোকসমাজ দেওয়াল-ঘেরা ঘরে বাস করে, ঘরগুলি বিচ্ছিন্ন,



কেরালার গ্রাম

বিক্ষিপ্ত; ইহারা সুসংবদ্ধ নয়। ঘরের চারপাশে শস্যক্ষেত্র এবং

নারিকেল বাগান। নারিকেল বাগানের ছায়ায় ঘেরা বিভিন্ন বসতি। সম্ভবত ভৌগোলিক কারণে গ্রামগুলি সুসংবদ্ধ হইতে পারে নাই। নিম্নবঙ্গের মত অসংখ্য খাড়ি ও নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত। ফলে গ্রামগুলি ইতস্তত ছড়ানো। বসতির চারিপাশে নারিকেল বাগান থাকায় ঘরগুলি সারিবদ্ধ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের গ্রাম

উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের গ্রামগুলি দক্ষিণবঙ্গ বা কেরালার গ্রামগুলি হইতে পৃথক। এই রাজ্য দুইটির গ্রামগুলি সাধারণত ঘন এবং সুসংবদ্ধ। বাড়িগুলি যেন একটি অপরটির গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। বাড়িগুলিতে টালি ও খোলার চাল, দেওয়াল মাটির। গ্রামগুলিতে বসতি বেশ ঘন। উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবের নদী ও সেচ-প্রণালীর ধারে ধারে এইরূপ ঘন-বসতি, সুসংবদ্ধ গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে সব অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা নাই, নদী-নালা নাই, সেই সব অঞ্চলে কিন্তু বসতি খুব কম এবং গ্রাম প্রায় চোখে পড়ে না। অর্থাৎ সেচের সুযোগের সহিত গ্রামে গ্রামে জনবসতি কম বা বেশী হওয়া অনেকটা নির্ভর করে।

বিভিন্ন ধরনের সহর

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম অসংখ্য, সহরের সংখ্যা মাত্র ১১৪টি। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে সহর কিজন্য গড়িয়া উঠিল? সহরের বৈশিষ্ট্য কি?

লোকসমাজের প্রয়োজনেই সহরের সৃষ্টি। প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতে নানা রকমের সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই উঠে বাণিজ্য-কেন্দ্রের কথা। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সওদাগর ও কারিগরগণ একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং ফলে তাহাদের লইয়া সহর গড়িয়া উঠে। সেকালে তাম্রলিপ্তি (বা আধুনিক তমলুক, মেদিনীপুর জেলা) এইরূপ একটি বাণিজ্য-সহর ছিল। আবার কোন

কোন বাজার-কেন্দ্রে সহর গড়িয়া উঠে। বাজার-কেন্দ্রে নানারকমের কারিগর বাস করে। কেহ তাঁতের কাপড় বোনে, কেহ কাপড়ে রং করে, কেহ মাটির জিনিস, কেহ কাঠের পুতুল তৈয়ার করে। এই সব জিনিস সওদা করিতে মানুষ বাজার-কেন্দ্রে আসে। কারিগরেরা স্থায়ী ভাবে বাজার-কেন্দ্রেই বসবাস করে বলিয়া সহর গড়িয়া উঠে। নবাবী আমলে রাজদরবারকে কেন্দ্র করিয়া বর্ধিষ্ণু সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহাকে বলা হয় "কোর্ট টাউন" (Court town)। রাজধানীর সামন্ত-প্রভু, আমীর-ওমরাহ্, নবাব ও বেগম, সৈন্য-সামন্তরাই ছিলেন কোর্ট-টাউনের বাসিন্দা। রাজদরবারের অবস্থানের উপরই নির্ভর করিত এইরূপ সহরের স্থায়িত্ব। এইরূপ বর্ধিষ্ণু জনবহুল সহর ছিল দিল্লী, আগ্রা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি। দীর্ঘকাল ঢাকা ছিল বাংলার রাজধানী। ফলে ঢাকা এক বর্ধিষ্ণু সহরে পরিণত হইয়াছিল। বণিক, কারিগর, নবাবের আমলা-কর্মচারী, সৈন্য-সামন্ত মিলিয়া ঢাকা ছিল এক কর্মচঞ্চল সহর। কিন্তু বাংলার রাজধানী যখন মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইল, তখন হইতে ঢাকার পূর্ব গৌরব আর রহিল না। মুর্শিদাবাদ তখন জমজমাট হইল। মুর্শিদাবাদেই নবাবের প্রাসাদ, আমীর-ওমরাহ্, কর্মচারীদের বাড়িঘর, জগৎ শেঠের টাঁকশাল, বণিকদের গুদাম, কারিগরদের বসতি স্থাপিত হইল। উহার জনবসতি হইল বিপুল। ভারতবাসীর তীর্থযাত্রার স্পৃহা সুবিদিত। পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বারমাসই ভারতবাসী বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে। তীর্থযাত্রীদের নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তীর্থস্থানে সহর গড়িয়া উঠে। তীর্থস্থানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করেন। এই ভাবেই পুরী, বারাণসী, গয়া, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন সহরে পরিণত হইয়াছে।

ইংরাজ আমলে কিন্তু নূতন শ্রেণীর সহর গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা পূর্বে ছিল না। ইংরাজ এদেশে রেললাইন স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমরা

জান। রেলপথের উপর ছোট-বড় সহর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। রেলস্টেশনগুলি রপ্তানি বাণিজ্যের কেন্দ্র। স্টেশন হইতেই ধান, চাউল, পাট, মরিচ, তামাক, চামড়া প্রভৃতি বড় বড় সহরে বা বন্দরে চালান যায়। ফলে স্টেশনের আশেপাশে গড়িয়া উঠিয়াছে দোকান-পাট, গুদাম, হাটবাজার। কয়েকটা প্রকাণ্ড রেলস্টেশন বা জংশন আছে, যেখানে রেলগাড়ি মেরামত করা হয়, যেখানে রেল ওয়ার্কশপ আছে এবং অসংখ্য রেলকর্মচারী এবং মজুর নিয়মিত বাস করে। ফলে এখানেও সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন কোন অঞ্চল আছে যেখানে শিল্প কেন্দ্রীভূত—পাটের কল, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ইত্যাদি। এই সব অঞ্চলে শত শত মজুর, কেরানী কর্মচারীর বাস। ফলে এই সব অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্প-সহর, অর্থাৎ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত সহর। শাসনকাযের সুবিধার জন্য ইংরাজ প্রদেশগুলি কয়েকটা শাসনতান্ত্রিক ইউনিটে বিভক্ত করিয়াছে, উহাদের নাম জেলা (Districts)। জেলার কেন্দ্রে স্থাপিত হইয়াছে আদালত, সরকারী আফিস, স্কুল, হাসপাতাল, দোকানপাট। ফলে একদল উকিল, মোক্তার, কেরানী, আড়তদার, দোকানদার, শিক্ষক, ডাক্তার জেলা-কেন্দ্রে ভিড় করিয়াছে। ইহাদের লইয়া এক নূতন ধরনের সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলি আদৌ শিল্প-সহর নয়, শিল্প বা বাণিজ্যের কেন্দ্রও নয়, তবু সহর।

ইংরাজ আমলে সহরের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—গ্রামের সহিত সহরের সম্পর্কশূন্যতা। "অনুপস্থিত" জমিদার, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, গ্রাম-ছাড়া কৃষক যাহারা কলে কারখানায় মজুরি করে—তাঁহারাই হইলেন সহরের স্থায়ী বাসিন্দা। গ্রামের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাদের রুচি এবং সংস্কৃতি পালটাইয়া গেল। সহুরে মানুষ এবং গ্রাম্য মানুষ যেন দুই অচেনা রাজ্যের মানুষ হইলেন।

সহরে এমন অনেক লোক আছেন যাহারা গ্রাম কি বস্তু তাহা আদৌ জানেন না, অথচ তুই পুরুষ আগে হয়তো তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

সহরের সংখ্যাবৃদ্ধি

গত ত্রিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে সহরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১ সনে সহরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৫, আর ১৯৫১ সনে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১৪। ১৯২১ সনে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জন ছিলেন সহরবাসী। ১৯৫১ সনে শতকরা ২৫ জন সহরবাসী।

কিন্তু তার মানে কি এই যে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকতা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে ? পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ কি বর্তমানে সহুরে হইয়া উঠিয়াছে ? এইরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। আজও শতকরা ৭৫ জন মানুষ গ্রামেই বাস করে। শতকরা যে ২৫ জন সহরে বাস করে বিভিন্ন জেলায় তাহারা সমানভাবে বাস করে না। বেশীর ভাগ জেলাতেই সহরবাসীর সংখ্যা খুবই সামান্য। কলিকাতা বাদ দিয়া হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা এবং দার্জিলিং জেলায় সহরবাসী শতকরা ২০ হইতে ৩০ জন, বর্ধমান এবং নদীয়ায় ইহা শতকরা ১০ জনের বেশী, আর বীরভুম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও কোচবিহারে শতকরা ৯০ জনের বেশী লোক গ্রামে বাস করে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ জেলাতেই শতকরা ৯০ জন মানুষ আজও গ্রামেই বাস করেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজকে "সহুরে" মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইহার কারণ কি ? নাগরিকতার গতি এত মন্থর কেন ? সহরের সংখ্যা এত কম কেন ? ইহার প্রধান কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের গতি মন্থর এবং শিল্পের বিকাশ অসমান। তোমরা ইতি-

পূর্বে পড়িয়াছ যে, রাজ্যের শিল্প কয়েকটি অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত, ফলে সেই সব অঞ্চলেই সহরের সংখ্যা বেশী। বেশীর ভাগ জেলাতেই উল্লেখযোগ্য ভাবে কলকারখানা গড়িয়া উঠে নাই, ফলে উহার লোকসমাজ গ্রামের মাটিই আঁকড়াইয়া আছে। তাহা হইলে গত ত্রিশ বৎসরে সহরবাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে কেন? কেন গ্রাম-ছাড়া মানুষ আজও সহরে আসে? উহার কারণ কৃষির রিক্ততা। কৃষি দীর্ঘদিন ধরিয়া অবনতির মুখে, বিপুল গ্রামবাসীদের কৃষি আর লালন করিতে পারে না। কৃষির রিক্ততা হইতে মুক্তিব সন্ধানেই লোক সহবে আসিয়াছে এবং আজও আসিতেছে।

সহরের শ্রেণীবিভাগ

পশ্চিমবঙ্গেব সহবগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। এই শ্রেণীবিভাগ হইতে আমরা সহব সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাইব।

পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ সহরই **আবাসিক** (Residential towns)। উহারা জেলা বা মহকুমা-কেন্দ্র। ইহাদের সংখ্যাই ৬৭। এইরূপ আবাসিক সহর হইল বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, সিউড়ি, রামপুরহাট, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, তমলুক, উলুবেড়িয়া, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু সহরকে বলা যায় **শিল্প-সহর** (Industrial towns)। কয়েকটি শিল্প এই সকল সহরে কেন্দ্রীভূত। এইরূপ সহরের সংখ্যা ৩৩টি। শিল্প-সহরগুলির তালিকায় পড়ে চিত্তরঞ্জন, বার্নপুর, রানীগঞ্জ, শ্রীরামপুর, হাওড়া, বজবজ, গার্ডেনরীচ, বাটানগর, টিটাগড়, নৈহাটি, হালিসহর, বারাকপুর, কলিকাতা প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গে কিছু সহর আছে যাহাকে বলা যায় **খনি-সহর**। প্রধানত কয়লাখনিকে কেন্দ্র করিয়া এই সহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সহরগুলি হইল—বরাকর, দিসেরগড় এবং নিয়ামতপুর।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি সহর আছে যাহাকে বলা যায় **রেলওয়ে সহর**। বড় রেলস্টেশন, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি কেন্দ্র করিয়া এই সহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে সহবগুলি নাম আসানসোল, ওণ্ডাল, খড়গপুর, কাঁচরাপাড়া এবং শিলিগুড়ি।

কলিকাতার জন্ম-বৃত্তান্ত

আমরা দেখিয়াছি যে বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, জেলাকেন্দ্র, বড় রেলস্টেশন ধীবে ধীরে সহরে পরিণত হয়। আজ যাহা বড় সহর একদিন হয়তো উহা ছিল একটা অখ্যাত গ্রাম, কিংবা জনবসতিহীন 'তেপান্তরের মাঠ'। এই প্রাসাদময়ী কলিকাতা মহানগরী—ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দ্বিতীয় নগরীরূপে যাহার খ্যাতি—একদিন ইহা ছিল ছোট্ট তিনটি অখ্যাত গ্রামের সমষ্টি মাত্র।

প্রায় আড়াই শত বৎসব আগেকার কথা। পাশাপাশি তিনটি গ্রাম—সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা। চারিদিকে বন আর বন, বাতাসে পচা পাতার গন্ধ, ঝোপে-ঝাড়ে সাপ, রাত্রে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন। সুতানুটি গ্রামে কয়েক ঘর তাঁতীর বাস। তারা সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর গ্রাম, ম্যালেরিয়ায় মানুষ মরে অঢেল। এই সুতানুটিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলী কুঠির কর্মচারী জব চার্নক ১৬৯০ সনে একটি কুঠি স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে জঙ্গলে-ভরা এই অঞ্চলে দোকানপাট, গঞ্জ গড়িয়া উঠিল। জব চার্নক এইভাবেই সুতানুটিতে কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ১৬৯৮ সনে কোম্পানী সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর—

এই তিনটি গ্রামের ইজারা নিলেন। এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী কলিকাতা মহানগরী গড়িয়া উঠিল।

বাগবাজারের খাল হইতে বড়বাজারের টাকসাল পর্যন্ত সুতানুটি; কাস্টমস্ হাউস পর্যন্ত কলিকাতা, আর কলিকাতার দক্ষিণে এখনকার কালীঘাট পর্যন্ত গোবিন্দপুর। গ্রামগুলিতে তখন জনবসতি খুবই বিরল। আলো-ঝলমল আজিকার চৌরঙ্গী সেদিন জঙ্গলময় ছিল। দিনের বেলা চৌরঙ্গী দিয়া মানুষ হাঁটিতে ভয় পাইত। পালকি-

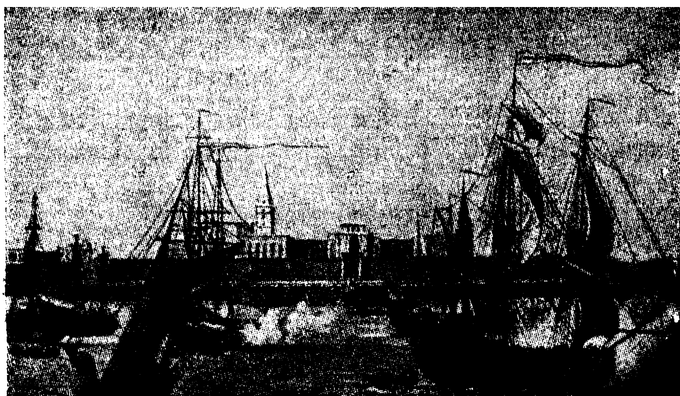


প্রাচীন কলিকাতার একটি দৃশ্য

বেহারাদের ডবল ভাড়া দিয়াও পাওয়া যাইত না। জঙ্গলে ডাকাতের দৌরাত্ম্য। এখন যেটা চিৎপুর, সেদিন সেখানে 'সতীদাহের' চিতা জ্বলিত। এখন যেটা শিয়ালদহ, উহার গায়ে ছিল বৈঠকখানার গলাকাটা গলি। গলিতে মাথা গলাইলেই মাথা কাটা যাইত, এমনি

ভীষণ ডাকাতের উৎপাত। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতার এই সব কাহিনী কল্পনা মনে হইবে। ইহা কিন্তু আদৌ কল্পনা নয়। অতীতের কলিকাতার এই ছিল অবস্থা।

তাহা হইলে এই জঙ্গলময় গ্রামে চার্নক এবং ইংরাজরা কুঠি নির্মাণ করিলেন কেন? ইহার প্রধান কারণ হুগলী নদী। চার্নক বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এই হুগলী নদীই বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথ। আর হুগলী নদীর গায়েই সুতানুটি। দেশে তখন মারাঠাদের উৎপাত, চতুর্দিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা। মোগল সাম্রাজ্য তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাই এমন একটা জায়গার দরকার, যেখানে নিরাপদে বাস করা এবং



পুরানো ফোর্ট উইলিয়ম—সামনে গঙ্গা

বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব। হুগলী নদী পার হইয়া এই তিনটি গ্রামে হুট করিয়া মারাঠা বা অন্য কোন শত্রুর পক্ষে হানা দেওয়া সহজ নয়। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এই গ্রাম তিনটিতে নিরাপদে বসবাস করা সম্ভব। আর হুগলী নদী দিয়া সোজা সাগরে পাড়ি দেওয়াও সহজ। তাই কোম্পানী এই তিনটা গ্রামের ইজারা নিয়া বসবাস

সুরু করিলেন। ১৬৯৬ সনে হুগলী নদীর পারে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ করিলেন। তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে দুর্গের নাম হইল 'ফোর্ট উইলিয়ম'। ময়দানের কাছে এখন যে দুর্গটি আছে উহা কিন্তু আরও অনেক পরে নির্মিত হইয়াছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রুত বাড়িয়া গেল। স্থাপিত হইল নূতন নূতন অফিস। কোম্পানী তখন কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটির জমিদার। জমিদারির কাজের জন্য কাছারী বসিল। কোম্পানীর নানা অফিসে, জমিদারী কাছারীতে কাজকর্মের জন্য লোকের প্রয়োজন। গ্রামের লোক চাকরির জন্য কলিকাতায় আসিতে লাগিলেন। বাণিজ্যের জন্য আসিলেন নানা দেশের লোক—আরব মুসলমান, চীনা, আর্মেনিয়ান, পার্শী প্রভৃতি। ইংরাজদের সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল।

জনবসতি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রভাবে বাস করিবার ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল; যথা—পানীয় জল, হাটবাজার, দোকানপাট, হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তাঘাট, যানবাহন। ডালহৌসী স্কোয়ারের লালদীঘিটা পানায় ভর্তি। জল মুখে দেওয়া যায় না। মাত্র ২০ টাকা খরচ করিয়া দীঘির পাঁক ও পানা তোলা হইল। দীঘিতে মাছ ছাড়া হইল। দীঘির চারিপাশে গড়া হইল কমলালেবু, শাকসবজি, তরিতরকারির বাগান। এখনকার সেণ্ট জন চার্চের পূবদিকের জায়গাটায় তৈরী হইল হাসপাতাল। উপাসনার জন্য সাহেবরা কয়েকটা গীর্জা তৈরী করিলেন। জনবসতি আছে এমন এক একটা অঞ্চলে এক একটা বাজার গড়িয়া উঠিল,—শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার, নতুনবাজার, বেগবাজার, ঘাসতলা বাজার প্রভৃতি। পাড়াগুলির নামকরণ হইল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভিত্তি করিয়া। মুচিদের পাড়াটা মুচিপাড়া। কুমোরদের পাড়া কুমোরটুলী। এই ভাবে কয়েকটা পাড়ার সৃষ্টি

হইল—দাইপাড়া, জেলেটোলা, পটুয়াটোলা, কাঁসারীপাড়া, তাঁতীবাগান প্রভৃতি।

সাহেবরা স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। বর্তমানের হেস্টিংস স্ট্রীট হইতে সুরু করিয়া চীনাবাজার পর্যন্ত ইহার পরিধি। সাহেবপাড়ার উত্তরে বড়বাজার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী বণিকদের বাস এই পাড়ায়। বড়বাজার ছাড়াইয়া সুতানুটি। বাঙ্গালীদের বসবাস এখানে। সাহেবপাড়ার ঘরবাড়ি ইটের। বড় বাজারেও ইটের বাড়ি তৈরী হইতে লাগিল। আর সুতানুটির বাঙ্গালীপাড়ায় সব মাটির বাড়ি।

গ্রাম কলিকাতার দেহ হইতে ক্রমশ সহরের গন্ধ ফুটিয়া বাহির হইল। সওদাগরী অফিস, জমিদারী কাছারী, ইটের বাড়িঘর, গীর্জা, হাসপাতাল, দোকানপাট গ্রাম-কলিকাতার চেহারাটাই পালটাইয়া দিল। সহরবাসীর দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্থাপিত হইল কাপড়ের দোকান, ঔষধের দোকান, আসবাবপত্রের দোকান, বইয়ের দোকান, সাবান-তেল, ছুরি-কাঁচির দোকান ইত্যাদি। লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৬৯০ সনে সুতানুটিতে চার্নকের কুঠি স্থাপনের বিশ বৎসরের মধ্যে ১৭১০ সনে সহর-কলিকাতায় লোকসংখ্যা দাঁড়াইল দশ বার হাজার। মাত্র চল্লিশ বৎসরে ১৭৫১ সনে এই লোকসংখ্যা হইল চার লক্ষ নয় হাজার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে সহর-কলিকাতার উন্নতি আরও দ্রুত হইল। হুগলী নদীর দুই ধারে গড়িয়া উঠিতে লাগিল পাটকল। গ্রাম ছাড়িয়া মানুষ ছুটিয়া আসিল কলে কাজ করিবার জন্য। কলিকাতার অদূরে রানীগঞ্জে স্থাপিত হইল কয়লাখনি শিল্প। কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জের কোলিয়ারী পর্যন্ত রেললাইন পাতা হইল। রেললাইন প্রসারিত হইল নানা সহর ও গ্রামে, কলিকাতা হইতে

রেললাইন পৌঁছাইল বোম্বাই এবং মাদ্রাজে। নূতন নূতন ঝকঝকে প্রশস্ত পাকা রাস্তা নির্মিত হইল সহর-কলিকাতার চারিপাশে এবং শিল্পাঞ্চলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া কলিকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটে (বর্তমান নাম নেতাজী সুভাষ রোড) স্থাপিত হইল সওদাগরি আফিস এবং ব্যাঙ্ক। শত শত মানুষ এই সকল আফিস এবং ব্যাঙ্কে কাজের সন্ধানে ছুটিয়া আসিল। চাকুরে মধ্যবিত্তের আশা-ভরসার কেন্দ্র হইল কলিকাতা। ১৮৭২ সনে লোকসংখ্যা দাঁড়াইল ৪,৪৭,৬০১ জন এবং ১৮৮১ সনে (অর্থাৎ মাত্র দশ বছরে) এই সংখ্যা হইল ৭,৮৬,৮৬৪ জন। আর ১৯৫১ সনের হিসাবে কলিকাতার লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৫,৪৮,৬৭৭।

কলিকাতা একটি প্রাচীন সহর। ইহার বয়স প্রায় আড়াই শত বৎসর। আজ এই মহানগরীতে প্রায় ২৬ লক্ষ লোকের বাস। বাড়ির গায়ে বাড়ি, বাড়ি বাড়ি বিজলিবাতি, কলে কলে জল, চতুর্দিকে অসংখ্য রাস্তা, অলিগলি, রাস্তায় মিনিটে মিনিটে ট্রাম-বাস। আজ কে বলিবে, আড়াই শত বৎসর আগে এই জায়গাটা ছিল বনজঙ্গল, পচা ডোবা-নালা, বাঘ, সাপ, চোর-ডাকাতে ভরা তিনটি অজানা গ্রাম।

অনুশীলনী

১। মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চল সেকালে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তাহা কি করিয়া বোঝা যায়?

২। বর্তমানে গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কেন?

৩। সহর গ্রামের উপর নির্ভরশীল কেন?

৪। সহরের বাজার গ্রাম্য জীবনে কি পরিবর্তন আনিয়াছে?

৫। গ্রামের মেলায় চাষীরা দল বাঁধিয়া যায় কেন?

৬। নিম্নবঙ্গের এবং কেরালার গ্রামগুলি ছাড়া ছাড়া কেন?

৭। সহর বলিতে কি বোঝ? পশ্চিমবঙ্গে সহরের সংখ্যা এত কম কেন?

৮। হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগনার সহরের সংখ্যা বেশী কেন? মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর সহরের সংখ্যা এত কম কেন?

৯। চিত্তরঞ্জন, বরাকর ও খড়গপুর বড় সহর কেন?

১০। জেলাকেন্দ্রে সহর গড়িয়া উঠে কেন? মেলায় সহর গড়িয়া উঠে কি?

১১। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতায় বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন কেন?

১২। জনবসতি বৃদ্ধি পাইলে নূতন সহরের কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়?

১৩। কলিকাতার লোকসংখ্যা উনবিংশ শতকে বিরাট ভাবে বৃদ্ধি পাইল কেন?

১৪। কলিকাতায় চীনা, পার্শী, আর্মেনিয়ান প্রভৃতির আগমনের কারণ কি?

১৫। কোন্ অবস্থায় গ্রাম বড় হইয়া সহরে পরিণত হইতে পারে?

শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :

(ক) নিম্নবঙ্গের গ্রামগুলি ——।

(খ) উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলি ——।

(গ) জলপাইগুড়ি একটি —— সহর।

(ঘ) চিত্তরঞ্জন একটি —— সহর।

(ঙ) বরাকর একটি —— সহর।

(চ) কলিকাতা —— গ্রামগুলি কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(ছ) —— কলিকাতা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

সপ্তম অধ্যায়

পৃথিবীর কয়েকটি লোকসমাজ

প্রকৃতি এই পৃথিবীকে বিচিত্র ভাবে গড়িয়াছে। ইহার কোন কোন অঞ্চল গভীর অরণ্যে আবৃত। সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া অরণ্যে চিরহরিৎ বৃক্ষের সমারোহ। কোন কোন অঞ্চলে দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি, কোথাও গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। কোথাও মাইলের পর মাইল ধূ-ধূ রুক্ষ মরুভূমি, আবার উহারই মধ্যে স্থানে স্থানে শ্যামল মরূদ্যান। মরুভূমিতে প্রচণ্ড গরম, ধূলার ঝড়ে দিগ্ দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আবার এমন দেশও আছে, যেখানে বারো মাসই শীত, শীতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, সারা বছর দেশ বরফে ঢাকা থাকে। অরণ্যভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি, বরফভূমি --এমনি আরও অনেক বিচিত্র বিভিন্ন অঞ্চল রহিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, কত সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, তবু আজও এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন লোকসমাজ বাঁচিয়া রহিয়াছে। কেহ উন্নত, কেহ বা অনুন্নত জীবন যাপন করে। সর্বত্রই প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া লোকসমাজগুলি বাঁচিবার চেষ্টা চালাইতেছে। বিভিন্ন লোকসমাজের জীবন নানা বৈচিত্র্যে ভরা। যাহারা একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে, তাহাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি একই রকম। বুঝিবার সুবিধার জন্য পণ্ডিতেরা পৃথিবীটাকে কয়েকটা প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সব অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের জীবনযাত্রা মোটামুটি এক রকম, উহাদের প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region) বলা হয়। বিষুবরেখার নিকটে, উত্তরে ও দক্ষিণে যে সব অঞ্চল অবস্থিত উহা একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল, উহা নিরক্ষীয় অঞ্চল নামে অভিহিত। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলভাগ ও আমাজন অববাহিকা, আফ্রিকার

গিনি উপকূলভাগ ও কঙ্গো অববাহিকা, দক্ষিণ এশিয়ার মালয়, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। যে সব অঞ্চলে মাইলের পর মাইল তৃণভূমি অথচ আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, উহাকে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল বলে। কোন কোন অঞ্চলে আবার তৃণভূমি আছে, কিন্তু আবহাওয়া খুবই উষ্ণ, উহা উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল নামে পরিচিত। পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে সাহারা, কালাহারি, আরব, থর প্রভৃতি মরুভূমি রহিয়াছে, উহাদের উষ্ণ মরু অঞ্চল বলে। যে সব অঞ্চল (যেমন গ্রীনল্যাণ্ড, উত্তর সাইবেরিয়া প্রভৃতি) প্রায় সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে, উহা তুন্দ্রা নামে অভিহিত। যে সব অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়, উহা মৌসুমী অঞ্চল। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এইরূপ আরও বহু প্রাকৃতিক অঞ্চল আছে। তোমরা ভূগোল বইতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পড়িবে। সমাজজীবনের আলোচনায় এই সব প্রাকৃতিক অঞ্চলে যে সকল লোকসমাজের বাস, তাহাদের জীবনযাত্রার বিবরণই প্রধান স্থান অধিকার করে। এখন, পৃথিবীর কয়েকটি লোকসমাজের জীবনযাত্রার বিবরণ দেওয়া হইবে।

অরণ্যভূমি : মালয়ের লোকসমাজ

মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি সংকীর্ণ দীর্ঘ উপদ্বীপ চোখে পড়িবে, উহাই মালয়। ইহা নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। সারা বৎসর এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ, এখানে শীত ঋতু নাই। প্রায় সারা বৎসরই এখানে বৃষ্টি হয়, ফলে পর্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত দেশটাই গভীর অরণ্যে আবৃত। অরণ্যের মধ্যে বড় বড় গাছ, গাছের তলদেশে বেতের ঝোপ এবং নানা রকম জটপাকানো লতা এই গভীর অরণ্যে এদেশের আদিম অধিবাসীরা বাস করে। ইহাদের নাম সেমাঙ্গ।

মালয়ে ক্রমে আরও নানা জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছে; যথা—চীনা, মুসলমান, ইংরেজ, ভারতীয় প্রভৃতি।

মালয়ের আদিম অধিবাসী সেমাঙ্গদের রূপ ও জীবনযাত্রা দুই-ই বিচিত্র। তাহারা নিগ্রোদের মত খবাকৃতি, গায়ের রং কালচে শ্যামবর্ণ, নাক চ্যাপ্টা, মাথায় ভেড়ার লোমের মত কুঞ্চিত কেশ। সেমাঙ্গরা চাষবাস শেখে নাই, আদিম মানুষের মত ফলমূল আহরণ করাই ইহাদের প্রধান পেশা। অবশ্য তাহারা শিকারও করে। ডুরিয়ান বৃক্ষের সবুজ ফল-ই তাহাদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। জাম, বাদাম এবং নানারকম বৃক্ষমূলও তাহারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

মালয়ের জঙ্গলে একজাতীয় বৃক্ষলতা একই স্থানে জন্মায় না। সমগ্র অরণ্যে ছড়ানো থাকে বলিয়া এই সমস্ত বৃক্ষলতার উপর নির্ভরশীল সেমাঙ্গদের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়—তাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান নাই। তাহারা কোনস্থানে তিন চার দিনের অধিক বাস করে না। ঋতু অনুসারে বৃক্ষলতাদির ফল জন্মে, সেমাঙ্গরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বৃক্ষলতার বনে বাস করে। সেমাঙ্গরা বড় বড় দল পাকাইয়া কোন স্থানে বাস করে না; কারণ, তাহা হইলে প্রকৃতি-প্রদত্ত পরিমিত আহার্যের অভাব ঘটিবে। তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়াই বাস করে। শিশুসন্তান সহ কুড়ি-তিরিশ জনের দলকে বেশ বড় একটি দল বলিয়া গণ্য করা হয়। শিকার ও ফলমূল সংগ্রহের ব্যাপারে এ সমস্ত দলের মধ্যে বিরোধ এড়াইবার জন্য দলগুলি নির্দিষ্ট এলাকায় কোন নির্দিষ্ট দলের আধিপত্য মানিয়া লয়। কুড়ি বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া একটি দল তাহার অধিকার বিস্তার করিতে পারে। পিতামাতা ও সন্তানাদির পারিবারিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়াই এক একটি দল গঠিত হয় ও তাহারা প্রধানত ফলমূলের উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকে—প্রয়োজন হইলে কিংবা সুযোগ

আসিলে শিকার করিয়া কিংবা মাছ ধরিয়াও তাহারা খাইয়া বাঁচে। শিকারের খোঁজে কিংবা বৃক্ষমূলের সন্ধানে এক দল আর এক দলের এলাকায় প্রবেশ করিতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ ডুরিয়ান বৃক্ষে যে সবুজ কাঁটাওয়ালা ফল জন্মে, সেই ফল সংগ্রহ একমাত্র নিজ এলাকাবর্তী বৃক্ষ হইতেই করা চলে। খাদ্যসংগ্রহ কার্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় এক দলের সহিত অন্য দলের সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়; কিন্তু তাহা নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, দূরবর্তীদের সহিত সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ একরকম নাই বলিলেই চলে। যাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ বেশী, তাহাদের লইয়া ছোট একটি গোষ্ঠীর পত্তন হয়। গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ অনুভব করে ও একই ভাষায় কথাবার্তা বলে; কিন্তু কিছু দূরবর্তী অঞ্চলেই ভাষা অন্যরূপ এবং তাহাদের সহিত অন্য ভাষাভাষীদের যোগ নাই বলিলেই চলে। সেমাঙ্গদের মধ্যে সেইজন্য কোন কৌমসমাজ (Tribal Society) গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। একটি ছোট সেমাঙ্গ দলের পুরুষেরা অন্য দলের নারীদের বিবাহ করে ও বিবাহের পর কিছুকাল পত্নীর দলের সহিত বাস করে। পরে সে স্ত্রীসহ নিজ দলে ফিরিয়া আসিয়া বাস করিতে সুরু করে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সেমাঙ্গরা প্রধানত ফলমূলাহারী। প্রকাণ্ড ডুরিয়ান বৃক্ষের ফলই তাহাদের প্রধান খাদ্য, মূলের মধ্যে ইয়ামের মূলই তাহারা বেশী খায়। ডুরিয়ান বৃক্ষ তাহারা সম্পদ বলিয়া মনে করে ও বিভিন্ন দলের অধিকারে অনেকগুলি ডুরিয়ান বৃক্ষ থাকে। দলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে আবার গাছগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, অন্য দলের কিংবা অন্য কাহারও বৃক্ষের ফল আহরণ করা অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ডুরিয়ান বৃক্ষে যখন সবুজ ফল ধরে

সেমাঙ্গদের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া যায়। সেমাঙ্গরা তখন সব কাজ বন্ধ রাখিয়া শুধু এই ফল আহরণ করে, আর মনের আনন্দে প্রচুর ফল ভক্ষণ করে। সেমাঙ্গ মেয়েরা ভবিষ্যতের জন্য টুকরিতে ফল সংরক্ষিত করিয়া রাখে।

সেমাঙ্গদের শিকারের প্রধান হাতিয়ার তীরধনুক। বাঁশের ফালি কাটিয়া তাহারা ধারালো তীর বানায়, তীরে বিষ মাখানো থাকে। বনে বনে ঘুরিয়া তাহারা খরগোশ, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, বুনো শূয়োর প্রভৃতি শিকার করে এবং উহাদের মাংস তাহারা খায়। লতার ফাঁদ পাতিয়া তাহারা পাখী ধরে। মাঝে মাঝে তাহারা মাছও ধরে। পাম্ গাছের শুকনো পাতা সরু করিয়া তাহারা বল্লমের মত ব্যবহার করে, উহারই সাহায্যে মাছ গাঁথিয়া তোলে।

সেমাঙ্গদের ছোট ছোট দলগুলি জঙ্গলের স্থানে স্থানে ঘর বাঁধে। তবে উহা তাহাদের অস্থায়ী বাসস্থান, কেননা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে ফলমূল ও শিকারের সন্ধানে ইহাদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ঘরগুলি বাঁশের তৈরী, ছাউনি পাম্ গাছের পাতার। বৃষ্টিবহুল অঞ্চল বলিয়া ছাউনি বেশ পুরু। মেয়েরাই ঘর তৈরী এবং ছাউনি বাঁধার কাজ করে। মেঝে স্যাঁতসেঁতে বলিয়া শয়নের জন্য বাঁশের উঁচু মাচা বানানো হয়।

সেমাঙ্গদের অনুন্নত জীবনযাত্রার পাশাপাশি মালয়ে একটি উন্নত জীবনযাত্রাও ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয়গণ এদেশে রবার-বাগিচা স্থাপন করিয়াছেন। এই রবার-বাগিচায় মজুর হিসাবে খাটে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের মানুষ। বর্তমানে মালয় পৃথিবীর বৃহত্তম রবার-উৎপাদক দেশ। ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে মুসলমান ও চীনারা মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা ইউরোপীয়দের আধিপত্য মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। বহুদিন

আন্দোলনের পর সম্প্রতি মালয়বাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্বাধীন নাগরিকদের মর্যাদা লাভ করিতে পারিয়াছে।

রবার বর্তমান যুগে এক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। মোটরগাড়ির চাকানির্মাণে এবং আরও অন্যান্য বহু কাজে রবার ব্যবহৃত হয়। রবার-বাগিচাগুলি হইতে ইউরোপীয়গণ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া থাকে।

রবার ছাড়া মালয়ে নারিকেল, সাগু, আনারস, কলা, মশলা, তামাক প্রচুর উৎপন্ন হয়। কাঠের ব্যবসা ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছে। মালয় হইতে বেত, বাঁশ, গ্যাটাপচা বিদেশে রপ্তানি হয়। মালয় পৃথিবীর বৃহত্তম টিন-উৎপাদক দেশ।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে ছোট ছোট সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ঝকঝকে প্রশস্ত রাস্তা দিয়া মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। সহরে ইউরোপীয়, চীনা, ভারতীয় মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি বাস করে। সহর হইতে দূরে, মালয়ের গভীর বনে সেমাঙ্গরা কিন্তু আজও যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

কঙ্গো ও আমাজন অববাহিকা

আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো অববাহিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা মালয়ের মত নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানেও বৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন গ্রীষ্ম। এখানেও প্রায় সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়। মালয়ের মত এই অঞ্চলগুলিও গভীর অরণ্য এবং লতাপাতায় আবৃত থাকে। একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ হওয়ায় ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে বেশ মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

কঙ্গো অববাহিকায় **'পিগ্‌মী'** নামে একদল ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ বাস করে। ইহাদের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ছোট ছোট কুঞ্চিত কেশ। গভীর অরণ্যে চাষবাস সম্ভব নয় বলিয়া শিকারই ইহাদের প্রধান পেশা। তীরধনুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র। সেমাঙ্গদের মত ইহাদের তীরেও

বিষ মাখানো থাকে। সেমাঙ্গদের মত ইহারাও বনে বনে যাযাবরের মত ঘুরিয়া বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। পুরুষেরা শিকার করে, মেয়েরা বন হইতে ফলমূল সংগ্রহ করে। পশুপাখীর মাংস এবং ফলমূল ইহাদের খাদ্য। সেমাঙ্গদের সহিত পিগ্‌মীদের প্রধান তফাৎ কোথায়? সেমাঙ্গরা প্রধানত ফলমূল আহরণকারী, আর পিগ্‌মীরা শিকারী। কঙ্গো অরণ্যের পশ্চিম অংশে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের বাস। ইহারা কিন্তু চাষবাস শিখিয়াছে। জঙ্গল সাফ করিয়া ইহারা গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি



পিগ্‌মীদের বাসস্থান

চাষ করে। বাড়িতে বাড়িতে কলাগাছ। পিগ্‌মীদের সহিত ইহাদের নিয়মিত বাণিজ্য চলে। পিগ্‌মীরা খাদ্যশস্যের বিনিময়ে ইহাদের মাংস যোগায়।

দক্ষিণ আমেরিকার পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমার্জনের অববাহিকার গহন অরণ্যে যে লোকসমাজ বাস করে, উহাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য কি? এখানকার লোকসমাজ চাষবাস শিখিয়াছে। বন পোড়াইয়া, গাছ কাটিয়া তাহারা জমি সাফ করিয়াছে। কাসাবা, ভুট্টা, আনারস, মিষ্টি আলু, আখ প্রভৃতি নানা জিনিস তাহারা উৎপন্ন করে। মালয়ের মত এই অঞ্চলেও ইউরোপীয়গণ রবার-বাগিচা স্থাপন করিয়াছে।



রবার সংগ্রহ

চাষবাস শিখিবার ফলে ইহারা সেমাঙ্গ বা পিগ্‌মীদের মত যাযাবর নয়। ক্ষেতের কাছেই তাহারা বাঁশের তৈরী বড় বড় মজবুত ঘর তৈরী করিয়াছে। ঘরের উপরে তালপাতার পুরু ছাউনি। প্রায় দু'শ লোক

এইরূপ একটি ঘবে বাস করে। এই ঘরের নাম—মালোকা। ঘরের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট থাকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে আগুন জ্বালে। আগুনেব ধোঁয়ায় মশা থাকিতে পাবে না ; এই মশা বড়ই বিষাক্ত। ঘবেব বাহিবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাহাবা মাঝে মাঝে নৃত্য করে।

তৃণভূমি : আমেরিকার প্রেইরী ও আর্জেন্টিনার লোকসমাজ

এতক্ষণ অরণ্যভূমিব কয়েকটি লোকসমাজেব জীবনযাত্রার কথা বলা হইল। এবাবে তৃণভূমিব কথা শোন।

উত্তব আমেরিকাব মধ্যাংশের সমভূমিতে মাঠের পর মাঠ শুধু তৃণ আব তৃণ ; গাছপালা নাই, বনজঙ্গল নাই। আমাদের বাংলাদেশের মত সবুজ ঘাস নয়, বোদে-পোড হবিদ্রাভ তৃণ। মাইলেব পব মাইল বিস্তৃত তৃণেব সমুদ্র। এইগুলিকে বলে উত্তব আমেরিকাব **'প্রেইরী'** (Prairies)। প্রেইবী বলিতে উন্মুক্ত তৃণভূমি বুঝায়। এই অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মে সাধারণত বৃষ্টিপাত হয়, তবে গড়ে মাত্র ১০ হইতে ৩০ ইঞ্চি। বৃষ্টিপাত এত কম বলিয়া এখানে গাছপালা জন্মায় না, শুধু ঘাস জন্মে।

প্রেইবীগুলি বা তৃণভূমিতে বেড ইণ্ডিয়ানরা বাস কবে। ইউরোপীয়দেব আগমনের পূবে ইহাদেব পূবপুরুষেরা শিকার কবিয়া বেড়াইত। তীব-ধনুক ছিল তাহাদেব প্রধান অস্ত্র। মোটা চামড়ার কামিজ, পাতলা নবম চামড়াব জুতা, মাথায় পাখীর পালক—ইহাই ছিল তাহাদের পোশাক। দলপতিদের পোশাকে বেশ জাঁকজমক ছিল—কানে সোনার দুল, গলায় ঝিনুকেব মালা, মাথায় লাল-নীল-সবুজ বঙের পাখীর পালকের মুকুট।

সাদা চামড়ার লোকেরা ক্রমে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তাহাদের প্রভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের পোশাক এবং জীবনযাত্রায় অনেক

পরিবর্তন আসিয়াছে। এখন তাহারা কোট, প্যাণ্ট ও টুপি পরে। মাথার লম্বা চুল ঘাড়ের উপর ঝুলিয়া থাকে। তাহারা পূর্বে অশ্বের ব্যবহার জানিত না। সাদা চামড়ার লোকেরা প্রথম এই অঞ্চলে অশ্ব আমদানি করে। এখন অশ্বচালক হিসাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের পৃথিবী-জোড়া খ্যাতি। তাহারা ক্রমে বন্দুকের ব্যবহারও শিখিয়া লইয়াছে।



ল্যাসো হাতে গো-পালকগণ

পূর্বে রেড ইণ্ডিয়ানরা ছিল শিকারীর জাত (আফ্রিকার পিগ্‌মীদের মত), বর্তমানে তাহারা গো-পালক (Cowboys) হিসাবে পরিচিত। প্রেইরীগুলিতে বড় বড় গো-খামার (Cattle-farm) গড়িয়া উঠিয়াছে, ইংরাজীতে ইহাকে বলে 'র‍্যাঞ্চ' (Ranch) ; র‍্যাঞ্চের মালিককে বলে

'র‍্যাঞ্চার' (Rancher)। এক একজন র‍্যাঞ্চারের সহস্রাধিক গরু, বলদ ও ষাঁড় থাকে। র‍্যাঞ্চারের অধীনে রেড ইণ্ডিয়ানরা গো-পালকের কাজ করে। ঘোড়ায় চড়িয়া তাহারা তৃণভূমিতে শত শত গরু চরাইয়া বেড়ায়। গরুগুলিকে বাঁধিবার জন্য তাহারা একরকম দীর্ঘ দড়ি ব্যবহার করে, উহার নাম 'ল্যাসো' (Lasso)। সহরে গরু কেনাবেচা হয়। গো-পালকেরা মাইলের পর মাইল ঘোড়ায় চড়িয়া গরুর পাল লইয়া সহরে যায়। পথেই বহুদিন অতিবাহিত হয়; রাত্রে তৃণভূমিতেই তাহারা তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম লয়। সহরের বাজারে গরু-বিক্রয় শেষ করিয়া স্ত্রী-পুত্রদের জন্য নানা উপহার কিনিয়া লইয়া তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসে। আমেরিকার সিকাগো সহরে গরুগুলি পরে চালান যায়। সিকাগো সহর হইতে গরুর মাংস টিনে ভরিয়া দেশবিদেশে চালান যায়। এইভাবে প্রেইরীর গো-পালকদের জীবন কাটে। তাহাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণত স্কুলে যায় না। তৃণভূমিতে যে কয়টি স্কুল আছে, সেগুলি খুব দূরে দূরে অবস্থিত। তাই বাড়িতেই ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে। যাহারা স্কুলে যায়, তাহাদের বাহন অশ্ব। প্রত্যেক স্কুলে তাই আস্তাবলের ব্যবস্থা থাকে।

আর্জেন্টিনা

উত্তর আমেরিকার প্রেইরীর মত দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আর্জেন্টিনাতেও তৃণভূমি আছে, উহাকে **'পাম্পাস'** বলে। প্রেইরী এবং পাম্পাস—এই দুইটি আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল।

আর্জেন্টিনা কিন্তু সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র। সাদা চামড়ার লোকেরা এই অঞ্চলকে বিশেষ উন্নত করিয়াছেন। তাঁহারা এক একজন বিরাট জমিদার। কেহ কেহ দশ হাজার একর জমির মালিক। প্রথমে মেষ, অশ্ব, গরু প্রভৃতি পশুপালনই স্থানীয় লোকসমাজের পেশা ছিল।

ক্রমে ইহারা কৃষিকার্য শেখে। বর্তমানে আর্জেন্টিনার লোকসমাজ প্রধানত কৃষিজীবী, আর প্রেইরীর লোকসমাজ গো-পালক। দক্ষিণ আমেরিকার শস্যভাণ্ডার আর্জেন্টিনা। পাম্পাসে নানা ফসল ফলে—গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি। আর্জেন্টিনার কৃষিজাত দ্রব্য দেশবিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার লোকসমাজ পশুপালনেও পারদর্শী, তবে তাহারা মেষপালক, প্রেইরীর মানুষদের মত গো-পালক নয়। বর্তমানে আর্জেন্টিনা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পশম-উৎপাদক দেশ। ভেড়ার মাংস এবং পশম আর্জেন্টিনা প্রচুর পরিমাণে বাহিরে রপ্তানি করে। প্রেইরীতে অশ্বই প্রধান বাহন, আর্জেন্টিনায় কিন্তু আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। রেলপথ, রাজপথ, এমন কি বিমানপথেও যাত্রী ও মাল চলাচল হয়। প্রেইরী ও পাম্পাসের একই পরিবেশ, কিন্তু উভয় লোকসমাজের জীবনযাত্রায় কত পার্থক্য।

উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল

উত্তর আমেরিকার প্রেইরী এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এই অঞ্চলকে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল বলে। পৃথিবীতে আরও কয়েকটি তৃণভূমি অঞ্চল আছে, যেখানে জলবায়ু উষ্ণ। উহাকে উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল বলে। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, ব্রেজিল ; আফ্রিকার সুদান অঞ্চল প্রভৃতি উষ্ণ তৃণভূমির অঞ্চল বলিয়া অভিহিত। এখানে জলবায়ু খুবই উষ্ণ আবার বৃষ্টিপাতও অপেক্ষাকৃত বেশী। এই অঞ্চলে প্রকাণ্ড লম্বা, প্রায় ৯।১০ ফুট উঁচু তৃণ জন্মে। মাইলের পর মাইল উঁচু তৃণের বন সাফ করিয়া চাষবাস করা প্রায় অসম্ভব। তাই এই অঞ্চলের লোকসমাজ প্রধানত যাযাবর এবং শিকারী। তৃণবনে হরিণ, জিরাফ, বাঘ, সিংহ, হাতী প্রভৃতি পশু বিচরণ করে। এইসকল পশু শিকার করাই ইহাদের প্রধান পেশা। প্রেইরীর লোকসমাজের মত গো-পালন কিংবা আর্জেন্টিনার মত

কৃষিকার্য শিখিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা আজও যাযাবর এবং শিকারীর জীবন যাপন করে।

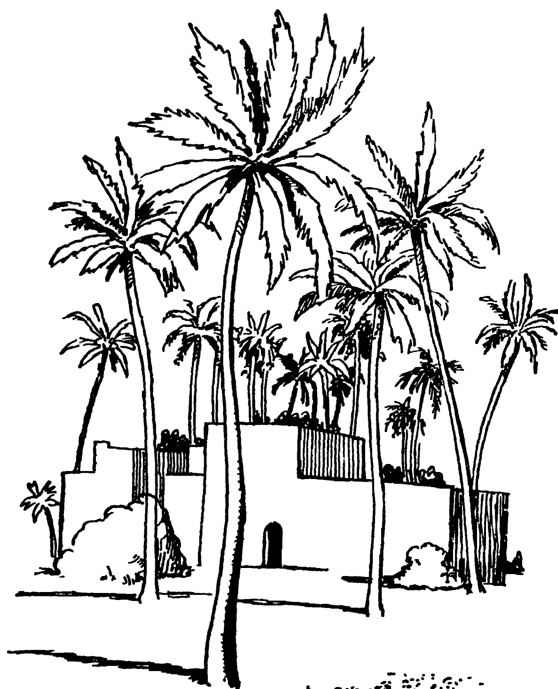
মরুভূমির দেশের লোকসমাজ—বেদুইন আরব

তৃণভূমির দেশ হইতে এবার চলো মরুভূমির দেশে। জল এবং আলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। মরুভূমিতে আলো পর্যাপ্ত, কিন্তু জলের একান্ত অভাব।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি আফ্রিকার সাহারা। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বালু আর বালু। এ যেন বালুর সমুদ্র। দিগন্তে আকাশের সহিত এই বালুর সমুদ্র মিশিয়াছে। গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই, আকাশে একটি পাখীও উড়ে না। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বালির ঝড় উঠে। **বেদুইন আরবগণ** এই মরুভূমিতে বাস করে। বিচিত্র জীবন ইহাদের। প্রকৃতির সহিত কি কঠোর সংগ্রামই না ইহারা করিতেছে!

বেদুইন আরবগণ যাযাবর। বাণিজ্যই তাহাদের জীবিকা। উট তাহাদের বাহন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর মধ্য দিয়া ইহাদের এক একটি দল চলাফেরা করে। কোন কোন দলে শতাধিক উট থাকে। একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া উট চলে। উটের পিঠে মেয়ে, পুরুষ ও শিশুরা বসে। উটই বহন করে তাঁবু, বাসনপত্র, চামড়ার ব্যাগে জল, চামড়ার বস্তায় খাবার। দলপতি সকলের আগে একটি উটের পিঠে চড়িয়া পথ দেখাইয়া চলে। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই তাহারা যাত্রা শুরু করে। যতই বেলা বাড়িতে থাকে বালু ততই উত্তপ্ত হয় বলিয়া চলাফেরা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। রাত্রিতে মরুভূমির মধ্যেই তাঁবু খাটাইয়া তাহারা বিশ্রাম করে। মরুভূমিতে দিনে যেমন গরম, রাত্রে তেমনি ঠাণ্ডা। বেদুইনরা তাই মোটা কম্বল সঙ্গে রাখে।

তাহাদের দেহ সুগঠিত, সুন্দর মুখশ্রী, নিবিড় কালো চোখ। পুরুষেরা সাদা আলখাল্লার মত ঢোলা জামা পরে, মেয়েরা রঙীন পোশাক ব্যবহার করে। সাদা কাপড় দিয়া পুরুষেরা মাথা ঢাকিয়া রাখে। তাহাদের প্রধান খাদ্য খেজুর, মাংস এবং রুটি। চামড়ার ব্যাগে সযত্নে তাহারা জল সংগ্রহ করিয়া রাখে।



মরূদ্যান (ঘরের উপরে খোলা ছাদ)

উটই বেদুইনদের প্রিয়তম বন্ধু। উটের পিঠেই তাহারা যাতায়াত করে। বালুর সমুদ্রে উটই তাহাদের জাহাজ। উটের মাংস তাহারা খায়। উটের দুধে পনীর হয়। উহার চামড়া দিয়া ব্যাগ ও তাঁবু এবং লোম দিয়া সুন্দর সুন্দর কম্বল তৈরী করে।

বালুময় মরুভূমির স্থানে স্থানে প্রকৃতি নয়নাভিরাম মরূদ্যান (Oasis) সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মরূদ্যানে জলাশয়ে সবুজ জল, মাঠে সবুজ ঘাস আর সারি সারি খেজুরের গাছ। মরূদ্যানে জল থাকায় সেখানে চাষবাসও হয়। চাষবাস সম্ভব বলিয়া এখানে একদল মানুষ স্থায়ী ,ভাবে বাস করে। তাহাদের ঘরগুলি মাটির, ঘরের উপরে খোলা ছাদ। রাত্রে ছাদে মাদুর বিছাইয়া তাহারা বিশ্রাম করে। মরূদ্যানে বেদুইনরা আসে বাণিজ্যের জন্য। কম্বল, মাংস, অস্ট্রিচ পাখীর লোম ইত্যাদি বেচিয়া তাহারা সংগ্রহ করে খেজুর, আটা, জল, কাঠ এবং বন্দুক। এইরূপ কেনাবেচা হয় বলিয়া মরূদ্যানে ছোট ছোট বাজার এবং নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। নিগ্রো, ইহুদী ও বেদুইন আরবগণ এই বাজারে কেনাবেচার জন্য মিলিত হয়।

বেদুইন আরবরা সকলেই যে শান্তিপ্রিয় বণিক তাহা নহে, ইহাদের মধ্যে দুধর্ষ ডাকাতের দলও আছে। এই ডাকাতেরা মরুভূমিতে বণিকদের উপর হামলা করিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নেয়।

মিশরের লোকসমাজ

মরুভূমির আর একটি দেশ মিশর। সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এই দেশ।

আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব দিকে লোহিত সাগর ও সাহারা মরুভূমির মধ্যে নীলনদ বহিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে রুক্ষ ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে নীলনদের দুই পাশ জুড়িয়া ঘন সবুজের লম্বা একটি উপত্যকা রহিয়াছে। প্রতিবৎসর একটি নির্দিষ্ট সময়ে নীলনদে বান হয় এবং দুই পাশের অনেক দূর পর্যন্ত স্থান বানের জলে ভাসিয়া যায়। তার পর কমিতে কমিতে বন্যার জল যখন একেবারে কমিয়া যায়, তখন মাটির উপর প্রচুর পলিমাটি পড়িয়া থাকে। আর এই পলিমাটিতেই চাষবাস করিয়া মিশরের **'ফেলাহীন'** (Fellahin) সোনার ফসল ফলায়। মিশরের

চাষীদেরই 'ফেলাহীন' বলে। শত শত বৎসর ধরিয়া ইহারা মান্ধাতা আমলের পুরানো কৃষিপদ্ধতিই আঁকড়াইয়া আছে। লাঙ্গলই ইহাদের চাষের হাতিয়ার। ইহারা প্রধানত উৎপন্ন করে ধান। নীল নদ হইতে ছোট ছোট খাল কাটিয়া ইহারা জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করে। কোন কোন অঞ্চলে নদীর জল বহন করিয়া আনিয়া মাঠে ঢালিয়া দেয়। ইউরোপীয়দের আগমনের পরে মিশরে তূলার চাষও হইতেছে। মিশরের তূলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তূলা। মরুভূমির দেশে একটি নদী কত উপকারে আসিতে পারে' তাহারই দৃষ্টান্ত মিশর। এইজন্যই মিশরকে বলা হয় 'নীলনদের দান'। নীলনদের কল্যাণেই মিশরের মানুষ এক উন্নত জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। নীলনদের কোলেই মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সূচনা।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার লোকসমাজ

মিশরের ন্যায় অস্ট্রেলিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল উষ্ণ মরুভূমি। মরু অঞ্চলে লোকবসতি দেশের অন্যান্য অংশ হইতে অনেক কম। বিজ্ঞানের কল্যাণে এই অঞ্চলের লোকসমাজ আজ এক উন্নত জীবনযাত্রা গড়িয়া তুলিয়াছে। উহা আলোচনা করিবার পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা কি ভাবে জীবন যাপন করে তাহা জানা দরকার। ক্যাপ্টেন কুকের আবিষ্কারের সময় অস্ট্রেলিয়ার এক আদিম সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আজিও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা সেই পুরানো জীবনযাত্রাই আঁকড়াইয়া আছে।

আদিম অধিবাসীরা দেখিতে কুশ্রী। তাহাদের গায়ের রং তামাটে, নাক চ্যাপ্টা, মুখ দাড়িগোঁফে ভরা। কোমরে এক টুকরা বস্ত্রখণ্ডই তাহাদের পরিচ্ছদ। শিকারই তাহাদের পেশা। শিকারে তাহাদের দক্ষতাও অসাধারণ। তাহারা এক চমৎকার অস্ত্র ব্যবহার করে, উহার নাম—বুমার‍্যাঙ্গ (Boomerang)। ইহা একটি বাঁকানো কাঠের

তৈরী ভারী অস্ত্র। আদিম অধিবাসীরা এই বুমার‍্যাঙ্গ এমন সুনিপুণ ভাবে ছুঁড়িতে জানে যে, ইহা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করিয়া পুনরায় তাহারই কাছে ফিরিয়া আসে। বুমার‍্যাঙ্গের সাহায্যে তাহারা পশু-পাখী এমন কি মাছ পর্যন্ত শিকার করে।

অহারা বাস করে ছোট ছোট মাটির ঘরে। ঘাস ও লতাপাতা দিয়া সেই ঘরের ছাউনী তৈরী হয়। তাহারা প্রায় সকলেই ছুরি দিয়া কাটিয়া নিজেদের শরীরের উপর নানা লতাপাতা, জীবজন্তু আঁকিয়া রাখে।

ক্যাপ্টেন কুকের আবিষ্কারের পরে প্রথমে ইংরেজগণ এবং পরে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ দলে দলে আসিয়া এই দেশে বসতি স্থাপন করে। আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। বর্তমানে আদিম অধিবাসী অপেক্ষা সাদা চামড়ার লোক-সংখ্যাই বেশী।

উনিশ শতকে (১৮৯২ সন) পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমির মধ্যে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। সোনার লোভে দলে দলে লোক এই অঞ্চলে আসিতে থাকে। ক্রমে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে খনি হইতে প্রচুর সোনা উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়। ইহারই ফলে **কুলগার্ডি** (.Coolgardie) এবং **কালগুর্লিতে** (Kalgoorlie) সুন্দর খনি-সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। লম্বা লম্বা চিমনি, আধুনিক যন্ত্রপাতি, মজুরদের বস্তি—খনি-সহরের সুপরিচিত রূপ এখানে চোখে পড়ে। এখান হইতে সোনা বাহিরে রপ্তানি হয়। আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ স্থাপন করিয়া পশ্চিম ও পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রপথে জাহাজে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী এবং প্রধান বন্দর পার্থ হইতে দেশবিদেশে যাওয়া যায়। শুধু রেলপথ এবং জলপথেই নয়, বিমানপথেও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া হইতে মহাদেশের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত সম্ভব হইয়াছে।

মরুভূমির লোকসমাজ অনেক সমস্যারও সুসমাধান করিয়াছে। রাজধানী পার্শ্বের বড় বড় জলের চৌবাচ্চা হইতে পাইপ বসাইয়া চারশত মাইল দূরবর্তী খনি-সহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছে। খনি-সহরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে পার্ক এবং উদ্যান। হাজার হাজার লোক এখানে বসবাস করে।

বরফের দেশের লোকসমাজ

পৃথিবীর কোন কোন অংশ যেমন মরুভূমি, তেমনি ইহার কোন কোন অংশ বরফভূমি। মরুভূমিতে সারা বৎসর প্রচণ্ড গরম, বরফের দেশে প্রচণ্ড শীত। শীতে সমুদ্র, নদীনালার জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। মনে হয়, কে যেন সারা দেশটার উপর একখানি সাদা বরফের চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে। বরফের দেশে বাস করে নানা লোকসমাজ— এস্কিমো, ল্যাপ, ফিন ও সামোয়েদ ইত্যাদি। গ্রীনল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, উত্তর সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশ এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্গত। ইহাকে **তুন্দ্রা অঞ্চল** বলে।

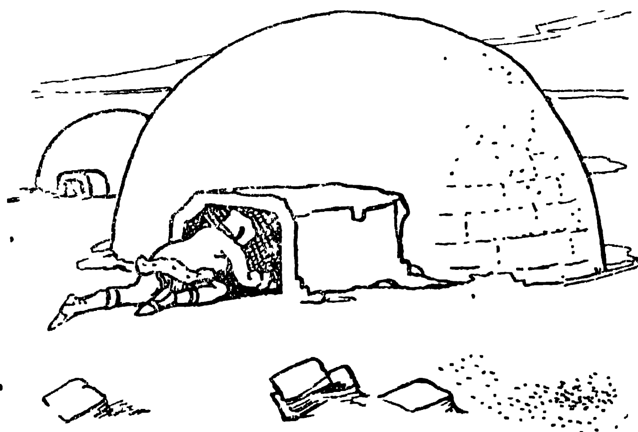
এস্কিমো

গ্রীনল্যাণ্ডে যে লোকসমাজ বাস করে, উহার নাম **এস্কিমো**। প্রায় সারা বছরই এই দেশ বরফে ঢাকা থাকে। শীতের তিন মাস এখানে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি, আর গ্রীষ্মের তিন মাস নিরবচ্ছিন্ন দিন। এখানে বৃষ্টি হয় না। চাষবাস স্বভাবতই অসম্ভব। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী এস্কিমোরা নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। পরিবেশের সহিত লোকসমাজ আশ্চর্যভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নেয়।

বরফের দেশে গাছপালা নাই, তাই এস্কিমোদের বরফের ঘরে বাস করিতে হয়। বরফখণ্ড পর-পর বৃত্তাকারে সাজাইয়া তাহারা ঘর তৈরী করে। ঘরে বরফের একটিমাত্র জানালা, সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ-পথে

হামাগুড়ি দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয়। ঘরের ছাদ চামড়ায় ঢাকা। ইহাতে ঘর গরম থাকে। মেঝেতে চামড়া বিছানো। এই বরফের ঘরকে বলা হয়—ইগলু (Igloo)। এই ঘর বেশ গরম। বরফের দেশের উপযোগী পরিচ্ছদ তাহাদের গায়ে। মাথা হইতে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ লোমের পোশাকে ঢাকা থাকে; শুধু নাক, চোখ ও মুখ খোলা থাকে। পায়ে থাকে চামড়ার জুতা।

এস্কিমোরা শিকারী। শিকারদ্বারাই তাহারা খাদ্য ও জীবিকার



ইগলু

সংস্থান করে। যাহাদের পক্ষে চাষবাস করা সম্ভব নয়, তাহাদের শিকার কিংবা পশুপালনই প্রধান পেশা। তীরধনুক এবং লম্বা বল্লম এস্কিমোদের হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে তাহারা সীল, ওয়ালরাস এবং মাছ শিকার করে। সীল তাহাদের জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটায়। তাহারা সীলের মাংস হইতে খাদ্য, চামড়া হইতে বস্ত্র, চর্বি হইতে তেল সংগ্রহ করে।

এস্কিমোদের দেশে রাস্তাঘাটের কোন ব্যবস্থা নাই। যাতায়াতের জন্য তাহারা শ্লেজগাড়ি ব্যবহার করে। বরফের উপর দিয়া লোমশ কুকুরেরা গাড়ি টানিয়া চলে। বেদুইনদের যেমন উট, এস্কিমোদের তেমনি কুকুর প্রিয় সাথী। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শিকারের সন্ধানে শ্লেজগাড়িতে চড়িয়া এস্কিমোরা বরফের দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। শিকার সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে?

বসন্তের আগমনে গ্রীনল্যাণ্ডের রূপ বদলাইয়া যায়। তখন বরফ গলিতে থাকে। সমুদ্র, নদীনালা জলে ভরিয়া যায়। বরফের ঘর হইতে



সীল শিকার

বাহির হইয়া এস্কিমোরা স্ত্রীপুত্র সহ চামড়ার তৈরী হালকা নৌকায় শিকারের সন্ধানে এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যাতায়াত করে। এই চামড়ার নৌকাকে বলে 'কয়াক' (Kayak)। গ্রীষ্মে তাহারা বরফের ঘরে বাস না করিয়া চামড়ার তাঁবু খাটাইয়া উহার মধ্যে বাস করে। গায়ে কিন্তু তখনও থাকে চামড়ার পোশাক—কেননা, গ্রীষ্মেও ওদেশ বেশ ঠাণ্ডা।

কাঠ বা অন্য কোন জ্বালানীর অভাব থাকায় এস্কিমোদের মধ্যে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা থাকে না। চর্বি তাহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। শীতের দেশে চর্বি খাদ্য-হিসাবে উপযোগীও বটে—কেননা, চর্বি দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে। মাংস বা মাছ তাহারা কাঁচাই ভক্ষণ করে ; তাই তাহাদের নাম এস্কিমো অর্থাৎ কাঁচা মাংস ভক্ষক।

ল্যাপ

ইউরোপের উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ডে এস্কিমোদের মত অন্য একটি লোক-সমাজ বাস করে, উহারা হইল ল্যাপ। এস্কিমোদের মত ল্যাপরা-ও বরফের দেশে বরফের ঘরে বাস করে। তাহাদের জীবনযাত্রাও এস্কিমোদের অনুরূপ। এস্কিমোদের মত ল্যাপরা-ও শিকারী। তবে ল্যাপল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে ঘাস জন্মে। এই সামান্য ঘাসের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ল্যাপগণ সুবৃহৎ লোমশ বন্না-হরিণের (Reindeer) পাল পোষে। বেদুইনদের যেমন উট, ল্যাপদের তেমনি বল্গা-হরিণ। তাহাদের স্লেজগাড়ি টানে বল্গা-হরিণ। বল্গা-হরিণের সুস্বাদু মাংস তাহারা ভক্ষণ করে। উহার চামড়া হইতে পোশাক, দুধ হইতে পনীর, হাড় হইতে হাতিয়ার, আর নাড়ীভুঁড়ি হইতে দড়ি তৈরী হয়।

উষ্ণ পূর্ব-উপকূল অঞ্চল : উত্তর চীনের লোকসমাজ

তোমরা মরুভূমির দেশের কথা পড়িয়াছ, যেখানকার আবহাওয়া অতিশয় উষ্ণ এবং যেখানে বৃষ্টি বহু বছর পরে হয়তো একবার মাত্র হয়। পৃথিবীতে আবার এমন অঞ্চলও আছে, যেখানকার আবহাওয়া খুবই উষ্ণ, জমি রুক্ষ, কিন্তু গ্রীষ্মে কিছু কিছু বৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক অঞ্চল বিভাগে এইরূপ অঞ্চল উষ্ণ পূর্ব-উপকূল অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। উত্তর চীন, জাপানের দক্ষিণ ভাগ, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। উত্তর চীনের

লোকসমাজের জীবনযাত্রা হইতে আমরা এই প্রাকৃতিক অঞ্চলের একটা সাধারণ ধারণা লাভ করিতে পারি।

উত্তর চীনের বৃহত্তম নদী হোয়াং হো। পৃথিবীর দশটি বৃহত্তম নদীর ইহা অন্যতম। ইহার আর এক নাম পীত নদী। প্রায় চার হাজার বছর আগে হোয়াং হো নদীর তীরে চীনের মানুষ প্রথম সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। চীনের 'বিজ্ঞ ব্যক্তি' কনফিউসিয়াস এই অঞ্চলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হোয়াং হো নদীর কোলেই উত্তর চীনের লোকসমাজ বাস করে। চার হাজার বছর আগে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা এখানে ঘর বাঁধিয়াছিলেন, মাটি চাষ করিয়া ফসল ফলাইয়াছিলেন। কৃষিকার্যে চার হাজার বছরের একটানা অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এই সুপ্রাচীন লোকসমাজের।

চীন যেন দুইটি দেশ—উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীন। উভয় অংশের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট চোখে ধরা পড়ে। ত্রয়োদশ শতকে ভেনিসের পর্যটক মার্কো পোলো ইহা লক্ষ্য করিয়া দুই অংশের দুইটি নাম দিয়াছিলেন—ক্যাথে (উত্তর চীন) এবং মঞ্জি (দক্ষিণ চীন)। দক্ষিণ চীন শস্য-শ্যামল, উত্তর চীন রুক্ষ বাদামী দেশ। বসন্তে দক্ষিণ চীনের মাঠ সবুজ শস্যে ভরিয়া উঠে, উত্তর চীনের মাঠ তখন খাঁ খাঁ করে, মাঝে মাঝে বালুর ঝড় উঠে। বসন্তে দক্ষিণ চীন উষ্ণ, উত্তর চীনে তখনও শীত। দক্ষিণ চীনে বারো মাস চাষ হয়, উত্তর চীনে বছরে মাত্র তিন-চার মাস কৃষিকার্য চলে।

জমি রুক্ষ হইলে কি হয়, উত্তর চীনে জনসংখ্যা বিপুল। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি চীনের এক প্রধান সমস্যা। এত ঘন লোকবসতি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই। অথচ চাষের জমি সেই অনুপাতে খুবই কম। এই সুবিশাল দেশের মাত্র এক-দশমাংশ জমিতে চাষ হয়। জল ছাড়া চাষ হয় না, কিন্তু উত্তর চীনে বছরে গড়ে মাত্র ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

অনাবৃষ্টির জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটে। ১৮৭৬ সনের দুর্ভিক্ষের কথা পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। পর-পর তিন বৎসর এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। মাঠের পর মাঠ ফাটিয়া চৌচির। তিন বৎসরব্যাপী এই দুর্ভিক্ষে প্রায় এক কোটি মানুষ মারা যায়। ১৯২০-২১ সনে আবার দুর্ভিক্ষ ঘটে। এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। অনাবৃষ্টির আবার অপর পিঠ বন্যা। খরস্রোতা হোয়াং হো নদীতে মাঝে মাঝে প্রবল বন্যা হয়। মাঠের পর মাঠ জলে ডুবিয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের দামোদরের মত হোয়াং হো উত্তর চীনের 'দুঃখ নদী'।

প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী উত্তর চীনের লোকসমাজকে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। জমি কম, লোক বেশী—এই অবস্থায় স্বভাবতই তাহাদের জমিতে সর্বাধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হয়। বাধ্য হইয়া তাহারা নিবিড় ও গভীর চাষ প্রণালীর (Intensive cultivation) আশ্রয় লয়াছে। এক ইঞ্চি জমি তাহারা ফেলিয়া রাখে না। বাঁধগুলি সরু সরু, কোনমতে একজন লোক চলিতে পারে। বড় বাঁধে বেশী জমি নষ্ট, তাই এই ব্যবস্থা। রাস্তার ধারে ধারে পর্যন্ত চাষ হয়। যেখানেই সম্ভব, সেখানেই তাহারা চাষ করে। চাষের কাজে বলদ, খচ্চর ও গাধা ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের চাষীদের মত হাত দিয়া তাহারা ফসল কাটে।

চাষের জন্য সার লাগে। সার সংগ্রহের এক অভিনব পদ্ধতি এখানে প্রচলিত। মানুষের মল তাহারা সাররূপে ব্যবহার করে। বড় বড় মাঠে মল সযত্নে সংগৃহীত হয়। সহরে প্রতিদিন সকালে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া তাহারা মল সংগ্রহ করে, তারপর এই মল লইয়া ঘোড়ার গাড়ি বা নৌকার মিছিল চলে গ্রামের দিকে। এই মল শুকাইয়া তাহারা সার তৈরী করে। বলা বাহুল্য, এই সার দামেও সস্তা।

এই ভাবেই উত্তর চীনের লোকসমাজ খাদ্য উৎপাদন করে। এই অঞ্চলের প্রধান ফসল গম। গম ছাড়া জওয়ার, বার্লি, সয়াবীন ও মিষ্টি আলু উৎপন্ন হয়। ধানী জমি সবই দক্ষিণ চীনে। তাহাদের প্রধান খাদ্য গম, সয়াবীন ও সবজি। বাহির হইতে তাহারা চা, তেল ও লবণ আমদানি করে। দক্ষিণ চীনের পার্বত্য অংশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। চা-পান চীনাদের প্রাত্যহিক অভ্যাস। চীনাদের চায়ে কিন্তু দুধ বা চিনি থাকে না।

চীন রেশমের দেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চীনা রেশম রপ্তানি হয়। বাড়ি বাড়ি তুঁত গাছ। তুঁত গাছে গুটিপোকার চাষ হয়। উত্তর চীনেও রেশমের চাষ হয়। স্থানীয় লোকসমাজের ইহা অন্যতম জীবিকা। সাধারণত মেয়েরা গুটিপোকার চাষ করে। উত্তর চীনের কোন কোন অংশে তূলারও চাষ হয়।

উত্তর চীনের লোকসমাজ প্রধানত কৃষিজীবী। শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। মাটির ঘরে তাহাদের বাস। বাঁশের উপর মাটির আস্তরণ দিয়া তাহারা বেড়া তৈরী করে—যেমন আমাদের চাষীরাও করে। ঘরের ছাদ হয় মাটির কিংবা খড়ের।

বিপ্লবের পরে

১৯৫০ সনের বিপ্লবের পরে চীনের জীবনে এক নূতন অধ্যায় স্বরু হইয়াছে। নয়া চীনের কমিউনিস্ট সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নব নব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর চীনেও এই সব পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

নয়া চীনের সরকার দেশের সমস্ত জমি গরীব কৃষকদের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। কৃষকই এখন জমির প্রকৃত মালিক—জমিদার নয়। খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সমবায়-প্রথা ব্যাপকভাবে চালু হইয়াছে, সমবায় কৃষি-খামার গঠিত হইয়াছে। সমবায় কৃষি-

খামারের জমিজমার মালিক কৃষকরাই, তবে চাষ হয় যৌথ ভাবে। পূর্বের মত টুকরা টুকরা জমিতে এক একটি কৃষক পরিবার পৃথকভাবে চাষ করে না। সমবায় খামারগুলিকে সরকার ভালো সার ও কৃষিঋণ দিয়া সাহায্য করেন। কোন কোন খামারে ইতিমধ্যে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ হইতেছে। অনেক বেশী জমিতে খুব অল্প সময়ে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ সম্ভব। সোভিয়েট রাশিয়া হইতে উত্তর চীন ট্রাক্টর আনাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম চীনেব প্রায় এক কোটি একর পতিত জমি উদ্ধারের এক পরিকল্পনাও নয়া চীন সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

শুধু কৃষি নয়, শিল্পের উন্নতির দিকেও নয়া চীনের সরকার দৃষ্টি দিয়াছেন। নয়া চীনের রাজধানী পিকিং উত্তর চীনেই অবস্থিত। গত কয়েক বৎসরে পিকিং নগরীর চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে। ইহা একটি আধুনিক শিল্প-নগরীতে পরিণত হইতেছে। লোহা-লক্করের কারখানা, কাপড়ের কল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কেন্দ্র পিকিং নগরীকে নূতন রূপ দিয়াছে। নূতন নূতন রেললাইন পাতিয়া, নগরে নগরে বিমানঘাঁটি স্থাপন করিয়া পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হইয়াছে। উত্তর চীনের লোকসমাজের সামনে আজ এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। চার হাজার বছর ধরিয়া প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আজ উত্তর চীনের লোকসমাজ প্রফুল্লচিত্তে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইতেছে।

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কি করিয়া এক উন্নত জীবন গড়িয়া তোলা যায়, তাহারই প্রমাণ দিতেছে উত্তর চীনের প্রাচীন লোকসমাজ।

শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল : হল্যাণ্ড

বরফের দেশের মত প্রচণ্ড শীত নয় বা মরুভূমির দেশের মত প্রচণ্ড গরম নয়, এইরূপ একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের কথা শোন। ইহাকে

শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বলে। শীতকালে এই অঞ্চলে কখনও কখনও তুষারপাত হয়। কিন্তু সমুদ্রের উষ্ণ হাওয়া বহিবার ফলে শীত খুব তীব্র হয় না। গ্রীষ্মকালেও গরম বেশী হয় না, আবহাওয়া মনোরম থাকে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, উত্তর-পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ুর দেশে লোকসমাজ সাধারণত কর্মঠ হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের এইরূপ একটি দেশ হল্যাণ্ড। যে বিপুল অধ্যবসায় এবং কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে হল্যাণ্ডের লোকসমাজ এক উন্নত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

হল্যাণ্ডের লোকসমাজ

হল্যাণ্ড নিম্নভূমির দেশ, ইহার বহু অংশ সমুদ্রের বুক হইতে নীচে অবস্থিত। সমুদ্রের জলধারা স্বভাবতই এই দেশকে প্লাবিত করে। অনেক বছর আগে হল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় ছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া হল্যাণ্ডের লোকসমাজ দুরন্ত সাগরের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। আজ তাহারা বিজয়ী, সাগর তাহাদের বশীভূত হইয়াছে। হল্যাণ্ডের লোকসমাজ একটি প্রবাদবাক্য রচনা করিয়াছে—ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন সাগর, আর আমরা সৃষ্টি করিয়াছি তীর। আধুনিক হল্যাণ্ড সত্যই উহার লোকসমাজেরই সৃষ্টি।

সাগরের জলধারা যাহাতে দেশকে প্লাবিত করিতে না পারে তাহার জন্য লোকসমাজ উঁচু উঁচু অসংখ্য বাঁধ নির্মাণ করিয়াছে। বালি এবং মাটিতে বাঁধগুলি তৈরী। উঁচু বাঁধের একদিকে সাগর, অন্যদিকে নিম্নভূমি। বাঁধের উপর হইতে নিম্নভূমিতে নগরী, বাজার, রাস্তা, শস্যক্ষেত্র, গো-চারণভূমি চোখে পড়ে। বাঁধগুলির উপর সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা। কোথাও সারি সারি গাছ। শুধু সাগরের পারেই নয়,

নদীগুলির পারেও বহু বাঁধ,—কেননা নদীবক্ষ হইতেও নিম্নভূমি নীচে অবস্থিত। হল্যাণ্ড তাই 'বাঁধের দেশ' নামে অভিহিত।



উইণ্ডমিল (ছেলেটির পায়ে কাঠের জুতা)

সাগর বা নদীগুলি যাহাতে হঠাৎ দেশ প্লাবিত করিতে না পারে,

তাহার জন্য বাঁধের ধারে ধারে নির্মিত হইয়াছে 'উইণ্ড' মিল'। উইণ্ড মিলের সাহায্যে জল পাম্প করিয়া খালে নিষ্কাশিত করা যায়। উইণ্ড মিল বাতাসে চলে। সম্প্রতি বৈদ্যুতিক পাম্প উইণ্ড মিলের স্থান গ্রহণ করিতেছে। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা এই পাম্পগুলি চলে। লোক-সমাজ ছোট ছোট অসংখ্য খাল কাটিয়াছে। নগরী ও গ্রামের মধ্য দিয়া এই খালগুলি প্রবাহিত হইতেছে। জল নিষ্কাশনের এবং যাতায়াতের জন্য এই খালগুলি ব্যবহৃত হয়। খালের পারে পারে মনোহর বৃক্ষের সারি।

হল্যাণ্ডের বহু অঞ্চলকে 'পোল্ডার্স' (polders) বলা হয়। লোকসমাজ দীর্ঘকালের বদ্ধ জলাশয় হইতে উইণ্ড মিলের সাহায্যে জল নিষ্কাশন করিয়া যে জমিগুলি উদ্ধার করিয়াছে, উহাদেরই নাম 'পোল্ডার্স'। প্রাচীনকালে হয়তো এই সুবৃহৎ জলাশয়ে নৌ-যুদ্ধ হইত। আজ সেখানে চাষীরা জমি চাষ করিয়া নানা ফসল ফলায়।

জুইডার জি

জুইডার জি (Zuyder Zee) নদীকেও এইরূপ কয়েকটি 'পোল্ডার্সে' পরিণত করিবার কাজ অগ্রসর হইতেছে। জুইডার জি একটি সমুদ্রের অগভীর খাঁড়ি। এই খাঁড়ির জল লবণাক্ত। লোক-সমাজ খাঁড়িতে মাছ ধরিত। ১৯৩২ সনে উত্তর সাগর হইতে ফ্রিজল্যাণ্ড পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। উত্তর সাগরের জল এখন জুইডার জি-তে প্রবেশ করিতে পারে না। জুইডার জি-র কিছু অংশ হইতে জল পাম্প করিয়া খালে নিষ্কাশিত করিয়া চারিটি পোল্ডার্স সৃষ্টি হইবে, উহার একটি অংশ সুস্বাদু জলের হ্রদে পরিণত হইবে। ইতিমধ্যে দুইটি পোল্ডার্সে চাষবাস সুরু হইয়াছে। সমস্ত পরিকল্পনাটির কাজ শেষ হইলে প্রায় ৫,৫০,০০০ একর জমি আবাদযোগ্য হইবে।

জুইডার জি-র পারেই হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টার্ডাম অবস্থিত।

আমস্টার্ডাম একটি আধুনিক সহর। ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করিতেছে এই নগরী।

জুইডার জি-র আশেপাশে বাঁধগুলির নীচে ছোট ছোট নগরী ও শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কঠিন পরিশ্রম করিয়া লোকসমাজ জমিতে চাষ করে। তাহারা উৎপন্ন করে গম, রাই, ওট, বীট আলু এবং সবজি। দুধ হইতে পনীর তৈরী লোকসমাজের অন্যতম প্রধান জীবিকা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গরুর পাল। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গো-চারণ ভূমি। গরুর দুধ তাহারা বেচে এবং দুধ হইতে পনীর ও মাখন বানায়। ওলন্দাজ পনীর সুবিখ্যাত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহা রপ্তানি হয়। জুইডাব জি-র নিকটে আইকমার (Aikmar) বাজারে প্রতি শুক্রবার পনীর কেনাবেচা হয়। ফুটবলের মত বড় বড় পনীরের দলা বাজারে স্তূপীকৃত থাকে। সহর হইতে ব্যবসায়ীরা আসেন। আইকমারই হল্যাণ্ডের বৃহত্তম পনীরের বাজার।

জুইডার জি-র লোকসমাজ চামড়ার জুতা ব্যবহার করে না, জলের দেশে চলাফেরার সুবিধার জন্য তাহাদের পায়ে থাকে কাঠের জুতা। ঘরে ঢুকিবার সময় কাঠের জুতাজোড়া বাহিরে থাকে, শুধু মোজা পরিয়া তাহারা ঘরে ঢোকে। ইহা তাহাদের একটি সামাজিক রীতি। এই দেশে দ্বিচক্রযান বা বাইসাইকেল খুব চালু। ছাত্র, মজুর, চাষী, কর্মচারী সকলেই সাইকেলে চলাফেরা করে। অফিস-ছুটির পরে রাস্তা দিয়া সাইকেলের মিছিল চলে। দুধ ও পনীর বাড়ি বাড়ি বিক্রী করিবার জন্য তাহারা হাল্‌কা গাড়ি ব্যবহার করে। কুকুর এই গাড়ি টানে।

সমুদ্রের কোলে বাস করিবার ফলে হল্যাণ্ডের লোকসমাজ দীর্ঘকাল হইতেই মৎস্য-ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। প্রধানত উত্তর সাগরে তাহারা মাছ ধরে। মাছ তাহাদের অন্যতম রপ্তানী দ্রব্য।

মানুষ যে শুধু প্রকৃতির দাসই নয়, প্রভুও হইতে পারে, হল্যাণ্ডের লোকসমাজ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিতে করিতে তাহারা এক সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

উপসংহার

অরণ্যভূমি, তৃণভূমি, মরুভূমি, বরফভূমি, মৌসুমী জলবায়ুর অঞ্চল শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল প্রভৃতি পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক অঞ্চলে যে বিভিন্ন লোকসমাজ বাস করে, উহাদের জীবনযাত্রার আলোচনা হইতে আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি। সমাজজীবনের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন লোকসমাজের জীবন গড়িয়া উঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত লোকসমাজ আশ্চর্যরূপে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয়। গভীর অরণ্যে যেখানে চাষবাস সম্ভব নয়, সেখানে লোকসমাজ প্রধানত শিকার করাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। তৃণভূমিতে চাষবাস সম্ভব নয়, কিন্তু গো-চারণ বা মেষ-চারণ সম্ভব বলিয়া লোকসমাজ উহাই পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। বালুময় মরুভূমিতে চাষবাস বা পশুপালন— ইহার কোনটাই সম্ভব নয় বলিয়া লোকসমাজ বণিকবৃত্তি গ্রহণ করে। বরফের দেশে লোকসমাজ প্রধানত শিকার করিয়াই জীবনধারণ করে। আবার পরিমিত বৃষ্টিপাতের দরুন কৃষিকার্য সম্ভব হইলে লোকসমাজ উহাকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে পশুচারণ বা কৃষিকার্য কিছুই সম্ভব নয়, কিন্তু সেখানে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাইলে লোকসমাজ খনি-শিল্প গড়িয়া তোলে। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলের লোকসমাজ মৎস্য-ব্যবসা এবং বাণিজ্যে দক্ষতা লাভ করে।

অনেক সময় মৎস্যব্যবসা তাহারা অন্যতম জীবিকা হিসাবেও অবলম্বন করে। যে অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, উহার লোকসমাজ বিভিন্ন রকম শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসারে বিভিন্ন লোকসমাজ উহাদের জীবন গড়িয়া তোলে। সেমাঙ্গ, পিগ্‌মী, প্রেইরীর গো-পালক, পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর চীনের লোকসমাজ, জুইডার জি-র লোকসমাজ—ইহাদের জীবন-যাত্রা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজের মৌলিক প্রয়োজন একরকম—খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান নিজ নিজ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে প্রত্যেকটি লোকসমাজ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করে। মালয়ের গভীর অরণ্যে সেমাঙ্গরা-ও বাঁশের ঘর বাঁধে, ডুরিয়ান বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করে এবং গাছের ছাল হইতে পরিচ্ছদ সংগ্রহ করে। বরফের দেশে গাছপালা নাই, এস্কিমোরা তাই বরফ দিয়াই ঘর তৈরী করে, সীলের মাংস হইতে খাদ্য এবং চামড়া হইতে পোশাকের ব্যবস্থা করে। মরু-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেও বেদুইন আরবরা কি ভাবে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের সংস্থান করে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উন্নত লোকসমাজগুলি কৃষিকার্য হইতে খাদ্য এবং কলকারখানা হইতে বস্ত্র এবং বাসগৃহের উপকরণ সংগ্রহ করে।

তৃতীয়ত, লোকসমাজগুলির মৌলিক প্রয়োজন একরকম হইলেও উহা পূরণ করিবার পন্থা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় লোকসমাজগুলির জীবনধারণের পন্থাও বিভিন্ন হইয়াছে। প্রেইরীর রেড্‌ ইণ্ডিয়ান, মরুভূমির বেদুইন আরব, বরফের দেশের এস্কিমো, জুইডার জি-র লোকসমাজ প্রভৃতির জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য আছে। আবার একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে বাস করিলেও লোকসমাজের জীবনযাত্রা সব সময় একই রকম হয় না। বেদুইন

আরব, মিশরের ফেলাহীন, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার লোকসমাজ—ইহারা সকলেই মরুভূমির দেশে বাস করিলেও ইহাদের জীবনযাত্রায় কত তফাৎ! সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, যাহারা কৃষিকার্য শিখিতে পারিয়াছে তাহাদের জীবনযাত্রা অধিকতর উন্নত হয়। কৃষিকার্যের সহিত শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে, লোকসমাজ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

চতুর্থত, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে লোকসমাজের পক্ষে উন্নত জীবন গড়িয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। যে দেশ আয়তনে বৃহৎ, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, যেখানে জমি উর্বরা এবং বৃষ্টির জলধারা বহন করিবার মত প্রচুর নদ-নদী আছে, উহার লোকসমাজ কৃষি ও শিল্পে সহজেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ প্রতিকূল হইলে লোকসমাজের উন্নতি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। এই কারণে বেদুইন আরব, এস্কিমো, প্রেইরীর রেড্ ইণ্ডিয়ান, কঙ্গো অববাহিকার পিগ্‌মী প্রভৃতি লোকসমাজের পক্ষে উন্নত জীবন গড়িয়া তোলা খুবই কঠিন কাজ।

পঞ্চমত, লোকসমাজ সর্বক্ষেত্রেই প্রকৃতির দাস হয় না, প্রকৃতির উপর সে প্রভুত্বও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ আজ বিপুল শক্তির অধিকারী। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলে আয়ত্ত করিয়া মানুষ আজ প্রতিকূল প্রকৃতির বহু বাধা জয় করিতে সক্ষম। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। উন্নত কলাকৌশল আয়ত্ত করিয়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার লোকসমাজ মরুভূমি অঞ্চলে আধুনিক খনি-সহর গড়িয়া তুলিয়াছে, জুইডার জি-র জলাভূমিতে নগরী, রাস্তাঘাট এবং দোকানপাট স্থাপিত হইয়াছে, এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষবাস চলিতেছে। নয়া চীনের সরকার উত্তর চীনে আধুনিক কৃষি-

পদ্ধতি চালু করিয়া ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করিবার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের 'দুঃখ নদী' দামোদর আজ আর প্রকৃতির অভিশাপ নয়, উহার জলধারা আজ মাটিকে জলসিঞ্চিত করে; দামোদর বাঁধের জলাধারে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলো যোগায়।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন লোকসমাজগুলি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান—এই তিনটি মৌলিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রকৃতির বাধা জয় করিয়া তাহারা নিজ নিজ জীবনকে অধিকতর উন্নত ও আনন্দময় করিতে চায়। সকলের মূল লক্ষ্য একই—জীবনকে আরও উপভোগ্য এবং আরও আনন্দময় করিয়া তোলা। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় স্বভাবতই তাহাদের জীবনযাত্রা বিভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। একটা অদৃশ্য বন্ধন যেন পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজ যেন একই সুবিশাল মানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ—পরিবহণ-ব্যবস্থার বিপুল উন্নতির ফলে পৃথিবীর লোকসমাজগুলি পরস্পরের সহিত সহজেই সংযোগ স্থাপন করিতে পারে। অন্যান্য প্রাকৃতিক অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করিয়া নিজেদের চাহিদা পূরণ করা আজ সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দিন দিন অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিলে এবং বিভিন্ন লোকসমাজ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইলে এই পৃথিবী সকলের জন্য আরও সুন্দর, আরও আনন্দময় হইয়া উঠিবে এবং পৃথিবীর সমগ্র মানব পরিবার একটি সুখী পরিবারে পরিণত হইবে।

অনুশীলনী

১। মালয়ের সেমাঙ্গরা যাযাবর কেন? তাহাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান নাই কেন?

২। সেমাঙ্গদের শিকারের প্রধান হাতিয়ার কি কি? কেন তাহারা এই সকল হাতিয়ার ব্যবহার করে?

৩। সেমাঙ্গ এবং পিগ্‌মীদের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৪। "প্রেইরী" কাহাকে বলে? "প্রেইরীতে" গো-খামার গড়িয়া উঠিবার কারণ কি?

৫। "পাম্পাস" কাহাকে বলে? পাম্পাসের লোকসমাজ কি করিয়া এক উন্নত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে?

৬। আরবগণ যাযাবর কেন? ইহাদের জীবিকা কি?

৭। মরূদ্যানে জনপদ গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? মরূদ্যানে ঘরের উপর খোলা ছাদ থাকে কেন?

৮। মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয় কেন? "ফেলাহীন"রা কিভাবে চাষবাস করে?

৯। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে কিভাবে আধুনিক খনি-সহর গড়িয়া উঠিয়াছে?

১০। কুকুর, সীল এবং বরফ—এস্কিমোদের জীবনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তা কি?

১১। উত্তর চীনের লোকসমাজ কিভাবে চাষবাস করে? তাহারা কিভাবে চাষের জন্য সার সংগ্রহ করে?

১২। জুইডার জি-তে কিভাবে এক উন্নত সমাজজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে?

১৩। একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে বাস করা সত্ত্বেও লোকসমাজের জীবনযাত্রা বিভিন্ন হয় কেন?

১৪। নদী, সমুদ্র, অরণ্য, খনিজ সম্পদ—বিভিন্ন লোকসমাজের জীবনে এইগুলির প্রভাব বর্ণনা কর।

১৫। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের লোকসমাজগুলির জীবনযাত্রায় মৌলিক ঐক্য কোথায়? দৃষ্টান্তদ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ

(ক) মালয়ের জঙ্গলে —— নামে আদিম অধিবাসীর বাস।

(খ) সেমাঙ্গরা —— খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

(গ) সেমাঙ্গদের শিকারের হাতিয়ার ——।

(ঘ) কঙ্গো অববাহিকায় —— নামে মানুষ বাস করে।

(ঙ) আমাজন অববাহিকার লোকসমাজের জীবিকা ——।

(চ) উত্তর আমেরিকার তৃণভূমি —— নামে অভিহিত।

(ছ) রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবিকা ——।

(জ) আর্জেন্টিনার তৃণভূমি—— নামে অভিহিত।

(ঝ) বেদুইন আরবদের —— জীবিকা।

(ঞ) মিশরের চাষী —— নামে অভিহিত।

(ট) অস্ট্রেলিয়ার —— খনি-শহর অবস্থিত।

(ঠ) এস্কিমোরা —— বাস করে।

(ড) —— এস্কিমোদের হাতিয়ার

(ঢ) যাতায়াতের জন্য এস্কিমোরা—— গাড়ি ব্যবহার করে।

(ণ) ল্যাপরা —— পোষে।

(ত) উত্তর চীনের লোকসমাজ —— সাররূপে ব্যবহার করে।

(থ) উত্তর চীনের প্রধান ফসল —— ।

(দ) হল্যাণ্ডে জল নিষ্কাশিত করিবার জন্য লোকসমাজ —— নির্মাণ করে।

(ধ) হল্যাণ্ডে জলাশয় হইতে যে অঞ্চল উদ্ধার করা হইয়াছে উহা —— নামে অভিহিত।

(ন) জুইডার-জির লোকসমাজ ——জুতা ব্যবহার করে।

(প) হল্যাণ্ডের লোকসমাজ —— যাতায়াত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃতিক অঞ্চল	অন্তর্গত দেশ	প্রাকৃতিক সম্পদ	লোকসমাজ
১। নিরক্ষীয় অঞ্চল	পূঃ ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ, মালয়, নিউ-গিনি, কঙ্গো অব-বাহিকা, আমাজন অববাহিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	চিরহরিৎ বৃক্ষ, রবার	অনুন্নত, ফলমূল আহরণকারী, শিকারী, কৃষি-জীবী।
২। নাতি-শীতোষ্ণ তৃণভূমি	উত্তর আমেরিকার 'প্রেইরী', আর্জে-ন্টিনার 'পাম্পাস', এশিয়া ও ইউ-রোপের 'স্তেপ' ইত্যাদি	প্রচুর তৃণ	পশুপালক, কৃষি-জীবী।
৩। উষ্ণ তৃণ-ভূমি	আফ্রিকার সুদান, আমাজন অব-বাহিকার উত্তরাংশ, উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া	দীর্ঘ তৃণ	পশুপালক ও শিকারী।
৪। উষ্ণ মরু-ভূমি	আফ্রিকার সাহারা, আরবের মরুভূমি, ভারতবর্ষের থর-মরুভূমি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু-ভূমি, আফ্রিকার কালা-হারি মরু-ভূমি প্রভৃতি।	শুষ্ক তৃণ, কাঁটা ঝোঁপ, খেজুর গাছ, কার্পাস, ধান	যাযাবর, বণিক, কৃষিজীবী, খনি-শ্রমিক।

প্রাকৃতিক অঞ্চল	অন্তর্গত দেশ	প্রাকৃতিক সম্পদ	লোকসমাজ
৫। তুন্দ্রা অঞ্চল	উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড, উত্তর আলাস্কা, আণ্টার্টিকা, উত্তর সাইবেরিয়া	সীল, ওয়ালরাস, বল্গা-হরিণ	যাযাবর, শিকারী, পশুপালক।
৬। মৌসুমী জলবায়ুর অঞ্চল	ভারত, পূর্ব পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, শ্যাম, দক্ষিণ চীন	শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষ; নারিকেল, তাল, কলা, আম, আনারস গাছ; ধান, পাট, চা, ইক্ষু, তামাক; কয়লা, লোহ	কৃষিজীবী, খনি-শ্রমিক।
।। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল	স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, দক্ষিণ ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, বলকান উপদ্বীপ, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইত্যাদি	গম, যব, আঙ্গুর, আপেল, কমলালেবু, জলপাই	কৃষিজীবী, শিল্পাশ্রয়ী।
। শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, পঃ কানাডা ইত্যাদি।	গম, যব, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি খনিজ সম্পদ; মৎস্য	শিল্পাশ্রয়ী, কৃষিজীবী।

প্রাকৃতিক অঞ্চল	অন্তর্গত দেশ	প্রাকৃতিক সম্পদ	লোকসমাজ
৯। উপক্রান্তীয় মৌসুমী বা চৈনিক জলবায়ু	উত্তর ও মধ্য চীন, জাপানের দক্ষিণ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ ইত্যাদি	ফার্ন, ওক, বাঁশ, গম, ধান, কার্পাস	কৃষিজীবী।
১০। লরেন্সীয় জলবায়ু	কানাডার পূর্বাংশ, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ, উত্তর জাপান	বৃক্ষ সম্পদ	শিকারী ও কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী
১১। 'তৈগা' অঞ্চল	কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড, উত্তর রাশিয়া	পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষ	পশুপালক এবং কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী।

আমাদের সমাজজীবন

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ; ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ

হাজার হাজার বৎসর আগে এবং বর্তমান যুগে এই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে মানুষ যে সমাজজীবন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আলোচনাই ইতিহাসের মূল লক্ষ্য। রাজরাজড়াদের যুদ্ধ ও দেশজয়ের কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়ি, কিন্তু শুধু ইহাই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় নয়। রাজরাজড়ারা ছাড়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যে মানুষ বাস করিত, তাহাদের জীবনের ধারাও ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন যুগেও মানুষ সমাজে বাস করিত, ঘরবাড়ী, প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণ করিত, বাণিজ্য করিত, সংস্কৃতির চর্চা করিত। কি ভাবে তাহারা বাস করিত, তাহাদের ঘরবাড়ী, প্রাসাদ-দুর্গ সাজপোশাক কেমন ছিল, তাহারা কোথায় কোথায় কি কি এবং কেন বাণিজ্য করিত, কি করিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অক্ষরমালা ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গড়িয়া উঠিল, তাহাও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সাধারণ ভাবে বলা যায়,—মানুষের সামগ্রিক সমাজজীবনের আলোচনাই ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। ইতিহাসের ভিত্তি ঘটনা, কল্পনা নয়। গল্পে ও উপকথায় আমরা মানুষের জীবনের নানা কাহিনী পড়ি, উহা লেখকদের কল্পনার উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত।

আর ইতিহাসে আমরা যাহা পড়ি উহা সত্য ঘটনা। রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাচীন যুগের মানুষের জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি, কিন্তু রামচন্দ্র নামে সত্যই কেহ ছিলেন কি না, হনুমান সত্যই লঙ্কা দাহ করিয়াছিলেন কি না, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান ছিলেন কি না ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন প্রমাণ নাই। তাই রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী গল্প, ইতিহাস নয়। "ইতিহাসের জনক" বলিয়া অভিহিত হেরোডোটাস পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার বর্ণনা তাঁহার বইতে দিয়াছেন। তাঁহার বইখানি ইতিহাস, কেননা তিনি যে যুদ্ধের বিবরণ দিয়াছেন উহা ঘটনা, কল্পনা নয়। তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? কি করিয়া আমরা ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিতে পারি? ইতিহাসের ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার একটি পদ্ধতি আছে, তাহা আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

মানুষ এবং পরিবেশ

আমরা বলিয়াছি যে, মানুষের সমাজজীবনের ধারা ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সমাজজীবন কি একই রকম? না, তাহা নয়। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সমাজজীবন। কোন জাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত, কোন জাতি পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় মানুষের সমাজজীবনও বিভিন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে। অবশ্য মানুষ পুরাপুরি প্রাকৃতিক পরিবেশের দাস নয়। বিজ্ঞানের বিপুল শক্তি আহরণ

ও ব্যবহার করিয়া মানুষ যুগে যুগে প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে প্রতিকূল প্রকৃতির বহু বাধা জয় করিতে সক্ষম। পশ্চিমবঙ্গের "দুঃখ নদী" দামোদর আজ আর প্রকৃতির অভিশাপ নয়, উহার জলধারা আজ দেশের মাটিকে জলসিঞ্চিত করে, দামোদর জলাধারে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলো যোগায়। 'আমাদের সমাজজীবন—প্রথম খণ্ডে' তোমরা এই সকল বিষয় পড়িয়াছ।

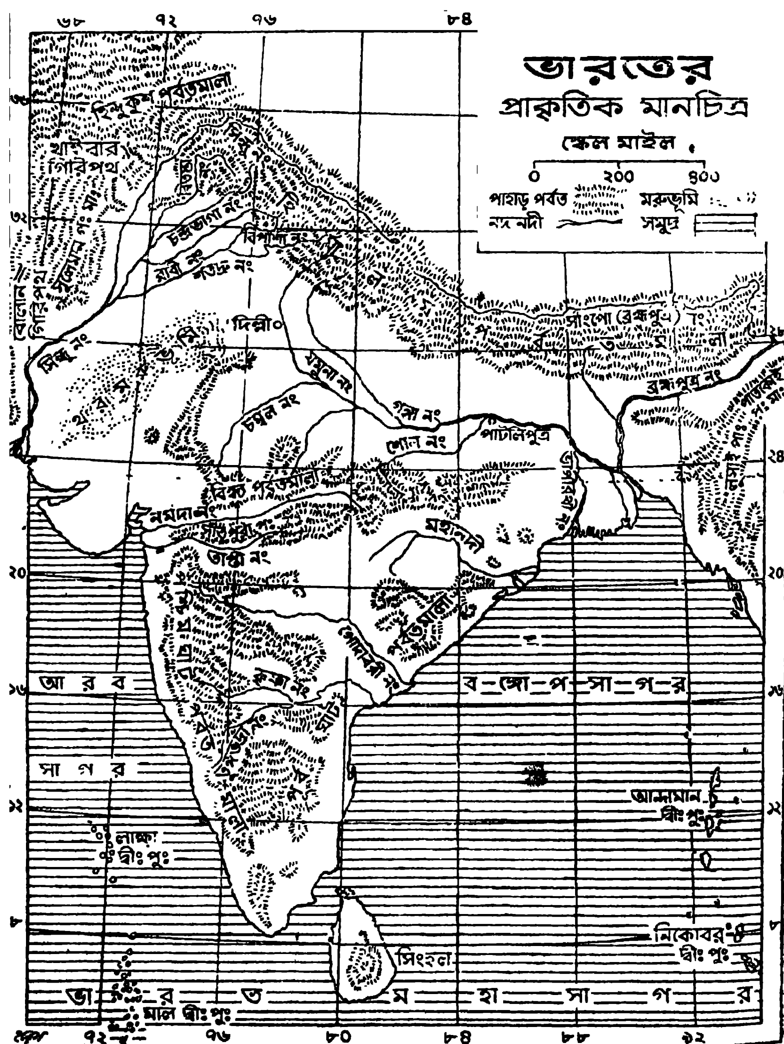
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাকৃতিক্ষ পরিবেশ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? ভারতের মানুষের জীবন কিভাবে উহার প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী গড়িয়া উঠিয়াছে? ভারতবর্ষের ইতিহাসের আলোচনায় প্রথমেই এই বিষয়টি বুঝিতে হইবে।

কন্যাকুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। ইহার শিয়রে উত্তুঙ্গ পাহাড়, পায়ের নীচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র। ইহা একটি বিশাল উপদ্বীপ।

ভারতবর্ষ তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত; যথা—(১) উত্তরের পার্বত্য বিভাগ; (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি এবং (৩) মহাভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি।

ভারতের উত্তরে হিমালয়ের কোলে পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যে ঘেরা একটি অঞ্চল রহিয়াছে। এই অঞ্চলেই কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি অবস্থিত। হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই অঞ্চলেই আছে সিন্ধুনদের উপত্যকা, সিন্ধু ও রাজপুতনার মরুভূমি এবং গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত উর্বর অঞ্চল। গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের


ভারতের
প্রাকৃতিক মানচিত্র
স্কেল মাইল
০ ২০০ ৪০০
পাহাড় পর্বত
মরুভূমি
নদ নদী
সমুদ্র
হিন্দুকুশ পর্বতমালা
খাইবার গিরিপথ
চন্দ্রভাগা নং
বিপাশা নং
রাবি নং
শতদ্রু নং
দিল্লী
সিন্ধু নং
যমুনা নং
গঙ্গা নং
চম্বল নং
শোন নং
পাটালিপুত্র
সাংপো (ব্রহ্মপুত্র) নং
ব্রহ্মপুত্র নং
বিন্ধ্য পর্বতমালা
নর্মদা নং
সাতপুরা পঃ
তাপ্তী নং
মহানদী
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
আন্দামান দ্বীঃ পুঃ
লাক্ষা দ্বীঃ পুঃ
নিকোবর দ্বীঃ পুঃ
সিংহল
ভারত মহাসাগর
মাল দ্বীঃ পুঃ
৬৮ ৭২ ৭৬ ৮০ ৮৪ ৮৮ ৯২
৩২ ২৮ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮

মালভূমি। ইহার একটি অংশ বিন্ধ্য পর্বত এবং পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর দ্বারা দেশের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। এই অংশই ক্রমশঃ সরু হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত গিয়াছে। ইহারই মধ্যে অবস্থিত গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী-বিধৌত উর্বর মালভূমি।

প্রাকৃতিক বিভাগের গুরুত্ব

উপরে বর্ণিত এই প্রাকৃতিক বিভাগের গুরুত্ব কি? ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর, ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে ইহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে?

প্রথমতঃ, প্রকৃতি এই বিশাল দেশটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছে। বিন্ধ্যপর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া একটি অখণ্ড রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই। একটি দেশে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ একটি দেশ হইলেও উহার বিভিন্ন অংশে গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন ছোট-বড় রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে আবার অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে। ফলে দীর্ঘকাল এই দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মৌর্য, গুপ্ত ও মোগল যুগে রাজনৈতিক ঐক্য কিছুটা স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই ঐক্য স্থায়ী হয় নাই। আবার এই রাজনৈতিক ঐক্য প্রধানতঃ উত্তর ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দক্ষিণ ভারতে উহা প্রসারিত হয় নাই এবং স্থায়ী হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্র এবং পর্বত এই দেশকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছে। ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, এক কথায় ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বহির্জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে নাই। উত্তরের গিরিপথ

দিয়া এবং সমুদ্রপথে বহু বিদেশী জাতি বার বার এদেশে আসিয়াছে। কেহ আসিয়াছে পরিব্রাজক এবং বণিকের বেশে, আবার কেহ আসিয়াছে আক্রমণকারী এবং লুণ্ঠনকারী হিসাবে। ইহাদের কার্যকলাপ ভারত-বর্ষের ইতিহাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষের মাটি উর্বরা এবং শস্যশ্যামলা। প্রকৃতি অনুকূল হইবার ফলে প্রাচীন যুগেই ভারতের মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞার চর্চায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছে, জীবনধারণের চিন্তায় তাহাদের নিমগ্ন থাকিতে হয় নাই।

ভারতের বৈচিত্র্য

ভারতবর্ষে নানা জাতি এবং নানা ভাষাভাষী লোকের বাস। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে; যথা,—বাঙ্গালী, বিহারী, ওড়িয়া, আহোম, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, কাশ্মীরী ইত্যাদি। ইহারা এক অর্থে ভারতীয়, কিন্তু ইহাদের সাজপোশাক, রীতিনীতি এবং ভাষা পৃথক। বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ঘটিয়াছে—বাঙ্গালা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, গুজরাটী, মালয়ালী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি। ভারতবর্ষ একটি দেশ হইলেও উহা বৈচিত্র্যে ভরা। অনেকে ভারতবর্ষকে একটি উপমহাদেশ বলিয়া থাকেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমগ্র দেশটি ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কবি এবং দার্শনিকগণ এই দেশে একজন সম্রাট এবং একটি সাম্রাজ্যের আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগে বৈদিক ধর্ম দেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া আজ পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক আচার এবং ধর্মপালনের ক্ষেত্রে অনেক মিল রহিয়াছে। আজিও হিমালয়ের শিখরে ও সুদূর দক্ষিণ ভারতে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত দেশের বিরাট-সংখ্যক জনসাধারণের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘকাল এক দেশে একসঙ্গে বাস করিবার ফলে হিন্দু ও মুসলমানগণও পরস্পরের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস কাহাকে বলে? রামায়ণ-মহাভারত কি ইতিহাস?

২। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বোঝ? ভারতের ইতিহাসে উহার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। ভারতবর্ষ একটি দেশ হইলেও এখানে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই কেন?

৪। "ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে"—এই কথাটির তাৎপর্য কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাসের উপাদান

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ইতিহাসের ভিত্তি ঘটনা, কল্পনা নয়। কিন্তু অতীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারি? ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। কোন পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। তাহা হইলে প্রাচীন ভারতের রাজাদের কাহিনী, মানুষের সামাজিক জীবন ইত্যাদি আমরা কেমন করিয়া জানিতে পারি? (যে সকল জিনিসের সাহায্যে আমরা অতীতের নানা ঘটনা জানিতে পারি, তাহাদের বলে ইতিহাসের উপাদান।) এই সকল উপাদানের সাহায্যে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। অবশ্য আমরা আজও ভারতের ইতিহাসের সকল তথ্য জানিতে পারি নাই; তাই পণ্ডিতদের গবেষণারও শেষ হয় নাই।

(ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলি প্রধানতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) উৎকীর্ণ লিপি (২) মুদ্রা (৩) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং (৪) বিদেশীয়দের লিখিত বিবরণসমূহ।

উৎকীর্ণ লিপি

(ভারতের নানা স্থানে, এমন কি ভারতের বাহিরেও, প্রস্তর-গাত্রে মন্দির-স্তম্ভে, তাম্রপাতে খোদিত অনেক লিপি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলিকে উৎকীর্ণ লিপি (Inscription) বলে। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় এই লিপিগুলি রচিত। পণ্ডিতগণ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।) অশোকের শিলালিপির একটি দৃষ্টান্ত

দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক এই সকল শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। অশোকেব ত্রয়োদশ শিলালিপিব বাংলা অনুবাদ এই রকম ঃ

"অষ্ট বর্ষ রাজত্বের পর কলিঙ্গ দেশ শ্রীমন্মহারাজ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী হইয়াছিল, এক লক্ষ নিহত হইয়াছিল এবং তাহার দ্বিগুণ লোক মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। এইরূপ কলিঙ্গ-বিজয়ের পরে মহারাজের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়।"

এই লিপি হইতে আমরা স্পষ্ট একটি ঘটনা জানিতে পারি। উহা হইল এই যে, অশোক তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ-যুদ্ধে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক লিপি আছে, যাহা হইতে আমরা অশোকের ধর্ম, তাঁহার রাজ্যসীমা, শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানিতে পারি। অশোকের শিলালিপির মত আবও লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে আমরা নানা তথ্য জানিতে পারিয়াছি। এই তথ্যগুলি খুবই নির্ভরযোগ্য এই জন্য যে, লিপিগুলি রাজারাই উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন এবং উহাতে কিছু কিছু বিবরণ তাঁহারা দিয়াছেন। লিপিব বিষয়বস্তু ঘটনা।

মুদ্রা

রাজারা সেকালে যেসকল মুদ্রা ব্যবহার করিতেন, তাহাও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রাগুলিও খুবই মূল্যবান। মুদ্রাগুলির উপরে রাজাদের নাম এবং অনেক সময় মূর্তি পর্যন্ত খোদিত থাকে। যে সকল অঞ্চলে মুদ্রাগুলি পাওয়া যায়, আমরা উহা হইতে যে রাজা ঐ মুদ্রা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যসীমা আন্দাজ করিতে পারি। দক্ষিণ ভারতে বহু রোমক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রোম হইতে কি করিয়া এ মুদ্রা দক্ষিণ

ভারতে জমা হইল? নিশ্চয়ই উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এবং জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্যই এই রোমক মুদ্রা ব্যবহৃত হইত। (মুদ্রার উপর অনেক সময় সন তারিখও খোদিত থাকে এবং উহার সাহায্যে আমরা রাজাদের শাসনকাল জানিতে পারি।)

প্রাচীন সাহিত্য

(প্রাচীন যুগে কবি এবং পণ্ডিতগণ বহু পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল পুঁথি পাইয়াছি। এইগুলি অবশ্য সাহিত্য, ইতিহাস নয়। কিন্তু এই সকল সাহিত্য হইতে ইতিহাসের নানা তথ্য, বিশেষ করিয়া মানুষের সামাজিক জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া আমরা প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজজীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। প্রাচীন যুগের কয়েকটি ইতিহাস-গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাণভট্ট-রচিত "হর্ষচরিত" পড়িয়া আমরা মহারাজ হর্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক কথা জানিতে পারি। কহ্লন-রচিত "রাজতরঙ্গিণী" পড়িয়া আমরা কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস, হূণরাজা তোরমান ও মিহিরগুলের কার্যকলাপ জানিতে পারি। মুসলমান আমলে কয়েকজন ইতিহাস-গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; যথা—আল বিরুনীর ভারত বিবরণী, মিনহাজ, আবুল ফজল, খাফী খাঁ, বদায়ুনি প্রভৃতির লেখা ইতিহাস-গ্রন্থ। ইতিহাস-গ্রন্থ হইতে স্বভাবতই ইতিহাসের ঘটনা জানা যায়। লিপি ও মুদ্রা হইতে আমরা যে সকল বিবরণ পাই, উহা সাহিত্য ও ইতিহাস-গ্রন্থের তথ্যের সহিত মিলাইয়া পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করেন।)

বিদেশীদের বিবরণ

প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতে বহু বিদেশী পর্যটক আসিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ভারত-

ইতিহাসের উৎস-সন্ধানে বার বার আমাদের এই সমস্ত বিবরণের আশ্রয় লইতে হয়। মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে দূত হিসাবে আসিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের "ইণ্ডিকা" বা ভারত-বিবরণী ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। তেমনি চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্ এদেশে আসিয়া ও নানাস্থানে ঘুরিয়া যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেও আমরা সেকালের অনেক তথ্য জানিতে পারি। মুসলমান যুগেও পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ, ইটালীয় প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণীতে সে-যুগের জীবনযাত্রার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১। ইতিহাসের ঘটনা আমরা কেমন করিয়া জানিতে পারি ?

২। ভারতের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি কি কি ?

৩। উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা ও সাহিত্য—ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এইগুলির মূল্য বিচার কর।

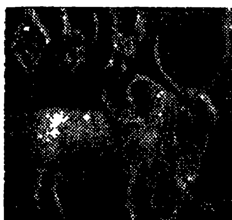
তৃতীয় অধ্যায়

সিন্ধুসভ্যতা

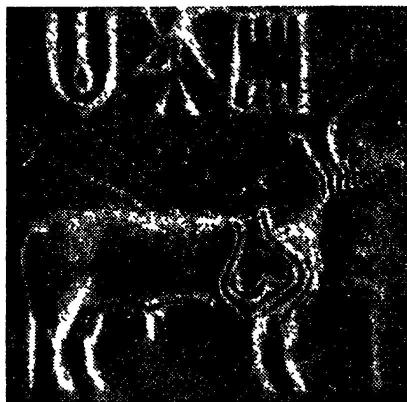
(হাজার হাজার বৎসর আগে যে সভ্যতা আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, উহা কালক্রমে মাটির তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। (মাটির উপরে শুধু একটা উঁচু ঢিবি, আর কিছু চোখে পড়ে না। বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু ঢিবি দেখিয়া অনেক সময় ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝিতে পারেন। মাটি খোঁড়া সুরু হয়, ইহাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান। তারপর অনেক সময় মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবিষ্কৃত হয় দুর্গ, প্রাসাদ, ঘরবাড়ী, নগরী, মূর্তি, মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি। এমনি ভাবেই মাটির তলা হইতে প্রাচীন যুগের কত নগরী, দুর্গ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছত্রিশ বৎসর আগে এই ভাবেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এই সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা।)

(**মোহেঞ্জোদড়ো**—১৯২২ সালে স্বর্গত বিখ্যাত বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু দেশের লারকানা সহরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে মোহেঞ্জোদড়োয় একটি ঢিবি আবিষ্কার করেন। মোহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ—মৃতের ঢিবি। এই "মৃতের ঢিবি" খুঁড়িয়া একটি নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর কিনারায় হরপ্পায় অনুরূপ একটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই দুটি অঞ্চলে খননকার্য চলিবার ফলে আমরা সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছি। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এই সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল।) দুঃখের বিষয়, এই সভ্যতার

কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। মোহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পায় বহু সীলমোহব পাওয়া গিয়াছে। উহাদের উপর যে সকল অক্ষর খোদিত আছে, পণ্ডিতগণ সেগুলি আজও পড়িতে পারেন নাই। ফলে







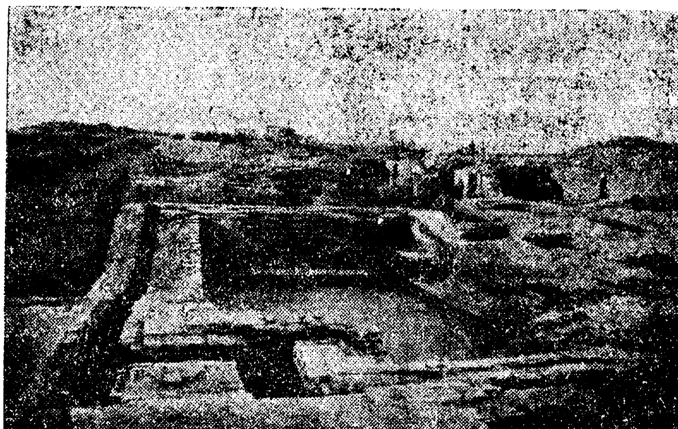
মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহর

এই সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমাদেব অজ্ঞাত। কিন্তু মাটির তলায় যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমবা এই সভ্যতাব পবিচয় পাই।

নগরী

মোহেঞ্জোদড়োর প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার নগর-পরিকল্পনা। নগরীতে সারি সারি ইটে তৈয়ারী অসংখ্য ছোট বড় ঘরবাড়ী। ঘরবাড়ীতে সুন্দর সুন্দর দরজা-জানালা। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। রাস্তার মাঝে মাঝে জঞ্জাল ফেলিবার নির্দিষ্ট স্থান। আধুনিক যে কোন সহরের মত এখানে নালা-নর্দমারও ব্যবস্থা ছিল। নগরীর মধ্যে একটি বৃহৎ স্নানাগার ছিল।

সে-যুগে ইটের ভাঁটি এবং ইট আসিল কোথা হইতে? ইটের পাঁজার



মোহেঞ্জোদড়োর বিখ্যাত স্নানাগার

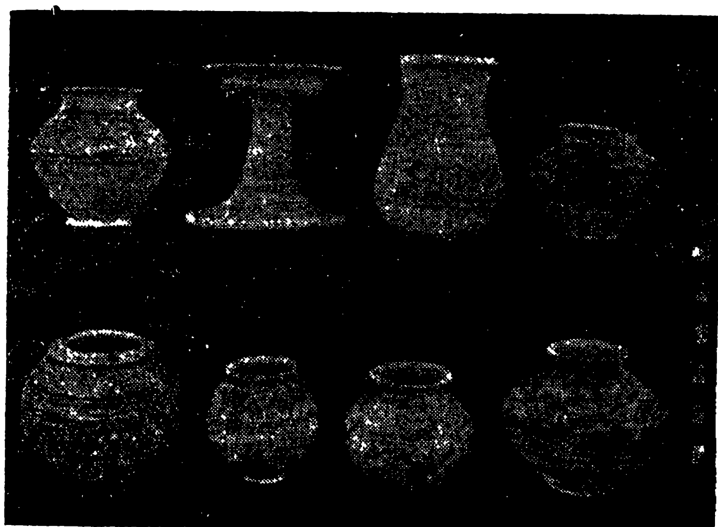
মত জিনিস এখানে পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ভাঁটিতে ইট পোড়াইবার কৌশল ইহারা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আয়ত্ত করিয়াছিল।

জনসাধারণের জীবনযাত্রা

এখানে মাটি খুঁড়িয়া গহনা, পুতুল, মাটির পাত্র, কুঠার, তীর-ধনুক, বল্লম ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। সে-যুগের জনসাধারণ নিশ্চয়ই এই সকল সুদৃশ্য ও সূক্ষ্ম কাজের গহনা ব্যবহার করিত। কারিগরগণও খুব দক্ষ ছিলেন। সোনারূপা ও তামার নানা জিনিস এখানে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য লোহার কোন জিনিস এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই।

ইহা হইতে বোঝা যায় যে, মোহেঞ্জোদড়োর মানুষ তাম্র যুগে বাস করিত, লোহার ব্যবহার তাহারা শিখে নাই।

কাদামাটি হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী করিবার জন্য



মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত পাত্র

ইহারা কুমোরের চাক ব্যবহার করিত। মাটির তৈরী সুন্দর সুন্দর পাত্র এখানে পাওয়া গিয়াছে।)

(মোহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা প্রধানতঃ নগর-সভ্যতা। এই নগর-সভ্যতা যে খুব সমৃদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।) কিন্তু প্রশ্ন হইল এত সমৃদ্ধি কোথা হইতে আসিল? (পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নগরীর মানুষ ধনসম্পদ সংগ্রহ করিত। শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও তাহারা বাণিজ্য করিতে যাইত। ভারতের বাহির হইতেই তাহারা সংগ্রহ করিত টিন, তামা,

মূল্যবান পাথর ইত্যাদি। এখানে যে প্রায় পাঁচ শত সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে উহা সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহৃত হইত।

ধর্ম

ইহাদের মধ্যে ধর্মপালনের যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহাও কিছু কিছু আন্দাজ করা যায়। মনে হয়, মাতৃকারূপে দেবীর পূজাই এখানে প্রচলিত ছিল। আমরা যাঁহাকে শিব বলিয়া জানি অনুরূপ একটি দেবতারও পূজা হইত বলিয়া মনে হয়।

প্রাক্-আর্য সভ্যতা

পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে প্রায় একমত যে সিন্ধুসভ্যতা আর্য সভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতা হইতে প্রাচীনতর। আর্যগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন আর সিন্ধুসভ্যতা একটি নগর-সভ্যতা। আর্যদের মধ্যে দেবতাদের স্থান উঁচু, সিন্ধুসভ্যতার যুগে মাতৃকারূপে দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আর্যদের পূর্বে যে জনগণ ভারতে বাস করিত, তাঁহারাই এই সুমহান সভ্যতার স্রষ্টা, এবং উত্তর দিক হইতে আগত আর্যদের সহিত যুদ্ধে এই সভ্যতার ধ্বংস হইয়াছিল। মোহেঞ্জোদড়োর ঘরের মধ্যে এমন অবস্থায় মানুষের কংকাল পাওয়া গিয়াছে যে, উহা দেখিয়া পণ্ডিতদের মনে হয়, যুদ্ধের ফলেই ঘরের মধ্যে উহাদের মৃত্যু হইয়াছিল। অবশ্য যতদিন আমরা সীলমোহরের অক্ষরগুলি পড়িতে না পারিব, ততদিন এই সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণই থাকিবে।

অনুশীলনী

১। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সাহায্যে কিভাবে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়? সিন্ধুসভ্যতা কিভাবে আবিষ্কৃত হইল?

২। সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি কি?

চতুর্থ অধ্যায়

আর্য জনগণ ঃ বৈদিক সভ্যতা

সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হইবার পরে ভারতবর্ষে এক নূতন সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিল আর্য নামে এক সুসভ্য জাতি। আর্যদের আদিম বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়া এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অঞ্চলগুলিতে (বর্তমানে যে অঞ্চলে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি অবস্থিত)। তারপর তাহারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর আগে ইহাদের একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। অন্যান্য শাখাগুলি ইরান, গ্রীস ও ইউরোপের নানা জায়গায় ক্রমশঃ বসতি স্থাপন করে।

আর্য সাহিত্য

আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বেদ। "বেদ" শব্দের অর্থ জ্ঞান। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চারিটি বেদ। পৃথিবীর আর্য ভাষাভাষীদের মধ্যে ভারতীয় শাখার চতুর্বেদই প্রথম সাহিত্য। ইহাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্‌বেদে সূর্যের প্রতি, বরুণের প্রতি, অগ্নির প্রতি, উষার প্রতি যে সমস্ত শ্লোক আছে, কবিতার মাধুর্যে উহা অতুলনীয়।

ঋগ্‌বেদের "উষাস্তোত্রের" একটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

"দিন আর রাত্রি।
দুই দেবতা, বিচিত্র তাদের রূপ।
যেখানে একটির শেষ, সেখানে আর একটির সুরু।
একটি যায়, আর একটি আসে।

রাত্রি সমস্ত কিছু ঢাকিয়া দেয় ; আর উষা তার উজ্জ্বল রথ দিয়া সমস্ত কিছু উন্মোচিত করে।"

সামবেদের প্রায় সব স্তোত্রগুলি ঋগ্‌বেদ হইতে সংকলিত। যজুর্বেদে আছে যজ্ঞের জন্য স্তোত্র। অথর্ববেদে ভৌতিক এবং আভিচারিক মন্ত্র রহিয়াছে।

বেদের পরে ভারতীয় আর্যগণ "উপনিষদ" এবং "আরণ্যক" রচনা করেন। উপনিষদ ভাগ অধিকাংশই আরণ্যকের অংশ মাত্র। আর্যদের রচিত উপনিষদগুলি দার্শনিক চিন্তায় এবং ধর্মের তত্ত্বে এমনি সূক্ষ্ম ও উন্নত যে, উহাদের তুলনা প্রায় নাই বলিলেই চলে। এই উপনিষদগুলির সংখ্যা প্রায় একশত ; যথা—কেন, কথা, প্রশ্ন, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি।

আর্যদের সামাজিক জীবন

বৈদিক সাহিত্য হইতে আমরা আর্যদের সামাজিক জীবনের কথা জানিতে পারি। বৈদিক যুগে সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তাকে গৃহপতি বলা হইত। কয়েকটি পরিবার মিলিয়া একটি গ্রাম গঠিত হইত। গ্রামের প্রধানকে বলা হইত "গ্রামণী"। কয়েকটা গ্রাম লইয়া 'বিশ' বা 'জন' গঠিত হইত। বিশের কর্তাকে "বিশপতি" বলা হইত।

আর্যগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন। পশুপালন এবং কৃষিই ছিল তাহাদের প্রধান পেশা। সিন্ধুসভ্যতার সহিত এইখানে আর্য সভ্যতার মস্ত তফাৎ। সিন্ধুসভ্যতা মূলতঃ নগরসভ্যতা।

আর্যগণ দুধ, ফল, শাকসবজি, মাংস প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেন। সোমরস এবং সুরাপান তাহাদের প্রিয় ছিল। পশুশিকার, রথের দৌড়, পাশাখেলা, নৃত্য-গীত প্রভৃতি খুব জনপ্রিয় ছিল।

ধর্ম

বৈদিক আর্যদের মধ্যে যে সমস্ত দেবতার পূজা হইত, তাঁহাদের মধ্যে দ্যৌঃ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতিই প্রধান। আর্যদের নিকট দেবতাদের তুলনায় দেবীদের স্থান অনেক নীচে ছিল। দেবীদের মধ্যে পৃথ্বী, সরস্বতী, উষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির নানা শক্তিকেই তাহারা দেবদেবীরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করিতেন; যথা— বরুণ (জলের দেবতা), মিত্র (সূর্য), অগ্নি, ইন্দ্র (বৃষ্টি আর বজ্রের দেবতা) ইত্যাদি। বিভিন্ন দেবদেবীব আরাধনা করিলেও তাঁহারা মনে করিতেন যে ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন, বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ।

আর্যগণ যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞে ঘি, দুধ, শস্য ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত।

আর্য ও অনার্য ধর্মরীতির সংমিশ্রণ

আর্যদের আগমনের পূর্ব হইতে ভারতে যে জনগণ বাস করিত, আর্যগণ উহাদের "দস্যু" বা "দাস" বলিতেন। সাধারণভাবে ইহাদের অনার্য বলা হয়। ভারতীয়দের সামাজিক জীবন এবং ধর্মপালনের রীতিনীতি এই আর্য ও অনার্যদের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির সংমিশ্রণ। অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত, উহার মধ্যে আর্য এবং অনার্য প্রভাব রহিয়াছে। শতাব্দীব বিরোধ এবং মিলনের মধ্য দিয়া অনার্যদের ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান বৈদিক ধর্মের সহিত মিশাইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দু ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে।

আর্যগণ মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করিতেন না, তাহাদের মধ্যে পশুবলি প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী আর্য এবং হিন্দুধর্মে যে মূর্তি পূজা,

পশুবলি, বহু দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে, উহাদের মূলে আছে অনার্যদের প্রভাব। শিব, উমা, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি অনার্যদেরই দেবদেবী। আর্যদের প্রধান দেবতারা ছিলেন পুরুষ, পরে হিন্দুধর্মে উমা, দুর্গা এবং কালী প্রভৃতি দেবী যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, উহারও মূলে আছে অনার্য প্রভাব। অনার্যগণ গাছ, পাথর ফলমূল, ফুল ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া উহাদের পূজা করিত। বর্তমান হিন্দুধর্মে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে ধান, দূর্বা, কলাগাছ এবং কলা, সুপারি, পান, হলুদ, সিঁদূর প্রভৃতি বড় একটা জায়গা জুড়িয়া আছে।

একই দেশে আর্য এবং অনার্যগণ শত শত বৎসর পাশাপাশি বাস করিবার ফলে একের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অপরকে প্রভাবিত করিয়াছে এবং এইভাবেই হিন্দুধর্ম উহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে আর্যদের সমাজ ও ধর্মপালনের মধ্যে অনেক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের ভিত্তি করিয়া চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইলেও প্রথম দিকে জাতিভেদ প্রথা গড়িয়া উঠে নাই, চারি বর্ণের মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পথে বাধা ছিল না। কিন্তু মহাভারতের যুগে চারি বর্ণকে ভিত্তি করিয়া জাতিভেদ প্রথা সমাজে বাসা বাঁধিয়াছিল। শূদ্রদের স্থান খুব নীচে নামিয়া গেল। শূদ্রদের সহিত' উচ্চ বর্ণের বিবাহ সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সমাজের উচ্চ মঞ্চে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহাকাব্যের যুগে পুরুষ ও নারীর বহুবিবাহ, অর্থাৎ একই পুরুষের একাধিক পত্নী, এবং একই নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণের রীতি দেখা

যায়। অনার্যদের রীতিনীতি আর্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল।

অনার্যদের সহিত আর্যদের বিরোধ এবং আর্য-সভ্যতার বিস্তারের আভাসও মহাকাব্যে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতই ছিল অনার্যদের প্রধান বাসস্থান। রামচন্দ্র এই দক্ষিণ ভারতেই অভিযান করিয়াছিলেন। "বানর" রূপে অনার্যদের কল্পনা করা হইয়াছে। আবার বানররূপী এই অনার্যরাই হইলেন আর্যবীর রামচন্দ্রের মিত্র এবং সহায়।

লঙ্কার অনার্যদের রাক্ষসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। রামচন্দ্র রাক্ষসদের রাজা রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আর্যবীর রামচন্দ্রই দক্ষিণ ভারতে এবং সুদূর লঙ্কায় আর্য-সভ্যতা বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। অনার্যগণ আর্যদের দ্বারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন।

অনুশীলনী

১। বৈদিক যুগের সামাজিক জীবনের বর্ণনা কর। সিন্ধুসভ্যতার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায়?

২। অনার্য ধর্ম কি ভাবে বর্তমান হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে?

৩। হিন্দু ধর্মে পশুবলি, কলাগাছ, পান, সুপারি ইত্যাদি কি ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিল?

পঞ্চম অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে ধর্ম খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ক্রমশঃ এই ধর্ম সরলতা হারাইয়া নানারকম আচার-অনুষ্ঠানে ও যাগযজ্ঞে ভরিয়া উঠিল। বৈদিক আর্যগণ পশুবলির অনুষ্ঠান করিতেন না, কিন্তু পরবর্তীকালে বৈদিক ধর্মে পশুবলি প্রচলিত হইয়াছিল। ভক্তির চাইতে আড়ম্বর বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল।

ইহা কিরূপে ঘটিল? প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ সমাজে মান্য-গণ্য হইবার পরে তাঁহাদের ভাষ্য অনুসারে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রভাবের ফলে বৈদিক ধর্ম উহার সরলতা হারাইয়া অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিতে লাগিল। জাতিভেদ প্রথাও কঠোর হইল। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা ধর্মানুষ্ঠানের এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাই। এই অবস্থায় ক্ষত্রিয় বংশ-জাত রাজকুমার মহাবীর এবং বুদ্ধ প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম নামে খ্যাত। এই দুটি ধর্মমতের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরাট পার্থক্য।

জৈনধর্ম

জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক পার্শ্বনাথ। তিনি সম্ভবতঃ বারাণসীর রাজপুত্র ছিলেন। পার্শ্বনাথ শিষ্যদের চারিটি উপদেশ দিয়াছিলেন— হিংসা করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, চুরি করিবে না এবং কোন দ্রব্য পরিগ্রহ করিবে না।

মহাবীর জৈনদের মতে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতের মূল কথা হইল—জীবে অহিংসা, সত্যকথা বলা এবং সৎপথে জীবনযাপন করা। তিনি বলিয়াছেন—সমস্ত বাহ্য দ্রব্য, এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত, পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেননা বাহ্য দ্রব্য হইতেই আসক্তি জন্মে।



মহাবীর

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত জৈন-ধর্মের পার্থক্য কোথায়? প্রথমতঃ মহাবীর বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। জৈনগণ বেদের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ জৈনরা অহিংসায় বিশ্বাসী, এবং পশুবলির বিরোধী। জীবের প্রতি দয়া জৈনধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। পশু, পাখী, এমন কি কীট-পতঙ্গকে পর্যন্ত জৈনগণ আশ্রয় ও আহার্য দান করে এবং ইহা তাহাদের ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। তৃতীয়তঃ মহাবীর বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

জৈনধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হইল—দ্বাদশ "অঙ্গ"। মহাবীরের উপদেশাবলী সংকলিত করিয়া এই 'অঙ্গ'গুলি রচিত। কালক্রমে জৈনধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। আজও রাজপুতনা এবং গুজরাটের জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশ জৈনধর্মে বিশ্বাসী।

বৌদ্ধধর্ম

মহাবীরের জীবিতকালে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হইল এই যে, মানুষের জীবন রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর জন্য দুঃখময়। ভোগবিলাসে গা ঢালিয়া দিয়া, কিবা জীবনের সমস্ত কিছু হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়া দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না। এই দুটির মাঝামাঝি সংযমের পথই হইল মুক্তির উপায়। সংযমের এই মাঝামাঝি পথে চলিতে হইলে কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিতে হয়। বুদ্ধ এই রকম আটটি নীতি বা ''অষ্টমার্গ'' -এর নির্দেশ দিয়াছেন। এই ''অষ্টমার্গ'' হইল—সৎ সংকল্প, সদ্বাক্য, সৎকার্য, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি, সৎ জীবনধারণ, সম্যগ্ দৃষ্টি এবং সম্যক সমাধি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য 'নির্বাণ'। 'নির্বাণ' বলিতে বুঝায় সংসারের দুঃখ-কষ্ট, কামনা-বাসনা হইতে মুক্তি।



বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব শিষ্যদের যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার কিছু অংশ এই রকম :

১। ''সকল মানুষই মৃত্যুকে ভয় করে। অপরের সহিত নিজেকে তুলনা করিয়া কেহই হত্যা করিবে না, কিংবা হত্যা করাইবে না।''

২। "কঠোর কথা বলিবে না। কঠোর কথা যাহাকে বলিবে, সেও উহার উত্তর দিবে। কঠোর কথা বেদনা উৎপাদন করে বলিয়া উহার ফলে তোমাকে প্রতিহিংসার কবলে পড়িতে হইবে।"

অত্যন্ত সহজ সরল ধর্মনীতি। বৌদ্ধধর্মে আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের স্থান নাই। মূর্তিরূপে বুদ্ধের পূজাও নিষিদ্ধ। জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও বেদ-বিরোধী। বুদ্ধ বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন নাই। তিনি যাগযজ্ঞ এবং পশুবলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে বুদ্ধ বলিয়াছেন—ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই।

বৌদ্ধধর্মের সহিত স্পষ্টই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মস্ত পার্থক্য। বুদ্ধ প্রধানতঃ সৎকার্য এবং সৎ জীবনযাপনের উপর জোর দিয়াছেন, আর ব্রাহ্মণ্যধর্মে পূজাপার্বণ, পশুবলি প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ পুরাপুরি ব্রাহ্মণ্যধর্ম অগ্রাহ্য করেন নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও কর্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

বুদ্ধ নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যরা রাজগৃহে সম্মিলিত হইয়া তাঁহার উপদেশগুলি সংকলিত করিয়া তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই তিনটি গ্রন্থ "ত্রিপিটক" নামে বিখ্যাত। 'ত্রিপিটক'-এর তিনটি পেটিকা বা অংশ হইল—সূত্রপিটক (বুদ্ধের বাক্য ও কার্য), বিনয়পিটক (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় কর্তব্য) এবং অভিধর্ম পিটক (দার্শনিক তত্ত্ব)।

বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর

ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া গোতম বুদ্ধ যে সরল সহজ যুক্তিধর্মী ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, কালক্রমে উহার মধ্যে গভীর পরিবর্তন আসে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ

ধর্মে কালক্রমে বুদ্ধমূর্তির পূজা, নানারকম আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্মের একটি নূতন শাখা নূতন ভাবে বৌদ্ধধর্মকে গঠন করে। এই নূতন শাখা "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত। হিন্দুধর্মের সহিত 'মহাযান' বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য বিশেষ চোখে পড়ে না।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ সংঘ বা মঠ স্থাপন করিয়া দিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মঠে অবস্থান করিয়া অসীম অধ্যবসায় সহকারে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বলিতেন ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। মৌর্যসম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে ইহার দ্রুত বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল।

যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের জন্ম, উহা হইতে বৌদ্ধধর্ম লোপ পায়, কিন্তু ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া চীন এবং জাপানে আজও বৌদ্ধধর্ম টিকিয়া আছে। অবশ্য এই বৌদ্ধধর্ম "মহাযান" মতে বিশ্বাসী।

যুগরেখা

সিন্ধু সভ্যতা……………২,৯০০ (আনুমানিক) খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ
আর্যদের আগমন ঃ আর্য-সভ্যতা………১,৬০০
বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ………………৪৮৬ বা ৪৮৩

লনা

১। মহাবীর ও বুদ্ধ যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী তাহার প্রমাণ কি?
২। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কি সাদৃশ্য আছে?
৩। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের পার্থক্য কোথায়?

মৌর্য যুগ

খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে মৌর্য যুগেব সুরু হয়। ভারতের ইতিহাসে এই যুগের গুরুত্ব খুব বেশী। এই যুগে উত্তর ও পূর্ব ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগেই চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের আবির্ভাব। রাজ্যশাসনে, ধর্মসাধনায়, সংস্কৃতির উন্নতিতে মৌর্য সম্রাটগণ নূতন ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দবংশের উচ্ছেদ ঘটাইয়া তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা কবেন এবং সেলুকাসের পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাজ্যগুলি, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট প্রদেশ লাভ করেন। পশ্চিম ভারতের সুরাষ্ট্র প্রদেশও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সম্ভবতঃ ৩২৪ হইতে ৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে বিন্দুসার মগধের রাজা হন। পিতা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি উহা যোগ্যতার সহিত রক্ষা করেন। পশ্চিমের গ্রীকদের সহিত তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে অশোক ২৭৩ বা ২৭১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৩২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। তাঁহার সময় মৌর্য সাম্রাজ্য হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কাশ্মীর, পাঞ্জাব, পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং সমতট (পূর্ববঙ্গ) তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কলিঙ্গ বিজয়ের পরে শোকাহত অশোক দেশজয়ের নীতি পরিত্যাগ করিয়া শান্তির নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধের বাজনা বন্ধ হইবে এবং ধর্মের বাজনা সুরু হইবে। তখন হইতে ধর্মবিজয় হইল অশোকের মহান্ ব্রত। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

অশোকের শিলালিপি

জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাথর ও স্তম্ভ-গাত্রে সহজ সরল ভাষায় অসংখ্য লিপি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের শিলালিপিগুলি তক্ষশিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, রুমিনদাঈ, সাঁচী, লৌরিয়া-নন্দনগড়, সারনাথ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই শিলালিপিগুলি হইতে আমরা অশোকের ধর্ম সম্পর্কে জানিতে পারি।

একটি শিলালিপিতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

"পিতামাতা এবং গুরুজনদের মান্য করিতে হইবে। জীবে দয়া প্রদর্শন করিতে হইবে ; সত্য কথা বলিতে হইবে।"

আর একটি শিলালিপিতে এই মহান্ সম্রাট্ বলিয়াছেন ঃ

"সকল প্রজা আমার সন্তান।"

এই শিলালিপি হইতে আমরা অশোকের ধর্ম সম্পর্কে কি ধারণা লাভ করি ? শিলালিপিতে তো কোন সূক্ষ্ম দার্শনিক মতামত নাই, আচার-অনুষ্ঠানের বিধানও নাই। সর্ব মানুষের মঙ্গলই তাঁহার ধর্ম-নীতির মূল কথা। অহিংসা, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণ সাধন—এইগুলিই অশোকের ধর্মের মূল অঙ্গ।

ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক বিহারযাত্রা বন্ধ করিয়া স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামে গিয়া তিনি বুদ্ধের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। রাজুক, প্রাদেশিক এবং ধর্মমহামাত্রদের উপর তিনি ধর্ম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন। শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, ভারতের বাহিরে সিরিয়ায়, মিশরে, ম্যাসিডনে, সিরিনে তিনি ধর্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলে গিয়াছিলেন তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্রা এবং পুত্র মহেন্দ্র। শোনা যায় যে, তিনি ব্রহ্ম-দেশেও প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম এক বিরাট ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইতিহাসে অশোকের স্থান

মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক। ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাসের মহাপুরুষদের মধ্যেও তাঁহার নাম স্থান পায়। রাজর্ষি অশোক শান্তি, মানবকল্যাণ এবং অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী

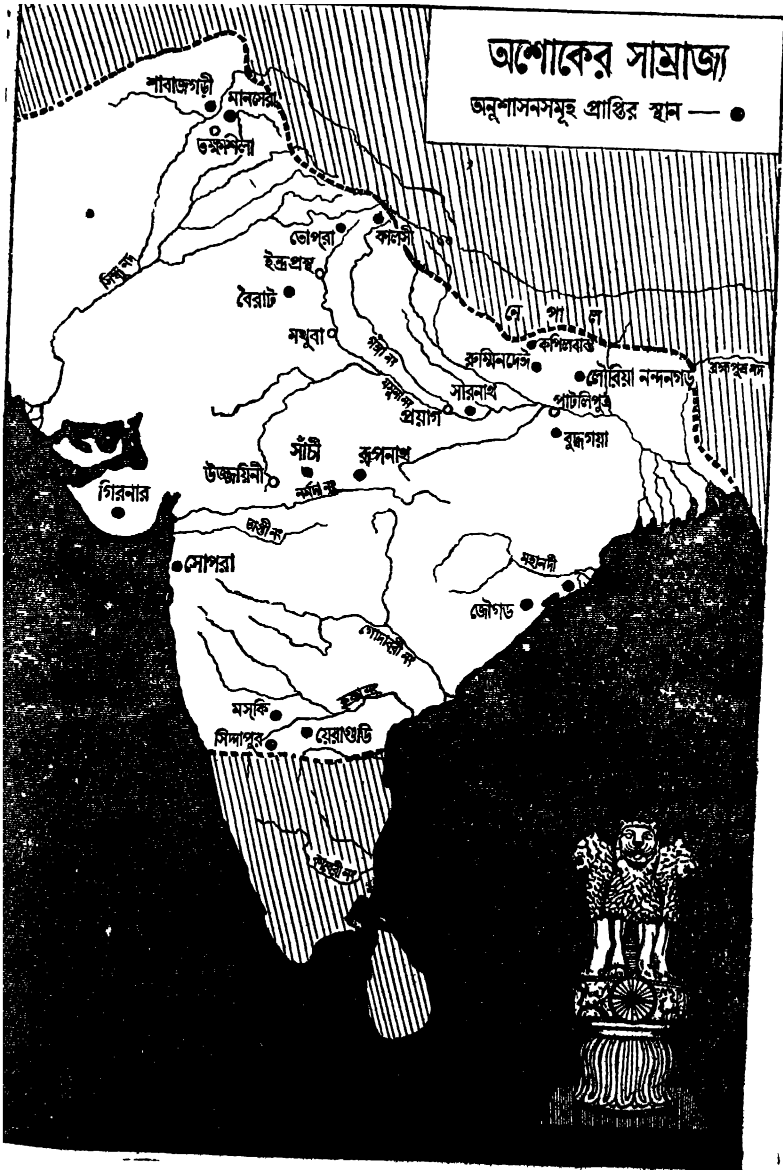
বীরের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন শান্তি ও অহিংসা নীতি প্রচার করিয়াছেন। অস্ত্র দ্বারা নয়, মানবকল্যাণের আদর্শ দ্বারা তাঁহারা কয়জন জনচিত্ত জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? শত শত বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তবু আজিও স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের বাণী অহিংসা এবং মানবকল্যাণের সুমহান আদর্শ প্রচার করিতেছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী

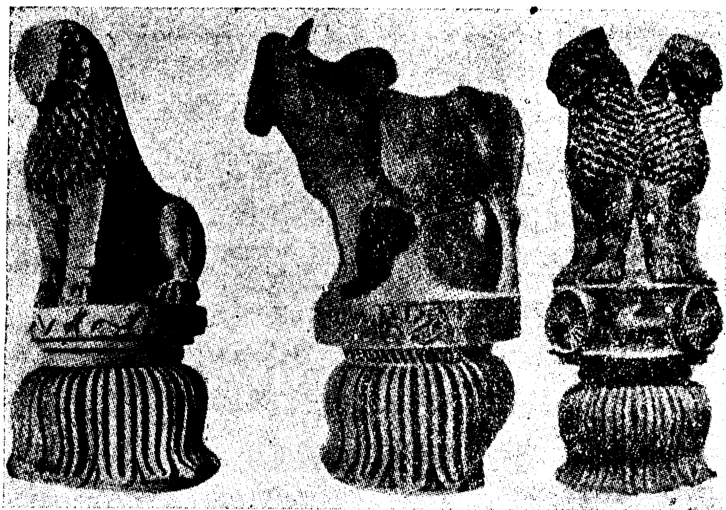
মৌর্যযুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল? সৌভাগ্য-বশতঃ আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে ইহার কিছুটা জানিতে পারিয়াছি। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সেলুকাসের দূত হিসাবে আসিয়া এই বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন,—ভারতে সাতটি শ্রেণী: দার্শনিক, অমাত্য, গুপ্তচর, কারিগর, কৃষক, সৈনিক এবং পশুপালক। ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নাই। ভারতীয়গণ মিতব্যয়ী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। কৃষকগণ খুবই শান্ত, নিরীহ। চুরি-ডাকাতি দেশে ঘটে না। লোকে মিথ্যা বলে না। যাগযজ্ঞের সময় ছাড়া লোকে মদ্য পান করে না। ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ এই দেশ। দুর্ভিক্ষ প্রায়ই ঘটে না। রাজা এবং সামন্তগণ একাধিক বিবাহ করেন। একদল মহিলা রাজার দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত থাকে।

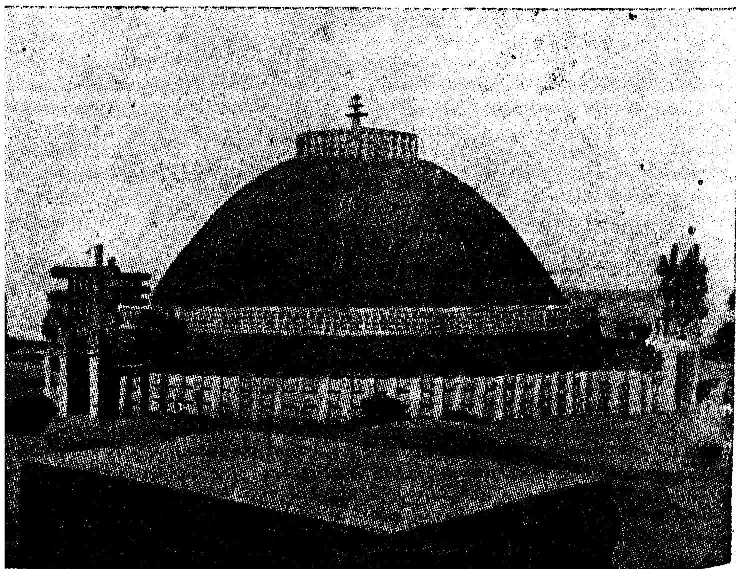
মেগাস্থিনিস রাজধানী পাটলিপুত্রের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন,—গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নগরী অবস্থিত। নগরীর পাদদেশে জলপূর্ণ পরিখা, চতুর্দিকে প্রাচীর। নগরীর মাঝখানে প্রাসাদ। নগর পরিচালনার জন্য আধুনিক পৌরসভার মত একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিত,



অশোকের সাম্রাজ্য
অনুশাসনসমূহ প্রাপ্তির স্থান — ●
শাবাজগড়ী
মানসেরা
তক্ষশিলা
কালসী
ইন্দ্রপ্রস্থ
বৈরাট
মথুরা
নে পা ল
কপিলবাস্তু
রুম্মিনদেই
লৌরিয়া নন্দনগড়
সারনাথ
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
বুদ্ধগয়া
সাঁচী
রূপনাথ
উজ্জয়িনী
গিরনার
সোপরা
মহানদী
জৌগড়
মস্কি
সিদ্দাপুর
যেরাগুড়ি



অশোক স্তম্ভশীর্ষ



সাঁচী স্তূপ

ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত, কারিগরী শিল্পের তদারক করিত, জিনিসপত্রের বিক্রয়ের উপর কর আদায় করিত।

শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন: রাজা ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি একদল গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশের খবর সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ এবং একদল কর্মচারী ছিল। সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। মিথ্যা বলিলে অঙ্গচ্ছেদ এবং চুরি করিলে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীতে ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী এবং অসংখ্য রথ ছিল। সেনাবাহিনীর কয়েকটি বিভাগ ছিল, যথা—নৌ-বিভাগ, পদাতিক বিভাগ, অশ্বারোহী বিভাগ, হস্তী ও রথ বিভাগ, রসদ-সংগ্রহ বিভাগ এবং যান-বাহন বিভাগ।

মেগাস্থিনিসের এই বিবরণী হইতে আমরা সেকালের সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বুঝি?

দেশে গ্রাম ছিল, আবার পাটলিপুত্রের মত উন্নত নগরীও ছিল। দেশের মানুষ বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত ছিল, যথা—কৃষি, কারিগরী শিল্প, পশুপালন, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি। মেগাস্থিনিস অবশ্য লিখিয়াছেন যে, দেশে ক্রীতদাস ছিল না। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার এই মত গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা বলেন, ভারতে তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল, তবে উহা গ্রীস বা রোমের মত অত ব্যাপক ছিল না।

শাসন-ব্যবস্থায় দেখি রাজতন্ত্র,—প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র নয়। মন্ত্রিপরিষদ রাজারই আজ্ঞাবাহী ছিল। রাজাই দেশের সর্বেসর্বা। তবে প্রজার মঙ্গলসাধন রাজকর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। অশোক স্বয়ং বলিয়াছিলেন, "সকল প্রজাই আমার সন্তান।"

শিল্প

মৌর্য যুগে ভারতীয় শিল্প খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অশোকের নির্মিত স্তম্ভগুলি মৌর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। স্তম্ভগুলির শীর্ষে সিংহ-মূর্তি। সারনাথের সিংহচূড়াটি সবচেয়ে সুন্দর। পাথর কাটিয়া এই সকল স্তম্ভ এবং পশুমূর্তি নির্মিত হইয়াছিল। অশোক অসংখ্য স্তূপ নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ভূপাল রাজ্যে অবস্থিত সাঁচী স্তূপটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। অশোকের পরে আরও কয়েকজন রাজা এই স্তূপটিকে আরও বড় করিয়া গড়িয়াছিলেন। ইহা প্রায় ৮০ ফুট উঁচু। স্তূপের চারিপাশে পাথরের প্রাচীর।

অনুশীলনী

১। অশোকের ধর্ম বলিতে কি বুঝায়?

২। অশোকের শিলালিপির গুরুত্ব কি?

৩। মৌর্য যুগে কোন্ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল—রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র না অভিজাততন্ত্র?

৪। মৌর্য যুগের একটি নগরীর বর্ণনা দাও।

৫। মৌর্য যুগে লোকের কি কি পেশা ছিল?

সপ্তম অধ্যায়

পারস্য এবং গ্রীসের সহিত যোগাযোগ

মৌর্য যুগের পূর্বে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি দুটি দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল—পারস্য এবং গ্রীস। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগের কি ফল হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিব।

পারস্য ও ভারত

প্রাচীন যুগে পারস্য সাম্রাজ্য ছিল সুবিশাল। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম সাইরাস। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি ভারতে অভিযান করিয়া সিন্ধু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলগুলি পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট ডেরিয়াস স্কাইল্যাক্স নামে এক নাবিকের নেতৃত্বে সিন্ধু নদীতে রণতরী পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানের পরে রাজপুতনার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই অঞ্চলটি পারস্য সাম্রাজ্যের লোভনীয় প্রদেশে পরিণত হয়। সহস্র সহস্র মুদ্রার সমমূল্য প্রচুর স্বর্ণরেণু এই অঞ্চল হইতে রাজস্ব-স্বরূপ পারস্যে পাঠান হইত। ডেরিয়াসের পুত্র সম্রাট জারেক্সেসের আমলে বহু ভারতীয় সৈনিক সুদূর গ্রীসে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল।

এইভাবে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে পারস্য ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। ঠিক কিভাবে এই যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যায় তাহা জানা যায় না। দুই দেশের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেলেও পারস্য অভিযান ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। পারস্য অভিযানের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ইউরোপের কাছে

ভারতের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল। অফুরন্ত ধনসম্পদে ভরা এক বিচিত্র দেশের কথা ইউরোপের মানুষ জানিল। গ্রীসের রণাঙ্গনে এই বিচিত্র দেশের মানুষকে তাহারা দেখিল। পারসীক কর্মচারীরা সিন্ধু উপত্যকায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিল। ক্রমে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। পারস্য হইতেই ভারতে নূতন অক্ষরমালা প্রবর্তিত হইল—**আরমেইক** এবং **খরোষ্ঠী**। পারস্যের শিল্পকলাও মৌর্য যুগের ভারতীয় শিল্পকলার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মৌর্য যুগে পাথর খোদাই এবং পাথরের সাহায্যে সিংহমূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে পারসীক প্রভাব আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

গ্রীস ও ভারত

পারসীক অভিযানের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে এক ইউরোপীয় জাতি ভারতে অভিযান করে, উহারা গ্রীক। ম্যাসিডনের সম্রাট আলেকজান্দার মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া কান্দাহার ও আফগানিস্থানের পথে খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৬ অব্দে ঝিলাম নদীর তীরে উপস্থিত হন। পুরুরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। পাটলিপুত্রে তখন নন্দ-বংশ রাজত্ব করিতেছিল। নন্দদের সামরিক শক্তির খবর পাইয়া আলেকজান্দারের যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকেরা আর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিল না। আলেকজান্দার তখন ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্যাবিলন নগরে চলিয়া আসেন। ব্যাবিলনেই দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দারের মৃত্যু ঘটে।

আলেকজান্দারের অভিযানের ফলেই প্রাচীন সভ্যতার দুটি কেন্দ্র গ্রীস ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই অভিযানের মাধ্যমেই

সমসাময়িক ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিবার পথের সন্ধান পান। এই পথ ধরিয়াই ক্রমে বিকাশ লাভ করে দুই মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। গ্রীকগণ ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম হইতে শিক্ষা লাভ করেন, আবার ভারতীয়গণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে নব নব জ্ঞান লাভ করেন। আলেকজান্দার ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরীগুলি দীর্ঘকাল টিকিয়াছিল। গ্রীকগণ এই নগরীগুলিতে বাস করিতেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে এই অঞ্চলে কয়েকটি গ্রীক রাজ্য গড়িয়া উঠে। ব্যাক্ট্রিয়ান বা বহ্লীক গ্রীকগণ বেশ শক্তিশালী হইয়াছিল। মৌর্যদের পতনের পবে ইহারা ভারতে অভিযান করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। বহ্লীক গ্রীকদের অভিযানের সময় হইতে গ্রীক সভ্যতার প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার উপর পড়িতে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা ইহা আলোচনা করিব।

অনুশীলনী

১। কিভাবে পারস্য ও গ্রীসের সহিত প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কি?

২। ভারতের ইতিহাসে আলেকজান্দারের আক্রমণের গুরুত্ব কি?

অষ্টম অধ্যায়

যুগসন্ধি

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া কয়েকটি বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান করে এবং এদেশে রাজ্য স্থাপন করে। এই বিদেশী জাতিগুলি হইল—গ্রীক, শক, পহ্লব ও ইউচি। বিদেশী জাতিগুলির ভারতে রাজ্যস্থাপনের এই পর্বটাকে যুগসন্ধি বলা হয়। গ্রীকদের অভিযান হইতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল অর্থাৎ প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় চার শত বৎসর এই যুগ বিস্তৃত।

আফগানিস্থানের উত্তরে ব্যাক্ট্রিয়া বা বহ্লীক দেশ ছিল। এই দেশের গ্রীক রাজা ডিমেট্রিয়স আফগানিস্থান, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর এক বিরাট অংশ জয় করেন। তিনিই প্রথম সুন্দর সুন্দর মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তাঁহার পর এই বংশের গ্রীক রাজা মিনান্দার বর্তমান শিয়ালকোট নগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া পাটলিপুত্র পর্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। মগধের রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তাঁহার গতিরোধ করেন। তক্ষশিলায় আর একজন গ্রীক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম আন্টিয়ালকিডস।

প্রথম খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটে। গ্রীকদের স্থান দখল করে পহ্লব বা পার্থিয়ান এবং ইউচি বা কুষাণ জাতিগুলি।

শকগণ

প্রথম খ্রীষ্টাব্দে যাযাবর শকগণ মধ্য-এশিয়া হইতে আফগানিস্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। শকদের রাজা মোগ (Moga) গান্ধারে এবং অয় (Azes) পাঞ্জাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শকগণ গান্ধার, তক্ষশিলা, মথুরা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। "ক্ষত্রপ" উপাধিধারী শকগণ এই সকল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শকদের মধ্যে উজ্জয়িনীর অধিপতি রুদ্রদামন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সিন্ধু হইতে কোঙ্কন পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মালব, গুজরাট, কাথিয়াবার, কচ্ছ এবং মারবার তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পহ্লবগণ

প্রথম শতাব্দীতে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ জয় করে। তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা গণ্ডোফারনিস পেশোয়ার জয় করিয়াছিলেন।

কুষাণগণ

পহ্লবদের পরে যাযাবর ইউচি জাতি ভারতে অভিযান করে। কুষাণ-গণ ইউচি জাতিরই একটি শাখা। কুষাণদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কণিষ্ক। তিনি সম্ভবতঃ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচারের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

বিদেশীদের উপর ভারতীয় প্রভাব

ভারতের ভিতরে গ্রীক, শক, পহ্লব, ইউচি জাতিগুলি রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহারা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া বস্তুতঃ ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম এবং অন্যান্য গ্রীক রাজারা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুষাণরাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কুষাণ-রাজগণ ভারতীয় নাম পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন বাসুদেব। অর্থাৎ জাতিতে বিদেশী হইলেও, ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে ইহারা ভারতীয়।

ভারত ও গ্রীস : সংস্কৃতির মিলন



বুদ্ধমূর্তি (গান্ধার শিল্প)

এই যুগেই ভারতীয় এবং গ্রীক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল। গ্রীকদের মূর্তি তৈয়ারীর ঢং ভারতীয় শিল্পীদের প্রভাবিত করিয়াছিল। শিল্পের

এই নূতন ধারা "গান্ধার শিল্প" নামে অভিহিত। "গান্ধার শিল্প" বলিতে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণ বুঝায়। বুদ্ধমূর্তি কিংবা জাতকের গল্প গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্তু। গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলির নিখুঁত চোখ, মুখ, হাতের পেশী, ইত্যাদি। গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বহু বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি গান্ধার, তক্ষশিলা, আফগানিস্থান এবং সীমান্ত প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে।

এই যুগেই প্রথম বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়। ইতিপূর্বে মূর্তিরূপে বুদ্ধের পূজার নিয়ম ছিল না।

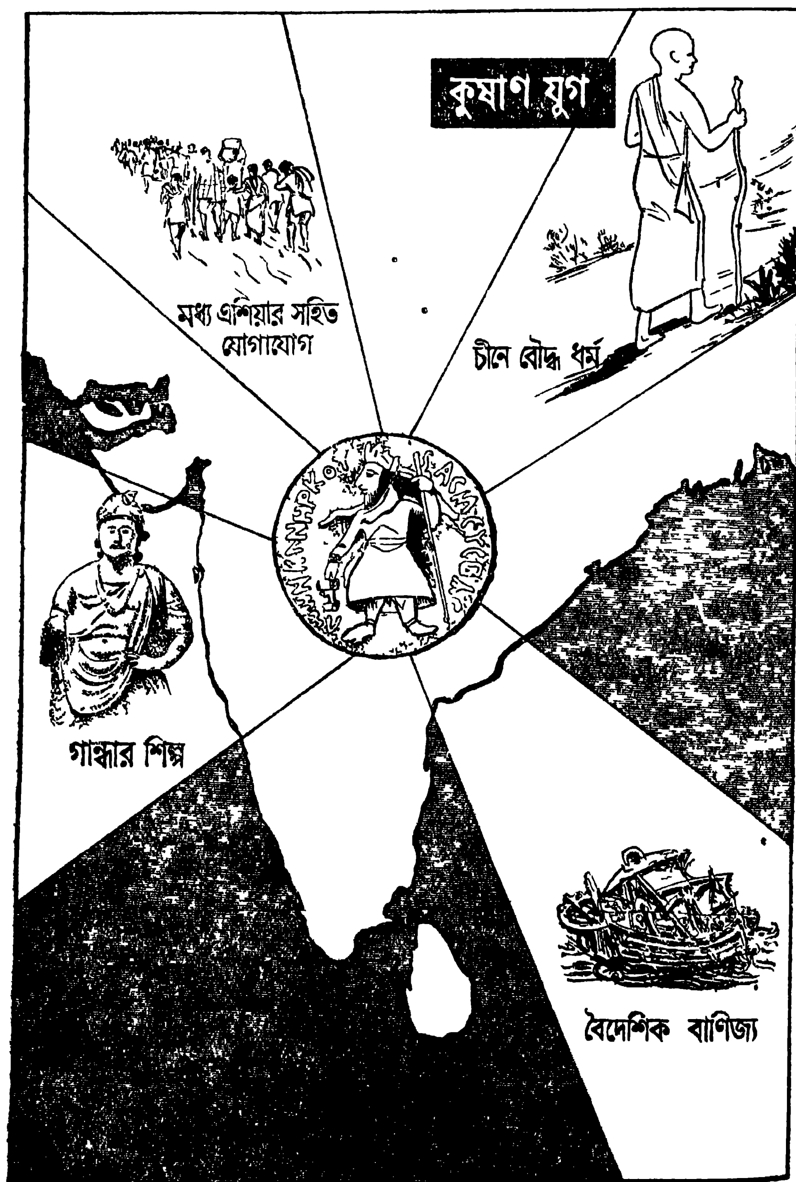
ভারত ও রোম

রোমের সহিতও ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সম্রাটগণ যে স্বুবর্ণ মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন, উহার অনুকরণে ভারতেও নূতন নূতন মুদ্রা চালু হইয়াছিল। এই মুদ্রাগুলি খুবই সুন্দর।

প্রথম খ্রীষ্টাব্দে ভারত এবং রোমের সহিত বড় রকমের বাণিজ্য চলিত। ভারতের মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, হাতীর দাঁত, মসলিন এবং অন্যান্য বস্ত্র রোমের বাজারে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। রোম হইতে আসিত তামা, টিন, কাচ, প্রবাল ইত্যাদি। বাণিজ্যে কিন্তু ভারতের লাভ হইত বেশী। রোমের সোনা আসিয়া ভারতে জমা হইত। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন: "আমাদের সাম্রাজ্য হইতে লক্ষ লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা সৌখিন দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতে চলিয়া যাইতেছে।" দক্ষিণ ভারতে বহু রোমান স্বুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ভারত ও চীন

এই যুগে ভারতে এবং চীনের সহিতও যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ভিক্ষু কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম চীনে ছড়াইয়া পড়ে এবং দুই দেশের মধ্যে


কুষাণ যুগ
মধ্য এশিয়ার সহিত
যোগাযোগ
চীনে বৌদ্ধ ধর্ম
গান্ধার শিল্প
বৈদেশিক বাণিজ্য

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চীন হইতে পণ্ডিতগণ ভারতে এবং ভারত হইতে পণ্ডিতগণ চীনে যাতায়াত করিতে থাকেন। ইহা এক অভিনব বাণিজ্য—"Commerce of Scholars"।

চীন এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় সওদাগরগণ চীনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "চীনপত্তম" বা চীনা রেশমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম

এই যুগে বৌদ্ধধর্মেরও বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বিদেশী যে সমস্ত রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথম মূর্তিরূপে বুদ্ধের পূজা সুরু করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে মূর্তিরূপে বুদ্ধের পূজার রীতি ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্ম উহার সরলতা হারাইয়া ফেলে। বৌদ্ধধর্মের এই অবস্থা "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম, আর আদি বৌদ্ধধর্ম "হীনযান" নামে অভিহিত।

এই যুগে "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হয়। মধ্য-এশিয়া এবং চীনে এই ধর্ম ছড়াইয়া পড়ে। কণিষ্ক অশোকের মত অনেকগুলি মঠ এবং স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। রাজধানী পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর এক বিরাট চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতি

এই যুগ ভারতীয় সংস্কৃতিরও উন্নতির যুগ। কণিষ্কের রাজসভায় অবস্থান করিতেন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, "বুদ্ধ-চরিত"-প্রণেতা কবি অশ্বঘোষ, "আয়ুর্বেদশাস্ত্র"-প্রণেতা চরক ইত্যাদি।

মৌর্য যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতির ধারা এই যুগে থামিয়া যায় নাই, উহা বহিয়া চলিয়াছে প্রবহমান স্রোতের মত। সংস্কৃতির

পরিবর্তন ঘটিয়াছে, নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে, যথা—"মহাযান" বৌদ্ধধর্ম; "গান্ধার শিল্প"। ভারতের ইতিহাসে তাই কুষাণ যুগের গুরুত্ব খুব বেশী।

অনুশীলনী

১। বিদেশী জাতিগুলির প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃতির উপর পড়িয়াছিল কি? দৃষ্টান্তদ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

২। বিদেশী জাতিদের শাসনের যুগের বৈশিষ্ট্য কি?

৩। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস, রোম ও চীনের সহিত ভারতের সম্পর্কের বিবরণ দাও।

৪। গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কুষাণ যুগে কি কি পরিবর্তন লক্ষিত হয়?

নবম অধ্যায়

গুপ্ত যুগ

কুষাণদের পতনের পর উত্তর ও পূর্ব ভারতে মহাপরাক্রান্ত গুপ্তদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গুপ্ত যুগে ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মগধকে কেন্দ্র করিয়া আবার এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। একই রাষ্ট্রের অধীনে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল ছিল প্রসিদ্ধ নগরী পাটলিপুত্র। গুপ্ত যুগেই বিদেশী জাতিদের শাসনের অবসান ঘটে।

সাম্রাজ্যের সীমা

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল: গঙ্গা এবং চম্বল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলি, সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ এবং নেপাল, পশ্চিমে বলভী রাজ্য। নর্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে কিন্তু এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলি স্বাধীন ছিল।



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

ফা-হিয়েনের বিবরণ

বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চীন দেশ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, বারাণসী, কপিলবস্তু, পাটলিপুত্র, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন ঃ "মধ্য দেশের মানুষ সম্পদশালী এবং সুখী। সরকারী কর্মচারীগণ তাহাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। যাহারা রাজার জমিতে চাষবাস করেন তাহাদের ভূমিরাজস্ব দিতে হয়। রাজারা মৃত্যুদণ্ড দেন না, অপরাধীদের জরিমানা দিতে হয়। এমন কি গভীর ষড়যন্ত্র করিবার জন্য যাহারা অভিযুক্ত হয়, তাহাদেরও কেবল ডান হাত কর্তন করা হয়। এই দেশের উচ্চবর্ণের মানুষ প্রাণিহত্যা করে না, কিংবা মদ বা পেঁয়াজ স্পর্শ করে না। চণ্ডালেরা সমাজে অচ্ছুৎ। স্বতন্ত্র এলেকায় তাহাদের বাস। নগরের পথে বা হাটে-বাজারে যাইবার সময় ইহাদের গলায় কাষ্ঠখণ্ড ঝুলাইয়া রাখিতে হয়, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে ইহারা চণ্ডাল।"

ফা-হিয়েন মৌর্যদের রাজধানী পাটলিপুত্রের বিবরণ দিয়াছেন ঃ "মগধে পাটলিপুত্র অবস্থিত। পাটলিপুত্র অশোকের রাজধানী। নগরীর রাজপ্রাসাদগুলি দৈত্য-দানবেরা নির্মাণ করিয়াছিল। দেওয়ালগুলি পাথরের। দেওয়ালের নকসা এবং কারুকার্য মানুষের হাতের তৈরী নয়। ইহাদের ধ্বংসস্তূপ এখনও দেখা যায়। নগরীতে মহাযান এবং হীনযান সংঘ আছে। এই দুটি সংঘে প্রায় সাত হাজার ভিক্ষুর বাস। ভিক্ষুদের ব্যবহার ভদ্র এবং সুশৃঙ্খল।

"মধ্যদেশের বৃহত্তম নগরী পাটলিপুত্র। জনসাধারণ ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী। প্রতি বৎসর তাহারা রথযাত্রা উৎসব পালন করে।

রথের মধ্যে থাকে বুদ্ধমূর্তি, উহার পাশে বোধিসত্ত্বদের মূর্তি। রথযাত্রার দিন সাধু এবং সাধারণ মানুষ সমবেত হয়, নাচে, গান করে, ফুল এবং ধূপ ছড়ায়। সারা রাত্রি প্রদীপ জ্বলে।

"বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষেরা নগরীতে দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছে। এই হাসপাতালগুলিতে দরিদ্র, গৃহহীন, বিকলাঙ্গ এবং রোগীরা যাইতে পারে। এখানে তাহাদের সকল অভাব পূরণ করা হয়, ডাক্তারেরা ঔষধ এবং পথ্যের বিধান দেন। রোগমুক্তির পরে তাহারা চলিয়া যাইতে পারে।

সমুদ্রতীরবর্তী তাম্রলিপ্তি বন্দরে পোঁছিয়া ফা-হিয়েন বাইশটি বৌদ্ধ সংঘ দেখিতে পান। সংঘগুলিতে ভিক্ষুরা বাস করিতেন। দুই বৎসর এখানে বাস করিবার পর তিনি একটি জাহাজে চাপিয়া সাগরপাড়ি দেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে আমরা গুপ্তযুগ সম্পর্কে কি জানিতে পারি?

হিন্দু সমাজে তখন জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ-বর্ণের লোক এবং চণ্ডালদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজে চণ্ডালদের স্থান খুব নীচে। বৌদ্ধ ধর্ম তখনও অবলুপ্ত হয় নাই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ সংঘ ছিল, ভিক্ষুরা সংঘে বাস করিতেন। তবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিরাট রূপান্তর আসিয়াছিল। বুদ্ধমূর্তির পূজা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের "মহাযান" মতই প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়।

ধর্ম

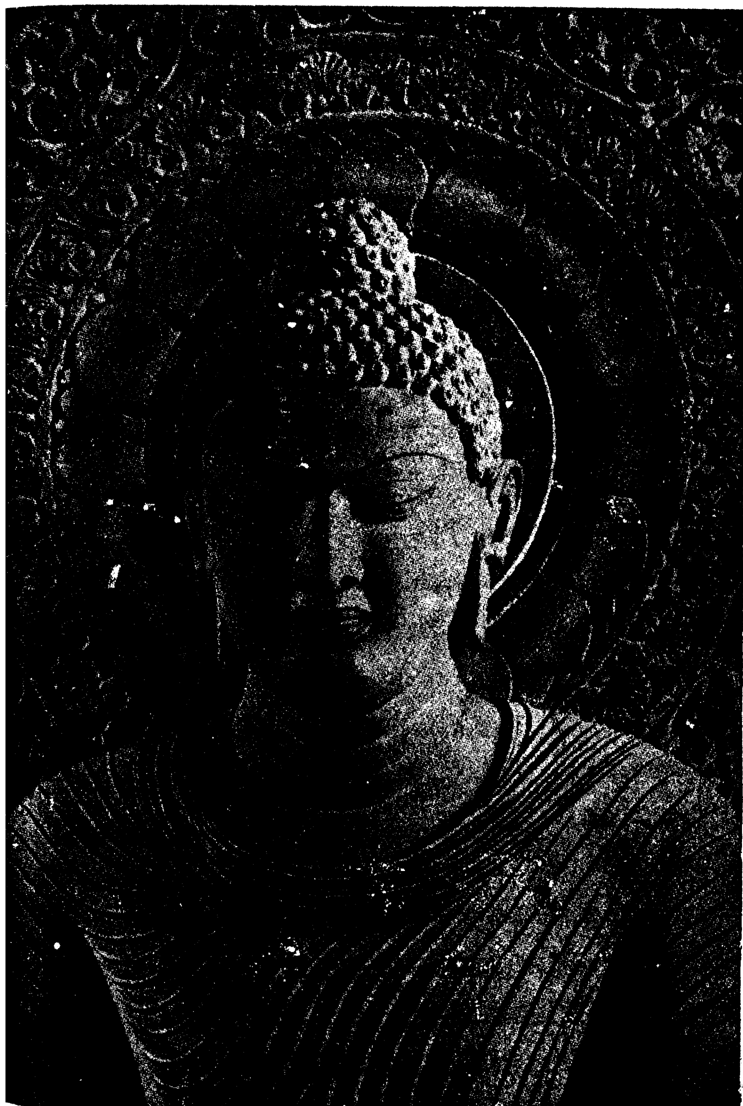
ধর্মের ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। গুপ্ত সম্রাটগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপাসক। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে স্বভাবতঃই ব্রাহ্মণ্যধর্ম দেশে প্রাধান্য লাভ করে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিযোগিতার সামনে বৌদ্ধধর্ম হার মানে। বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়,

সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে, ভক্তির সঙ্গে দেবদেবীর আরাধনা প্রয়োজন—এই বিশ্বাস হইতে লোকে শিব, বিষ্ণু, কার্তিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতে থাকে। মৌর্যদের পতনের পরে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সময় হইতে মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে এবং গুপ্তযুগে উহা প্রাধান্য লাভ করে। গুপ্তযুগকে তাই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাধান্যের যুগ বলা যায়। হিন্দুদের সামাজিক ব্যবহার এবং আইনকানুন লিপিবদ্ধ করিয়া "স্মৃতি" শাস্ত্র প্রধানতঃ এই যুগেই লিখিত হইয়াছিল। সমাজে জাতিভেদপ্রথাও কঠোর হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত যে হিন্দুধর্মের সহিত আমরা পরিচিত, উহার সুদৃঢ় ভিত্তি এই যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্র-গুলি সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত।

গুপ্তযুগে সংস্কৃতে সাহিত্যের বিরাট উন্নতি সাধন করিয়াছেন কালিদাস। কালিদাস একজন মহাকবি। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্", "রঘুবংশম্", "কুমারসম্ভবম্", "মেঘদূতম্" প্রভৃতি নাটক এবং কাব্য লিখিয়া তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এই যুগে আরও দুটি বিখ্যাত নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল—বিশাখদত্তের "মুদ্রারাক্ষস" এবং শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক"। রামায়ণ ও মহাভারত রচনা গুপ্তযুগেই শেষ হইয়াছিল। ইতিপূর্বে এই দুটি মহাকাব্যের অনেক অদলবদল ঘটিয়াছিল; কিন্তু গুপ্তযুগের পরে ইহার আর কোন পরিবর্তন হয় নাই।



বুদ্ধমূর্তি

শিল্পকলা

গুপ্তযুগের শিল্পকলা ভারতের গৌরব। গুপ্তযুগের মূর্তিগুলি ভাবের ব্যঞ্জনায় এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তামা, ব্রোঞ্জ এবং পাথরের যে সকল



অজন্তার চিত্র 'মাতা ও পুত্র'

বুদ্ধমূর্তি সারনাথ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সৌন্দর্যে সেগুলি শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর মূর্তি, যথা—শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির মূর্তিও নির্মিত হইয়াছিল।

শুধু মূর্তি-গড়াতেই নয়, চিত্রশিল্পেও এই যুগ স্মরণীয় হইয়া আছে। অজন্তার বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীরচিত্রগুলি, যথা—"বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি", "মাতা ও পুত্র", "চারিটি হরিণ" প্রভৃতি চিত্রশিল্পের অসাধারণ উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। পাহাড়ের গুহা কাটিয়া মঠ তৈয়ার করিয়া শিল্পিগণ উহার দেওয়াল ও ছাদে ছবিগুলি আঁকিয়া রাখিয়াছেন। গেরুয়া, সবুজ, নীল, পীত ও পিঙল বর্ণে আঁকা এই চিত্রগুলি আজও ঝলমল করে।

বিজ্ঞান চর্চা

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহির বিজ্ঞান-সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর্যভট্ট গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ। তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে এবং পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই দিবারাত্রি-ভেদ হয়। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণও জানিতেন। আর্যভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্তই আধুনিক পাটীগণিতের স্রষ্টা। তাঁহারাই প্রথম ১ হইতে ৯ এবং '০' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গুণিবার এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হইলে পাটীগণিতের কি করিয়া সৃষ্টি হইত? বরাহমিহির ভারতবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তাঁহার "বৃহৎ সংহিতায়" ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ আছে।

রাষ্ট্র

গুপ্তযুগের রাষ্ট্রেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, গণতন্ত্র নয়। রাজাই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। রাজাকে আবার ভগবানের প্রতিভূরূপে কল্পনা করা হইত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজা মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি এবং একদল কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব। উৎপন্ন শস্যের এক

অংশ ভূমি-রাজস্ব দিতে হইত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়া আরও কর দিতে হইত ; যথা—বন্দরের কর, পারাপারের জন্য খেয়াঘাটের কর ইত্যাদি।

গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন "ভুক্তি" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল "ভুক্তি" আবার "বিষয়" বা "মণ্ডলে" বিভক্ত ছিল। উপরিক বিষয়পতি, মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি রাজকর্মচারী এইগুলি শাসন করিতেন।

গুপ্তযুগ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্তযুগ "স্বুবর্ণ যুগ" বলিয়া অভিহিত হয়। এই যুগে ভারত সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চায় যে বিরাট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুগ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রশ্নগুলি এইরকম :

(ক) ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যের ফলে ভারতের কি কল্যাণ হইয়াছে ? ব্রাহ্মণ্যধর্ম কি সমাজকে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে, না উহাকে [illegible]নে টানিয়াছে ? জাতিভেদপ্রথা, চণ্ডালদের অচ্ছুৎ মনে করা কি সমাজের পক্ষে শুভ ?

(খ) সংস্কৃত ভাষা কি জনসাধারণ ও শাসকদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই ? অশোক কিন্তু ব্যবহার করিয়াছিলেন সহজ, সরল প্রাকৃত ভাষা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'পালি' ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

(গ) গুপ্তযুগের উন্নত শিল্প ও সংস্কৃতি কি গুপ্তযুগেরই সৃষ্টি ? ইতিপূর্বে মৌর্য ও কুষাণ যুগে সংস্কৃতি ও শিল্পের উন্নতির যে ধারা বহিয়া চলিয়াছিল, উহাকে ভিত্তি করিয়াই কি গুপ্তযুগে শিল্প ও সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করে নাই ?

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

পঞ্চম শতকে মধ্য-এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণজাতি আফগানিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ভারতের বুকে অভিযান সুরু করে। গুপ্ত-সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে আবার হূণদের আক্রমণ সুরু হইল। বার বার হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতে হূণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজশক্তি দুর্বল হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশগুলির শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব সুরু করিলেন। এই সব দেশে ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হইল। পরবর্তী গুপ্তরাজগণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের গতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল।

হর্ষবর্ধনের যুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় এক শত বৎসর পরে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে আবার এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমা পূর্ব পাঞ্জাব হইতে বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে তিনি নর্মদা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য পুনরায় ছিন্ন হইয়া যায়; ইহার পরে উত্তর ভারতে রাজপুতগণ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণী

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আর একজন চীনা পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হিউয়েন সাঙ্। ফা-হিয়েনের মত তিনিও একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন,

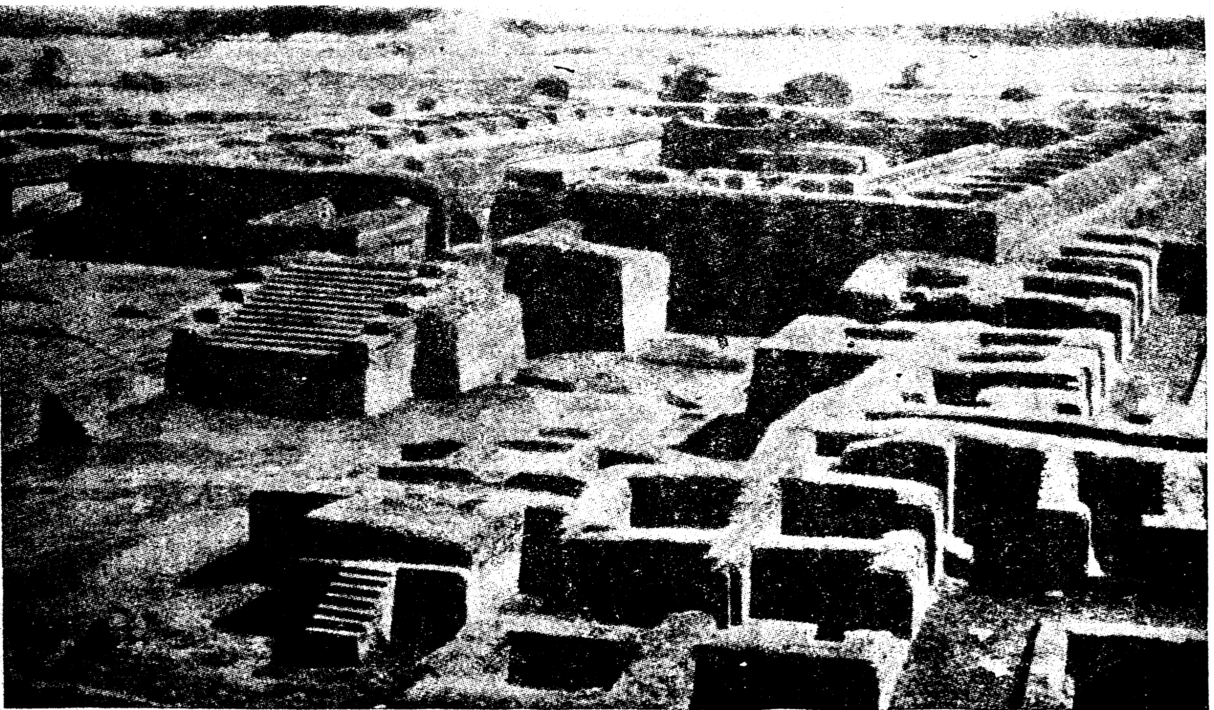
যাহা পড়িয়া আমরা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের কথা জানিতে পারি।

হিউয়েন সাঙ্ লিখিয়াছেন ঃ দেশে অনেক সমৃদ্ধ নগরী ও গ্রাম। রাজধানী কনৌজ প্রাসাদ, মঠ ও মন্দির, উদ্যান ও দীঘিতে সুশোভিত এক নগরী। রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগরীগুলির তখন ভগ্নদশা। সম্ভবতঃ হূণ আক্রমণের ফলেই এই নগরীগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।



হিউয়েন সাঙ্

ভারতের জনসাধারণ সৎ এবং সম্মানার্হ। আচার-ব্যবহারে তাহারা ভদ্র ও বিনয়ী। দেশে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল। পাটলিপুত্রের দক্ষিণে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শত বক্তৃতাগৃহ ছিল এবং দশ হাজার ছাত্র ও বৌদ্ধ সাধু এখানে বাস করিতেন। ছাত্রদের থাকিবার জন্য সুন্দর ঘর ছিল। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত না।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

ফা-হিয়েনের মত হিউয়েন সাঙ্ ও তাম্রলিপ্তি বন্দরের এক বিবরণ দিয়াছেন। ফা-হিয়েনের মত তিনিও এই বন্দরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তি তখনও ছিল ভারতের এক বর্ধিষ্ণু বন্দর। হিউয়েন সাঙ্ লিখিয়াছেন—"নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিরত্ন ইত্যাদির প্রচুর সমাগম হয় এই বন্দরে। তাই তাম্রলিপ্তির লোকেরা বিত্তবান।"

ধর্ম

গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, হর্ষবর্ধনের যুগে উহা অক্ষুণ্ণ ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইলেও হর্ষ শিবের উপাসক বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। দেশে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকও ছিল, তবে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমিয়া গিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। গুপ্তযুগে ভারতীয় সমাজে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল?

২। গুপ্তযুগকে কেন 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়?

৩। গুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের যুগের প্রধান প্রধান নগরীগুলির নাম ও বিবরণ দাও।

৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা দাও।

৫। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ্ তাম্রলিপ্তি বন্দরের কি বিবরণ দিয়াছেন? এই বন্দর কোথায় অবস্থিত ছিল? ইহার সমৃদ্ধির কারণ কি?

৬। হূণগণ কোথা হইতে আসিয়াছিল? তাঁহাদের আক্রমণের ফলাফল কি?

দশম অধ্যায়

প্রাচীন যুগে বাংলা

আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলিতে মৌর্য, গুপ্ত এবং হর্ষবধনের যুগে উত্তর ভারতের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি। এই সকল পর্বে বাংলা দেশের সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন ঘটিতেছিল।

মৌর্য ও গুপ্তযুগে বাংলা

প্রাচীন কালে বঙ্গ বা বঙ্গাল বলিতে যে জায়গা বুঝাইত, তাহা আজিকার বাংলার একটা অংশ মাত্র। সে যুগে বাংলা দেশ কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল ; যথা—

বঙ্গ=মধ্য এবং পূর্ববঙ্গ।

গৌড়=মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কোন কোন অঞ্চল।

পুণ্ড্র=বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেলা।

রাঢ়=ভাগীরথীর পশ্চিম পারের দেশগুলি—হুগলী, হাওড়া, বীরভূম ও বর্ধমানের দক্ষিণাংশ।

মৌর্য যুগে পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গুপ্তযুগে বাংলার প্রায় সমস্ত জনপদই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব।

শশাঙ্ক

ইহার পরে আসে হর্ষবর্ধনের যুগ। এই যুগে গৌড়ের স্বাধীন রাজা রূপে শশাঙ্কের আবির্ভাব হয়। কর্ণসুবর্ণ বা বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। এই কীর্তিমান নরপতি দীর্ঘকাল

পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। স্বয়ং হর্ষবর্ধন তাঁহার গৌড়-রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই।

পালবংশ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাঁহার গৌড়রাজ্য তছনছ হইয়া যায়। সপ্তম হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি প্রায় একশত বৎসর সারা দেশ জুড়িয়া দারুণ অরাজকতা চলে। বাংলা দেশের ইতিহাসে এই সময় 'মাৎস্যন্যায়ের শতবর্ষ' নামে অভিহিত। বাংলার এই দুর্দিনে দেশেব প্রধান ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করেন। এই গোপালই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোপালের পুত্র ধর্মপাল পালবংশেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাজা। প্রসিদ্ধ নগরী পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মপাল পূর্ব-ভারতের লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ধর্মপালের পরে তাঁহার পুত্র দেবপাল রাজা হন। কথিত আছে যে, তিনি উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ রাজ্য এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাল রাজ্যের সীমা সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। দেবপালের মৃত্যুব পরে পালরাজ্যে আস্তে আস্তে ভাঙন ধরিতে আরম্ভ করে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে মহীপাল পালরাজাদের লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় নাই। পালরাজ্য ক্রমশঃ ভাঙনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া এক নূতন বংশ বাংলায় প্রাধান্য বিস্তার করে, ইহাই সেনবংশ।

সুদীর্ঘ চারশত বৎসর পালরাজগণ বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নগরী শেষ বারের মত উহার পুরানো গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছিল। মৌর্য এবং গুপ্ত সম্রাটদের মত পাল রাজারাও আর্যাবর্তে পূর্ব ভারতের গরিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সেনবংশ

সেনবংশের পূর্বপুরুষেরা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। ইহারা ব্রাহ্মণ, যদিও বাংলা দেশে ইহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। সেনদের কেহ কেহ রাঢ় অঞ্চলে বসবাস করিতেন। সামন্তসেনের অধিনায়কত্বে সেনগণ রাঢ় অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন। তিনি রাঢ়দেশে একজন প্রতিপত্তিশালী সামন্ত ছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়সেন পালবংশের ভগ্নদশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের পাল রাজাকে পরাজিত করিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁহার সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্রী এবং মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত হয়। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ষাট বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১২০০ সালে মহম্মদ ঘুরীর তুর্কী অনুচর ইখতিয়ারউদ্দীন খলজী অতর্কিতে "নূদিয়ার" রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণসেন রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিলেন। তাহার পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন কিছুকাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

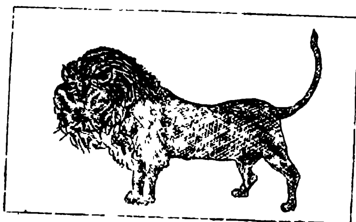
আর্য এবং অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণ

বাংলা দেশ দীর্ঘকাল আর্য ধর্মের বা বৈদিক ধর্মের আওতার বাহিরে ছিল। অনার্য ধর্ম, অনার্য রীতিনীতি বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে আর্য ধর্মের স্রোত বাংলা দেশে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ-কথা, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি সেই স্রোতের মুখে বাংলায় ভাসিয়া আসিল

অনার্য প্রভাব



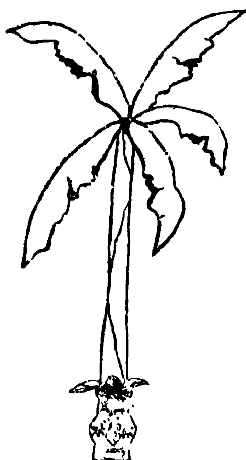






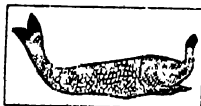


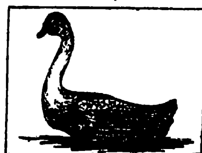












কিন্তু লৌকিক ধর্ম, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল না। আর্য ধর্মের সহিত অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণের এক নূতন পর্ব সুরু হইল। শত শত বৎসর ধরিয়া এই সংমিশ্রণের ধারা চলিতে থাকিল এবং আর্য ও অনার্য ধর্ম মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। নানা দেবীর পূজা, পরলোকে বিশ্বাস, প্রেততত্ত্ব, পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান ইত্যাদি যাহা বাঙালীর ধর্মে স্থান পাইয়াছে, ইহাদের অনেক কিছুরই মূলে আছে অনার্য ধর্মের প্রভাব।

বাংলার অনার্য আদিম অধিবাসীরা গ্রাম-দেবতার পূজা করিতেন। এই গ্রাম-দেবতারাই শীতলা, মনসা, বনদুর্গা, ষষ্ঠী, শ্মশানচারী কালী ইত্যাদি। হিন্দুধর্মে কালক্রমে এই সকল গ্রাম-দেবতা স্থান পাইয়াছেন। আদিম অধিবাসীরা বিশেষ বিশেষ পশু বা পাখী পতাকায় অঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ কৌম বা গোষ্ঠীর (tribe) পরিচয় দিতেন। কালক্রমে এই সকল পশুপক্ষীও হিন্দু দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় স্থান পাইয়াছে; যথা—

সিংহ	...	দুর্গার বাহন
ময়ূর	...	কার্তিকের বাহন
প্যাঁচা	...	লক্ষ্মীর বাহন
হাঁস	...	সরস্বতীর বাহন
মকর	...	গঙ্গার বাহন

অনার্যরা গাছ-পাথরের পূজা করিত। আজও আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, রাজবংশীদের মধ্যে এই পূজা প্রচলিত। হিন্দুধর্মে ইহারও ছাপ পড়িয়াছে; যথা—

শুভ কাজে	...	আম্রপল্লবের ঘট
ব্রতে	...	ধানের ছড়া

পূজায়	...	ধান, দূর্বা, পান, সুপারি
উৎসব অনুষ্ঠানে	...	কলাগাছ

বৌদ্ধধর্ম

প্রাচীন যুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মেব বিস্তার ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ্ তাম্রলিপ্তিতে (বর্তমান তমলুক) বৌদ্ধ বিহাব এবং ভিক্ষুদের অবস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পাল বাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। স্বভাবতঃই এই যুগে বৌদ্ধধর্ম, দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে ইহা "মহাযান" বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত "মহাযান" বৌদ্ধধর্মেব বিশেষ পার্থক্য নাই। পালযুগে দেশেব বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহাব নির্মিত হইয়াছিল। দশম শতকে বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মেব এক নূতন রূপ দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ধ্যান-ধাবণার ছোঁয়াচ লাগিল। ফলে নানা গুহ্য মন্ত্র, "ধারণী" ইত্যাদি এই ধর্মে প্রবেশ করিল। 'বৌদ্ধ-ধর্মের এই অবস্থা "মন্ত্রযান", "বজ্রযান", সহজযান" প্রভৃতি নামে পরিচিত। বাংলা দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবী ছিলেন; যথা—অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, তাবা, মঞ্জুশ্রী, হেরুক, হেবজ্র ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম

গুপ্তযুগ ইহতেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। সেন রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন ব্রত, পূজাপার্বণ ইত্যাদি দ্রুত বাড়িয়া চলে। আচমন, স্নান, তর্পণ, আহ্নিক, অশৌচ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত হয়। বাংলার প্রসিদ্ধ কৌলীন্য-প্রথাও এই যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল।

সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশে বার মাসে নানারকম ব্রত-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইত। উৎসবের মধ্যে প্রধান ছিল দুর্গাপূজা। দোল ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষেও উৎসব হইত। মেয়েরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের স্নান, অসংখ্য ব্রত-পার্বণে অভ্যস্ত ছিলেন।

রাজরাজড়াদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। মেয়েদের মধ্যে পর্দা-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। পর্দার আড়ালে বসিয়া মেয়েরা অচেনা মানুষের সহিত আলাপ করিতেন।

জনবসতি হইতে দূরে পাহাড়ের উপরে ছিল শবর-শবরীদের বাস। ডোম, নিষাদদের বাস ছিল গ্রামের বাহিরে। জাতিভেদ প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য ছিলঃ ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ, ছাগ ও হরিণের মাংস, দই, মিষ্ট, পিঠা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

নদীমাতৃক দেশ বাংলা প্রাচীন যুগ হইতেই শস্যশ্যামলা। হিউয়েন সাঙ্ কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তির ফলফুলের প্রাচুর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ছিল—ধান, আম, নারিকেল, পান, সুপারি ইত্যাদি। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সমৃদ্ধ। বাংলার মসলিন বিদেশে রপ্তানি হইত। কারিগরগণ সোনারূপার নানা অলঙ্কার এবং থালা-বাসন নির্মাণ করিতেন।

প্রাচীন যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি। হিউয়েন সাঙ্ লিখিয়াছেন—নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিরত্ন ইত্যাদির প্রচুর সমাগম হইত তাম্রলিপ্তিতে। বাংলার সওদাগরগণ তাম্রলিপ্তি

হইতে জাহাজ ভাসাইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেন জাভা, সুমাত্রা, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে।

সাহিত্য

নবম-দশম শতকে পালযুগে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে "চর্যাচর্য বিনিশ্চয়" নামে যে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে আছে প্রাচীন বাংলা ভাষার নমুনা। চর্যাপদ বা "চর্যাগীতি" হইল বৌদ্ধদের সাধন-ভজনের গান। চর্যাগীতির রচয়িতারা সকলেই বাঙ্গালী। এই যুগেই "ময়নামতীর গান" নামে একখানি কাব্য রচিত হইয়াছিল।

আর্যধর্মের সহিত আর্য ভাষা সংস্কৃতও বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। অবশ্য সংস্কৃত ছিল উচ্চবর্ণের ভাষা, জনসাধারণের ভাষা নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে নানা কাব্য বাঙ্গালীরা রচনা করিয়াছিলেন। পালযুগের একজন কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" নামে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় অবস্থান করিতেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অমর কাব্য "গীতগোবিন্দ"। ধোয়ী রচনা করিয়াছিলেন "পবনদূত" কাব্য। সেনরাজ বল্লালসেন স্বয়ং "দানসাগর" এবং "অদ্ভুতসাগর" নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। "অদ্ভুতসাগর" গ্রন্থে গ্রহ, তারা, রামধনু, বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতির আলোচনা আছে। লক্ষ্মণসেনের আমলের বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ পাঁচটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' এবং 'পণ্ডিতসর্বস্ব'।

সে যুগের পণ্ডিত এবং কবিগণ সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন, সংস্কৃতের চর্চাই তাঁহারা করিতেন—বাংলা নয়। আর্য ধর্মের সহিত আর্য ভাষা সংস্কৃত দেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাংলার তখন তেমন আদর ছিল না। বাংলা ভাষার উন্নতি ও চর্চা সুরু হইয়াছিল আরও অনেক পরে—তুর্কী এবং মোগল যুগে।

শিল্প

ধর্মসাধনার কেন্দ্র স্তূপ, বিহার এবং মন্দির সেকালে নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এইগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ইহাদের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ



প্রাচীন বাংলার বিষ্ণু মূর্তি

আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইগুলিই সে যুগের বাংলার শিল্পের নিদর্শন।

খনন-কার্যের ফলে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোমপুরী বিহারের মত বৃহৎ বিহার ভারতের কোথায়ও আবিষ্কৃত হয় নাই। বিহারটি তিনতলা, তিনতলার উপরে শিখরাকৃতি চূড়া। বিহারের চারিদিকে ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য ১৭৭টি ঘর। বিহারের দেওয়ালে পোড়ামাটির কাজ। পোড়ামাটির ফলকে মানুষের আট-পৌরে জীবন রূপায়িত; যথা—নৃত্যরত মেয়েপুরুষ, ভিক্ষুক, মানুষের উদয়াস্ত খাটাখাটুনি ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সে যুগের বাংলার মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন—বর্ধমানের দেউলি গ্রামে ইটের তৈরী মন্দির, বাঁকুড়া জেলার সিদ্ধেশ্বর মন্দির, সুন্দরবনের "জটার দেউল" ইত্যাদি।

বিহার ও মন্দির ছাড়া পোড়ামাটির ফলক, কষ্টিপাথরে তৈরী মূর্তি, সোনারূপার তৈরী দু-একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সে যুগের দুজন কীর্তিমান শিল্পীর নামও জানা গিয়াছে—ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিটপাল। ইহারা খোদাইয়ের কাজ এবং ধাতব মূর্তিনির্মাণে খুবই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

ঘটনাপঞ্জী

শশাঙ্ক	৬৩৭—৩৮
মাৎস্য ন্যায়ের শতবর্ষ	৬৫০—৭৫০

পালবংশের প্রতিষ্ঠা—গোপাল	...	৭৫০	"
সেনবংশের প্রতিষ্ঠা	...	১০৫০	"
ইখ্‌তিয়ার উদ্দীনের বঙ্গবিজয়	...	১২০০	"

অনুশীলনী

১। বাংলার ধর্মজীবনে অনার্য প্রভাব বর্ণনা কর।

২। পশুপক্ষী হিন্দু দেবদেবীর বাহন হইল কিভাবে এবং কেন?

৩। কোন্ সময় বাংলার আর্য স্রোত পৌঁছিয়াছে? উহার ফলাফল কি?

৪। পাল-সেন যুগে বাংলার সমাজজীবনের সহিত আজিকার সমাজজীবনের তুলনা কর।

৫। প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

একাদশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারত

মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দক্ষিণ ভারতে তাহা ঘটে নাই। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস কয়েকটি স্বতন্ত্র রাজবংশের ইতিহাস।

সাতবাহনগণ

মৌর্যদের পতনের পরে কৃষ্ণা-গোদাবরী-বিধৌত তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলে সাতবাহন বা অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের উত্থান হইয়াছিল। গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠানে (আধুনিক পৈঠান) তাহাদের রাজধানী ছিল। সাতবাহনদের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন প্রথম সাতকর্ণি। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি শক, যবন (গ্রীক) এবং পহ্লব (পার্থিয়ান) প্রভৃতি বিদেশী জাতিদের পরাজিত করিয়া উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত সাতবাহন সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করিয়াছিলেন।

পল্লবগণ

সাতবাহনের পতনের পরে দ্রাবিড়ভূমি বলিয়া বর্ণিত সুদূর দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবগণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বাতাপির চালুক্যদের সহিত পল্লবদের সংঘর্ষ সুরু হয় এবং বংশপরম্পরায় উভয় শক্তির মধ্যে যে যুদ্ধ চলে উহার ফলে পল্লবগণ দুর্বল হইয়া পড়ে। নবম খ্রীষ্টাব্দে চোলগণ পল্লবরাজ্য অধিকার করে।

চালুক্যগণ

ষষ্ঠ শতকে বাতাপিকে (বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামি) কেন্দ্র করিয়া চালুক্যবংশ শক্তিশালী হইয়াছিল। চালুক্যগণ ছিলেন পল্লবদের প্রতিদ্বন্দ্বী। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী গুজরাট, মালব, কোঙ্কন এবং মহীশূরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি হর্ষবর্ধনের দক্ষিণ ভারতে অভিযান প্রতিহত করিয়া চালুক্যরাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

রাষ্ট্রকূটগণ

আনুমানিক ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যবংশের পতন ঘটাইয়া দন্তিদুর্গ নামে রাষ্ট্রকূটবংশের এক নেতা কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র জুড়িয়া রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যে স্থিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য উত্তরে গুজরাট হইতে দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই যুগের একজন আরব লেখক লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে রাজা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী; যথা—রাষ্ট্রকূটের রাজা, চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট। আরব বণিকদের সহিত রাষ্ট্রকূট রাজাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

চোল সাম্রাজ্য

চোলগণ তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনপলি অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। পল্লবদের পতনের পরে চোলগণ ক্রমশঃ সুদূর দক্ষিণ ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। চোলবংশের বিখ্যাত রাজা রাজরাজ দশম শতাব্দীতে কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরে কলিঙ্গ হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল চোলবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। বর্তমানের প্রায় সমগ্র মাদ্রাজ বিভাগ



দক্ষিণ ভারত

তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এক নৌবাহিনী গঠন করিয়া সিংহল, নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি মালয়ের কিছু অংশও জয় করিয়াছিলেন।

কল্যাণীর চালুক্যবংশের সহিত সংঘর্ষের ফলে চোলগণ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়েন। চোল রাজ্যের দক্ষিণাংশ পাণ্ড্যগণ অধিকার করে। অন্যান্য অংশের আধিপত্য লইয়া কাকতীয় এবং হোয়সলগণের মধ্যে বিবাদ বাধে।

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কি? দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই—

(ক) দক্ষিণ ভারতে একটি রাজবংশকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই;

(খ) পল্লবগণ, চালুক্যগণ, রাষ্ট্রকূটগণ, চোলগণ দক্ষিণ ভারতের বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া রাজ্য স্থাপন করিলেও উহা স্থায়ী হয় নাই;

(গ) চোল সাম্রাজ্যের পতনের পরে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থায় তুর্কী মুসলমানদের দাক্ষিণাত্যে অভিযান সুরু হয়। পরবর্তী অপর একটি অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে, মুসলমান অভিযানের সামনে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি কোন মিলিত প্রতিরোধ সংগঠিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল।

ধর্ম

দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারত জুড়িয়া শিব ও বিষ্ণুর আরাধনা যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে, উহার মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়া যায়। অবশ্য পশ্চিম ভারতে জৈনধর্ম বাঁচিয়া থাকে এবং আজও উহা এই অঞ্চলে টিকিয়া আছে।

সপ্তম শতকে কুমারিল ভট্ট বৈদিক আচাব-অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেন। অষ্টম শতকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের অন্যতম শঙ্করাচার্য শিবের আরাধনা জনপ্রিয় করেন। উপনিষদ, গীতা এবং বেদান্তের ভাষ্য বচনায় তিনি তাঁহার প্রতিভাব পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক নূতন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিলেন, উহা "অদ্বৈতবাদ" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন,—'ব্রহ্ম সত্য এবং অদ্বিতীয়,

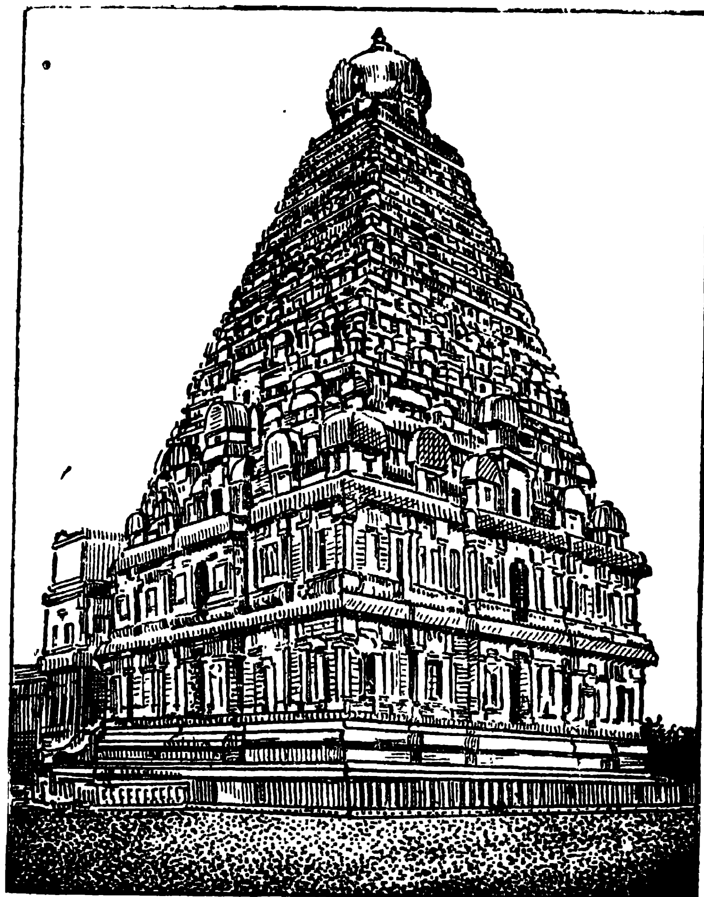


মামল্লপুরমে রথের আকারে পাথর কাটিয়া নির্মিত মন্দির

জগতে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ কেবল মায়া। মায়ার প্রভাবেই ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হইয়া থাকে, সর্পকে যেমন রজ্জু বলিয়া ভ্রম হয়।'

দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রচারক ছিলেন

রামানুজ। শঙ্করের মত ইনিও বেদান্তে মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি প্রচার করিলেন ভক্তিবাদ। রামানুজ বলিয়াছেন—ধর্মের প্রধান



তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির

অঙ্গ ভক্তি। বিষ্ণু তাঁহার আরাধ্য দেবতা। তাঁহার অনুবর্তীগণ "শ্রীবৈষ্ণব" নামে অভিহিত হন।

শিল্প

দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সেই যুগের ধর্মমতই এই সকল মন্দিরে প্রতিফলিত।

কাঞ্চীর পল্লবগণ মহামল্লপুর বা মামল্লপুরমে (মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত) পাথর কাটিয়া রথের আকারে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন; যথা—ধর্মরাজ রথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ ইত্যাদি। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরও বিখ্যাত।

চোলরাজগণ তাঞ্জোরের দৈত্যকায় শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটি চৌদ্দতলা। ইহার শিখরে পাথরের গম্বুজ। মন্দিরগাত্রে অপরূপ কারুকার্য।

রাষ্ট্রকূটগণ ইলোরার ভুবনবিখ্যাত কৈলাস মন্দিব নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। পাহাড কাটিয়া এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরেব সংলগ্ন সারি সারি গুহাগুলিতে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর অসংখ্য মূর্তি রহিয়াছে।

সাহিত্য

সংস্কৃত ভাষায় দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; যথা—বিহ্লনের "বিক্রমাঙ্কচরিত", ভাস্করাচার্যের "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি", সোমেশ্বরের "মানসোল্লাস"।

কিন্তু তামিল বা তেলেগু ভাষার তখনও বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

সামুদ্রিক অভিযান

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। তাঁহাদের পক্ষে সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করা স্বাভাবিক। সামুদ্রিক অভিযানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন চোলগণ। তাঁহারা ভারত সাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন। জলপথে

চোলগণ চীনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ড্যদের কায়ল ছিল দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। আরব ও চীন হইতে জাহাজ কায়ল বন্দরে আসিত।

মার্কো পোলোর বিবরণ

ত্রয়োদশ শতকে ইটালির ভেনিস নগরীয় পর্যটক মার্কো পোলো দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে দক্ষিণ ভারতের ধনসম্পদ এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়। তিনি প্রধানতঃ "মাবার" (Maabar) বা তাঞ্জোরের বিবরণ দিয়াছেন। মার্কো পোলো লিখিয়াছেন,—"মাবার দুনিয়ার সব চেয়ে সম্পদশালী প্রদেশ। এখানে মুক্তার ছড়াছড়ি। সমুদ্র হইতে মুক্তা সংগ্রহের জন্য বণিকেরা দলবদ্ধভাবে জাহাজে বিচরণ করে। মুক্তাগুলি গোলাকৃতি এবং উজ্জ্বল। দুনিয়ার সর্বত্র মুক্তাগুলি রপ্তানি হয়। বণিকেরা রাজার দরবারেও মুক্তা হাজির করে, রাজা উচ্চমূল্যে মুক্তা ক্রয় করেন। এই অঞ্চলে অশ্বপালনের রীতি নাই। বাহির হইতে এখানে অশ্ব আমদানি হয়। সুদূর হোরমুজ এবং এডেন হইতে বণিকেরা সেরা অশ্ব এই অঞ্চলে চালান দেয়। রাজা স্বয়ং প্রতি বৎসর দু হাজার অশ্ব কেনেন।

"এই দেশের মানুষ পুতুল পূজা করে। বেশীর ভাগ লোক ষাঁড় পূজা করে। কেহই গো-মাংস ভক্ষণ করে না। কোন কারণেই তাহারা ষাঁড় হত্যা করে না।

"এই রাজ্যের প্রধান খাদ্য চাউল। লোকে ডান হাতের সাহায্যে খাবার খায়। নিজ নিজ পাত্র হইতে তাহারা জল পান করে। অন্যের পাত্রে তাহারা জল পান করে না। জল পান করিবার সময় তাহারা পাত্র ঠোঁটে স্পর্শ করে না। বেশীর ভাগ মানুষ মদ্য পান করে না।"

মাবারের উত্তরে "মটুপল্লি" বা তেলেঙ্গিনা রাজ্যের রাণী রুদ্রাম্মা দেবীর তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন। এই রাজ্য সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—'এখানকার মানুষ পৌত্তলিক। তাহাদের খাদ্য, চাউল, মাংস, মাছ, দুধ এবং ফল। এই রাজ্যে হীরা পাওয়া যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া লোকে হীরা সংগ্রহ করে।'

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন

দক্ষিণ ভারতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই রাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের এক সুন্দর পদ্ধতি চোলদের আমলে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল—গ্রামসংঘ বা Village Assemblies। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের লইয়া 'গ্রামসংঘ' গঠিত হইত। গ্রামসংঘ দুই রকমের—"উর" এবং "সভা"। এই সভাগুলির হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। ইহারাই ছিল গ্রামের সমস্ত জমির মালিক। ইহারা ট্যাক্স বা কর আদায় করিত। প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল ইহাদের উপর। সেচের ব্যবস্থাও ইহারা করিত। সভার সভ্যগণ সকলেই নির্বাচিত হইতেন। অবশ্য রাজকর্মচারীরা সভা-গুলির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করিতেন।

অনুশীলনী

১। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

২। দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইবার কারণ কি?

৩। দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম প্রভাব লাভ করিতে পারে নাই কেন?

৪। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা, বাণিজ্য এবং গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের বিবরণ লিখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতি

সুদূর অতীতেই ভারতের সহিত বহির্জগতের পরিচয় ঘটিয়াছিল। প্রধানতঃ বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমেই ভারতের সহিত বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। স্থলপথে এবং জলপথে পৃথিবীর নানা দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই দেশগুলি হইল—

মিশর, এশিয়া-মাইনর, চীন, রোম, মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, বলি, খোটান।

প্রথম শতাব্দীতে একজন অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক লোহিত ও আরব সাগরের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তিনি "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি" নামে একটি বইতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'সে যুগে মিশর, এশিয়া-মাইনর, রোম প্রভৃতি দেশে ভারত হইতে মণিমুক্তা, হাতীর দাঁতের জিনিস, মসলিন প্রভৃতি রপ্তানি হইত।' "মিলিন্দ পঞ্‌হো" বা 'মিনান্দরের প্রশ্ন' নামক পালি পুঁথিতে চীন ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উল্লেখ আছে। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি প্রথম শতাব্দীতে রোম ও ভারতের বাণিজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ পুঁথিতে "তাম্রপর্ণী" বা সিংহল এবং "সুবর্ণভূমি" বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উল্লেখ আছে। সুবর্ণভূমি সত্যিই ছিল সোনার দেশ। এই সোনার দেশে পাওয়া যাইত মসলা কাঠ ও মূল্যবান ধাতব পদার্থ।

ভারতীয়গণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং মধ্য এশিয়ায় কয়েকটা

উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ সকল উপনিবেশে স্থায়িভাবে বাস করিতেন। দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয়, কম্বোডিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও ও বলিতে কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয়দের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি এই সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই দেশগুলির আদিম সভ্যতা অনেক উন্নত হইয়াছিল।

চম্পা ও কম্বুজ

বর্তমান ইন্দোচীনে দুটি ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল—চম্পা ও কম্বুজ। চম্পা হইল বর্তমান আনাম এবং কম্বুজ বর্তমান কম্বোডিয়া। কম্বুজের রাজা জয়বর্মণ যশোধরপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান নাম অঙ্কোরথম। এই সমৃদ্ধ নগরীতে ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন।

শৈলেন্দ্র বংশ

অষ্টম শতকে মালয় এবং ইন্দোনেশিয়াতে শৈলেন্দ্রবংশের রাজগণ এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল রণ-তরী পাঠাইয়া শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

শ্রীবিজয়

চতুর্থ শতকে জাভায় শ্রীবিজয় নামে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। পরে ইহা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। শৈলেন্দ্রদের পতনের পরে রাজা বিজয় জাভায় এক নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় দুইশত বৎসর এই সাম্রাজ্য টিকিয়াছিল। ষোড়শ শতকে মুসলমানগণ ইহা অধিকার করে।

মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়ায় আধুনিক খোটানের চারিপাশে ভারতীয় উপনিবেশগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে গোবি মরুভূমির তলায় এই উপনিবেশগুলি চাপা পড়িয়া যায়। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার অরেল স্টীন এই অঞ্চলে খনন-কার্য চালান, এবং দেখিতে দেখিতে গোবি মরুভূমির তলা হইতে আবিষ্কৃত হইল—বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, বুদ্ধ মূর্তি, ভারতীয় ভাষা এবং অক্ষরমালায় লেখা পুঁথির পাণ্ডুলিপি।

স্থাপত্য শিল্প

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন আজও টিকিয়া আছে; যথা—অঙ্কোরথমের বেয়নের বিরাট মন্দির ও জাভার বোরোবুদুর মন্দির। কম্বুজের অঙ্কোরবাত মন্দির একটি বিষ্ণু-মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে পাথরের প্রাচীর, প্রাচীরের পাদদেশে পরিখা, পরিখার উপরে সেতু। "বোরোবুদুর" একটি বুদ্ধ-মন্দির। মন্দিরটি নয়তলা। মন্দিরের শিখরে একটি স্তূপ। বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে অনেক চিত্র প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে।

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব

ভারতবর্ষ হইতেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন এবং তিব্বতে পৌঁছিয়াছিল। শৈলেন্দ্রবংশের রাজাদের গুরু ছিলেন বাংলার বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারঘোষ। কুষাণদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। চীন হইতে ভারতে আসিতে থাকেন বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ—ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, ইৎসিঙ্ প্রভৃতি। ভারত হইতেও বহু পণ্ডিত চীনে যান এবং বৌদ্ধ পুঁথি

অনুবাদ করেন। চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া এবং কোরিয়া হইতে উহা জাপানে ছড়াইয়া পড়ে। চীন এবং নেপালের মধ্যে তিব্বত অবস্থিত। তিব্বতের রাজা স্রংগ-জান গ্যাম্পো তাঁহার দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। একাদশ শতকে বাঙ্গালী পণ্ডিত দীপঙ্কর তিব্বতে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দিয়াছিলেন।

ভারতীয় ধর্মের বহু নিদর্শন বিভিন্ন দেশে পাওয়া গিয়াছে। শ্যামে ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, সিংহলে শিবমন্দির, জাভায় হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু ধর্ম নয়, সংস্কৃতির অন্যান্য ধারাও এই সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামে সংস্কৃতের চর্চা হইত। জাভায় সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী খুবই জনপ্রিয়। জাভার বিখ্যাত ছায়ানৃত্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ব্যবহৃত হয়। তিব্বতে ভারতীয় অক্ষরমালা প্রচলিত আছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব

মানচিত্রের দিকে তাকাইলে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বোঝা যায়। ভৌগোলিক অবস্থানই ভারতকে চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার সহিত সেই সুদূর অতীতে মিলিত করিয়া দিয়াছিল। "দুস্তর-গিরি-কান্তার-মরু" অতিক্রম করিয়া ভারতের মানুষ ঐ সকল অঞ্চলে গিয়াছিলেন বাণিজ্য এবং ধর্ম-প্রচারের জন্য। আবার চীন হইতে বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ দুর্গম গোবি মরুভূমি পার হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বত হইতে ছাত্রগণ পড়িতে আসিতেন। তাম্রলিপ্তি ছিল এক বর্ধিষ্ণু বন্দর। এই বন্দর হইতে জাহাজ যাতায়াত করিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ

বারবার প্রাকৃতিক বাধা জয় করে—মানব-সভ্যতার ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন'—ইহা প্রাচীন যুগের মানুষও জানিতেন। তাই তাঁহারা বাণিজ্যে বাহির হইতেন। আবার বাণিজ্যের পথ ধরিয়া সরস্বতীও বিচরণ করেন, এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন যুগে কোন্ কোন্ দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল? এই সম্পর্ক স্থাপনের কারণ কি কি?

২। প্রাচীন যুগে কিভাবে ভারতীয়গণ বিদেশে যাতায়াত করিতেন?

৩। মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। ভৌগোলিক অবস্থান কিভাবে ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত যোগাযোগে সাহায্য করিয়াছে?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কয়েকটি রাজপুত রাজ্য ঃ ইসলামের অভিযান

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে উত্তর ভারতে কয়েকটি রাজপুত রাজ্যে উত্থান ঘটিয়াছিল। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের হিন্দুস্থা বিজয় পর্যন্ত এই রাজপুত রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতে ইতিহাস আবর্তিত হইয়াছিল। শৌর্যে, বীর্যে, দেশপ্রেমের আদ রাজপুতগণ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

কিন্তু এই বাজপুতগণ কাহারা? ইহাদেব উৎপত্তি কি করিয়া হইল? ইহারা কি এদেশেরই মানুষ?

রাজপুতদের উৎপত্তি

রাজপুতদের উৎপত্তির প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে সুপ্রসিদ্ধ 'রাজস্থানের ইতিহাস' গ্রন্থ-রচয়িতা টড বলেন যে, শক, হূ প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান করিয়াছিল রাজপুতগণ উহাদের বংশধর। এই সমস্ত বিদেশী জাতি এবং রাজপুত দের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়; যথা—

(১) অশ্বপূজা—হূণ এবং রাজপুতদের মধ্যেই ইহা প্রচলিত।

(২) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান—উভয়ের মধ্যেই ইহা প্রচলিত

(৩) যুদ্ধপ্রিয়তা—হূণ এবং রাজপুতগণ যুদ্ধপ্রিয়।

(৪) যুদ্ধরথ ব্যবহার—উভয়েই যুদ্ধরথ ব্যবহার করে।

(৫) চারণদের অস্তিত্ব।

এতগুলি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মিল আছে বলিয়া টড বলেন যে রাজপুতগণ বিদেশী জাতিদের বংশধর।

অপর দিকে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা এবং আরও কয়েকজন পণ্ডি বলেন যে, রাজপুতগণ এদেশেরই মানুষ এবং বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়

হইতে উদ্ভূত। ক্ষত্রিয়গণও যুদ্ধপ্রিয়, রাজপুতগণও তাই। রাজপুতরাও নিজেদের বৈদিক ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি কালক্রমে ভারতীয়দের সহিত মিশিয়া যায় এবং ভারতীয় ধর্ম ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ ইহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে মিশিয়া যায় এবং নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে। বৈদিক যুগের বর্ণ-ব্যবস্থা একেবারে অটুট ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়; কারণ বিদেশী জাতিরা বিভিন্ন বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া উহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল। তাই রাজপুতগণ যে সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়দের বংশধর—এই মত গ্রাহ্য করা যায় না।

রাজপুত রাজ্যসমূহ

রাজপুতগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত; যথা—প্রতিহার, পরমার, চৌহান, চন্দেল্ল, গাহরবাল ইত্যাদি। এই বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল; যথা—

প্রতিহারগণ ··· কনৌজ
পরমারগণ ··· মালব
চৌহানগণ ··· শাকম্ভরী (রাজপুতনা), পরে দিল্লী ও আজমীর।
চন্দেল্লগণ ··· জেজাকভুক্তি (বর্তমান বুন্দেলখণ্ড)
গাহরবালগণ ··· কনৌজ (প্রতিহারদের পতনের পরে)

ইসলামের অভিযান

উত্তর ভারতে যখন হর্ষবর্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন, আরবে তখন এক নূতন ধর্মমতের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই ধর্মমত ইসলাম আর ইহা প্রচার করিয়াছিলেন হজরত মহম্মদ।

মক্কা নগরীতে কুরাইশ্ বংশে ৫৭১ সালে মহম্মদের জন্ম হয়। তিনিই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আরব দেশের কয়েকটি যুধ্যমান উপজাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তিনি একটি জাতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত ইসলাম ধর্ম এই নবীন জাতির মধ্যে এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইসলামের কথা 'কোরানে' লিপিবদ্ধ আছে। "কোরান" কথাটির অর্থ ভাষণ। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, কোরান আল্লার ভাষণ। হিন্দুরাও তেমনি বিশ্বাস করে যে, বেদ দেবতাদের নিকট শ্রুত বাক্য, তাই ইহার আর এক নাম "শ্রুতি"। কোরানে আছে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, অর্থাৎ আল্লাহ্ মাত্র একজন আছেন। মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী।

মহম্মদের মৃত্যুর পরে আরবদের দিগ্বিজয়ের যুগ সুরু হয়। মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, তাসখন্দ, বোখারা প্রভৃতি জয় করিয়া আরবগণ আসিলেন সিন্ধুনদীর তীরে। ৭১২ সালে সিন্ধুদেশ আরবদের দখলে চলিয়া যায়। কনৌজের প্রতিহারগণ আরবদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিল। আরবগণ ভারতে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আরবদের সিন্ধু-বিজয়ের তিনশত বৎসর পরে তুর্কী মুসলমানগণ উত্তর ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

তুর্কী মুসলমানগণ

নবম শতাব্দীতে আরব সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। এশিয়ার অংশে তুর্কী মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কীদের আদিবাস মধ্য-এশিয়ায়। ইহারা সকলের শেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তুর্কীরা কয়েকটা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে, যথা—গজনী, ঘুর ইত্যাদি। গজনী রাজ্যের সুলতান মামুদ সতের বার ভারতে অভিযান

করিয়াছিলেন। ঘুর রাজ্যের মহম্মদ ঘুরীই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

আল্ বীরুনী

সুলতান মামুদের অভিযান কালে তাঁহার সভাসদ্ প্রসিদ্ধ আরব-পণ্ডিত আল্ বীরুনী ভারতে আসিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় লিখিত তাঁহাব ভারত-বিবরণী খুব মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি লিখিয়াছেন—"সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলে ভারতের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। হিন্দু পণ্ডিতগণ মুসলমান-অধিকৃত অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া কাশ্মীর, বাবাণসী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় নিয়াছিলেন। ভারতে তখন জাতিভেদ প্রথা খুবই কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণগণই সমাজের নানারূপ সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেন। হিন্দুগণ মূর্তিপূজা কবিত। দেশে দেবদেবীর বহু মন্দিব ছিল। রাজস্বেব পরিমাণ ছিল ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ।"

অনুশীলনী

১। রাজপুতগণ কি এদেশেরই মানুষ? তাঁহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল?

২। ইসলাম ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের পার্থক্য ও মিল কোথায়?

৩। সুলতান মামুদের অভিযানকালে ভারতের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও।

চতুর্দশ অধ্যায়

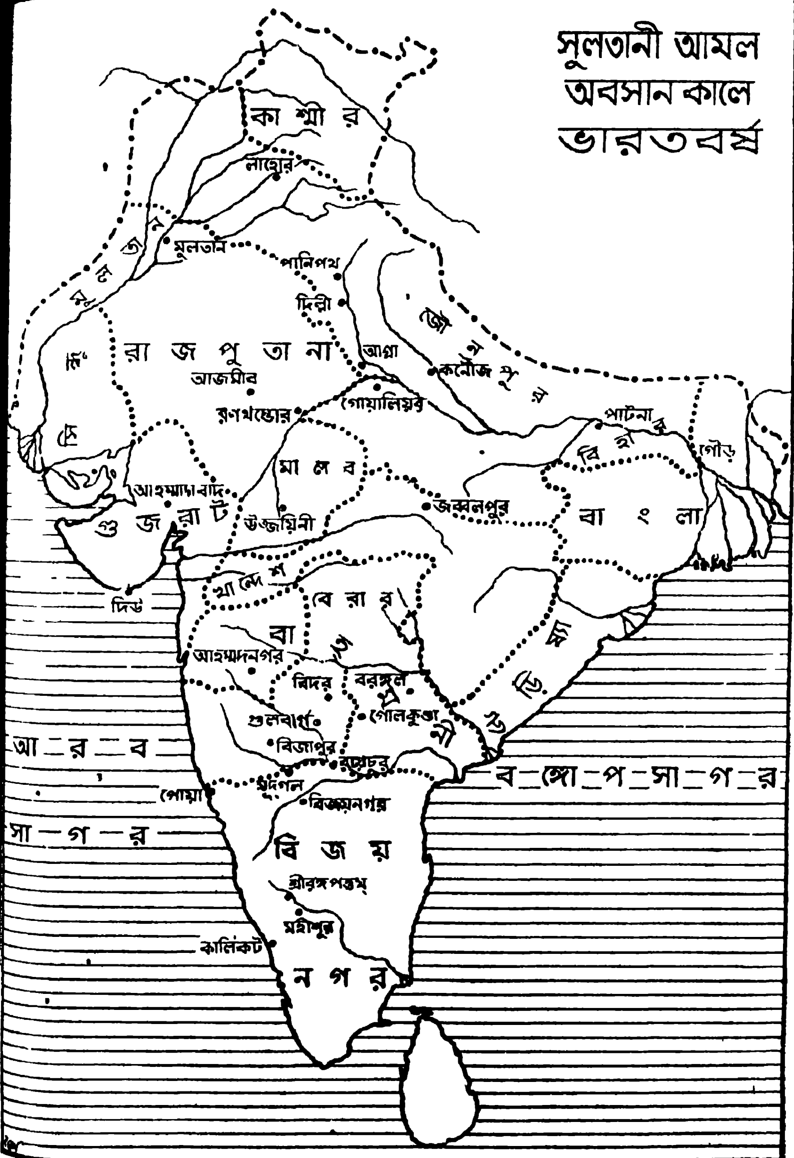
সুলতানী যুগঃ সমাজ ও সভ্যতা

রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো

গজনী এবং হেরাটের মাঝখানে অবস্থিত পার্বত্য রাজ্য ঘুরের মুইজউদ্দীন মহম্মদ বা মহম্মদ ঘুরীকেই ভারতে মুসলমান শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহান-বীর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। ১১৯৪ সালে কনৌজের গাহরবালরাজ জয়চন্দ্রও পরাজিত ও নিহত হইলেন। মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক চন্দেল্লরাজকে পরাজিত করিয়া কালিঞ্জর অধিকার করিলেন। এইভাবে চৌহান, গাহরবাল, চন্দেল্ল প্রভৃতি রাজপুতগণ একে একে পরাজিত হইলেন। উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে তুর্কী মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ঘুরীর আর একজন তুর্কী অনুচর ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন খলজী বিহার ও বাংলা দেশ জয় করিলেন।

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্যতম সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই সুলতানী যুগের সুরু।

দিল্লীর সুলতানগণ প্রায় তিন শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কয়েকটি বংশ পর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—দাস রাজবংশ; খলজী বংশ; তুঘলক বংশ; সৈয়দ ও লোদীগণ। খলজী বংশের সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালেই সুলতানদের শাসন হিমালয় হইতে রামেশ্বরসেতুবন্ধ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুজরাট, মালব, মেবার, বাংলা, দেবগিরি,


সুলতানী আমল
অবসান কালে
ভারতবর্ষ
কাশ্মীর
লাহোর
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
রাজপুতানা
আগ্রা
আজমীর
কনৌজ
গোয়ালিয়র
রণথম্ভোর
পাটনা
গৌড়
মালব
আহম্মদাবাদ
জব্বলপুর
গুজরাট
উজ্জয়িনী
বাংলা
দিউ
খান্দেশ
বেরার
আহম্মদনগর
বিদর
বরঙ্গল
গুলবার্গা
গোলকুণ্ডা
বিজাপুর
আরব
সাগর
গোয়া
বিজয়নগর
বিজয়
বঙ্গোপসাগর
শ্রীরঙ্গপত্তম
মহীশূর
কালিকট
নগর

বরঙ্গল, মাদুরা প্রভৃতি তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলি তাহাদের স্বাধীনতা হারাইল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়িয়া মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু ইহা মোটেই স্থায়ী হয় নাই। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে দিল্লীতে চরম অরাজকতা সুরু হইল। অভিজাতশ্রেণী বিদ্রোহ করিল এবং এই বিদ্রোহের তরঙ্গ-শীর্ষে তুঘলক বংশ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল।

তুঘলক বংশের "উন্মাদ রাজা" মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে সুলতানদের পতন সুরু হইল। বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। দক্ষিণ ভারতে বাহমনী রাজ্য এবং বিজয়নগর হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অবস্থায় সমরখন্দের তুর্কী অধিপতি তৈমুর লঙ্ ১৩৯৮ সালে অভিযান করিয়া দিল্লীতে অবাধ লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নরহত্যা চালাইলেন। দিল্লী এক মহাশ্মশানে পরিণত হইল। তৈমুর লঙ্-এর দিল্লী-লুণ্ঠনের পরে সুলতানদের শাসন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তুঘলকের পতনের পরে সৈয়দগণ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তারপর আসেন লোদীগণ। লোদীগণ জাতিতে আফগান। বহ্‌লুল ভারতের প্রথম আফগান সুলতান। ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতে ইসলাম

তুর্কী মুসলমান শাসকদের যুগেই ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে এবং ছড়াইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান করিয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহারা ভারতীয় ধর্ম, আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া এদেশের মানুষের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, ভারতীয়দের মধ্যে তাই হূণ জাতি, শক জাতি

প্রভৃতির কোন অস্তিত্বই নাই। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। মুসলমানগণ এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু ধর্মে, আচারে, রাজনীতিতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিলেন। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। ইবন বতুতা লিখিয়াছেন,—"কোন হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ কবিলে সুলতান তাহাকে মূল্যবান পোশাক ও সোনার বালা দান করেন।" দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, দরগা নির্মিত হইতে লাগিল। এই সকল দরগা-মসজিদে অবস্থান করিয়া পীর ও গাজীগণ ইসলামধর্ম প্রচাব করিতে থাকেন। প্রধানতঃ উত্তর ভাবতেই ইসলামধর্ম ছড়াইয়া পড়ে; দক্ষিণ ভারতে ইহার প্রভাব বেশী হয় নাই। অবশ্য সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা অধিক ছিল।

ইসলামের প্রতিক্রিয়া

ইসলামের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দুগণ ক্রমশঃ অধিকতর গোঁড়া হইয়া পড়িলেন। ইসলামী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুগণ কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে আশ্রয় নিলেন; শাস্ত্রকারগণ নূতন নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করিলেন। বাংলাব রঘুনন্দন এই শাস্ত্রকারদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন।

অপর দিকে কয়েকজন সাধুপুরুষ "সমন্বয়বাদ" প্রচার করিয়া বলিলেন,—সকল ধর্মই মূলতঃ এক। পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান বড় কথা নয়, মুক্তিলাভের পথ হইল ভক্তি এবং অন্তরের পবিত্রতা। তাঁহাদের বাণী এই যুগে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। যাঁহারা এই নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নানক ও কবীর খুবই প্রসিদ্ধ। নানক বলিয়াছেন,—'ঈশ্বর একজন। মসজিদ বা মন্দিরে গেলে কিংবা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিলেই

ধার্মিক হওয়া যায় না। অন্তরের পবিত্রতা রক্ষা করাই ধর্মপালনের প্রধান কথা।' কবীর বলিয়াছেন,—'উপবাস কিংবা উপাসনার দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না। স্বর্গ রহিয়াছে মানুষেরই অন্তরে। ক্রোধ, কপটতা, হিংসা ত্যাগ কর। আল্লা ও রাম ঈশ্বরেরই দুই নাম।'

নানক এবং কবীরের সমসাময়িক চৈতন্যদেব। তিনিও প্রেম ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়া বলিলেন,—'সমাজের সকল মানুষই, সে শূদ্র হউক কিংবা ব্রাহ্মণ হউক, প্রেম ও ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের নিকটবর্তী হইতে পারে।' নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "আমি ব্রাহ্মণ নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই, ক্ষত্রিয় নই...... আমি কৃষ্ণেরই দাসানুদাস।" ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বাংলার সমাজে জাতিভেদ প্রথা খুবই কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। শূদ্রগণ সমাজে অচ্ছুৎ ছিল। শূদ্রগণ মুসলমান ধর্মও গ্রহণ করিতেছিল। চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না। শূদ্রদের তিনি মানুষ মনে করিতেন। তাঁহার একজন মুসলমান শিষ্যও ছিল—"যবন হরিদাস"। বাংলায় চৈতন্যদেবের ধর্মমত বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। বহুকাল পরে শূদ্রগণ সমাজে মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্ম ক্রমশঃ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল।

সামাজিক অবস্থা

সুলতানী আমলে সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: অভিজাতগণ, কৃষক, কারিগর এবং ক্রীতদাস। সমাজের উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিতেন অভিজাতগণ। আমীর-ওমরাহ্, সেনাপতি, রাজকর্মচারীর পদ ইহারা পাইতেন। বড় বড় জায়গীর এবং ওয়াকৃফ সম্পত্তি ইহারা ভোগ করিতেন। মণিমুক্তা-খচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইহারা চরম বিলাস ও আরামে জীবনযাপন করিতেন। সুলতান দুর্বল হইলেই

ইহারা ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্র করিতেন। সবল রাজশক্তি স্থাপনের পথে ইহারাই ছিলেন প্রধান অন্তরায়।

অপর দিকে কৃষক, কারিগর ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ অশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাইতেন। ইহাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সে যুগ স্বেচ্ছাতন্ত্রের যুগ, গণতন্ত্র তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অভিজাতশ্রেণীর জমিজমা কৃষকরা চাষ করিতেন। করভারে তাহারা জর্জরিত ছিলেন। স্থলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আমীর খসরু বলিয়াছেন ঃ "রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা যেন দারিদ্র্যভারাতুর কৃষকদের সজল নেত্র হইতে ঝরিয়া-পড়া জমাট রক্তবিন্দু।"

ক্রীতদাসপ্রথা ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর সময়ে পঞ্চাশ হাজার ক্রীতদাস ছিল, ফিরূজ তুঘলকের রাজত্বকালে উহার সংখ্যা হয় দুই লক্ষ। রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে এমন কি বিদেশ হইতেও ক্রীতদাস রাজধানীতে আনা হইত। ক্রীতদাস-দের নিয়োগ করা হইত স্থলতান ও অভিজাতদের গৃহস্থালির কাজে এবং প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি-মন্দির নির্মাণের কাজে। ক্রীতদাসগণ চমৎকার কারিগর ছিলেন। সে যুগের স্থাপত্যশিল্প ক্রীতদাসদের কারিগরি-দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। দাসমুক্তির নিয়ম ছিল। কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে দাসদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হইত। স্থলতান কুতব-উদ্দীন আইবক, ইলতুৎমিস, গিয়াস্থদ্দীন বলবন তো প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, পরে ইহারাই দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন

অর্থনৈতিক অবস্থা

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ছিল অফুরন্ত ধনসম্পদের দেশ। এই ধনসম্পদের মূলে ছিল শস্যশ্যামলা জমি এবং সম্প্রসারণশীল বাণিজ্য। চীনা দোভাষী মা হুয়ান বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'বছরে

দুটি ফসল ফলিত; ধান, সরিষা, পেঁয়াজ, বেগুন, বিভিন্ন রকমের শাকসবজী প্রচুর উৎপন্ন হইত; কলা এবং অন্যান্য ফলের চাষ হইত। কালিকট এবং গুজরাট ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। সুদূর ইউরোপ, চীন, মালয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সহিত ভারতেব নিয়মিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ভারতীয় সওদাগরগণ বিদেশে চালান দিতেন সূতীবস্ত্র, আফিম, নীল, চাউল, মসলা প্রভৃতি। বিদেশ হইতে ভাবতে আসিত বিলাস-দ্রব্য, মুক্তা, তামা প্রবাল, হাতী ও ঘোড়া ইত্যাদি।' মা হুয়ান আরও লিখিয়াছেন যে, বাংলা দেশে ধনিগণ বিদেশের সহিত বাণিজ্যের জন্য জাহাজ নির্মাণ করিতেন। বাংলা দেশে তৈরী হইত ছয় রকমের সূতীবস্ত্র, রেশমী রুমাল, বন্দুক, ছুরি, কাঁচি, সাদা কাগজ ইত্যাদি। বিজয়নগর সম্পর্কে পর্তুগীজ পরিব্রাজক নিকোলো কোটি লিখিয়াছেন,—'বিজয়নগরে বন্দরের সংখ্যা প্রায় তিনশত। বাজারে সারি সারি রকমারি জিনিসেব দোকান। জহুরীরা বাজারে বসিয়া মণি-মুক্তা-হীরা বেচিত।'

বাংলা দেশে জিনিসপত্রের দর খুব কম ছিল। ইবন বতুতাব বিবরণী হইতে কোন্ জিনিসের কি দর ছিল তাহা জানা যায়ঃ

চাউল	৯	মণ	৭	টাকা
ধান	২৮	,,	৭	,,
ঘি	১৪	সের	৩৷৷০	,,
চিনি	১৪	সের	৩৷৷০	টাকা

দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বাংলায় মুদ্রাকে বল হইত "টঙ্কা"। খুচরা কেনাবেচার জন্য কড়ি ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু এই অফুরন্ত ধনসম্পদ ভোগ করিতেন কাহারা? প্রধানতঃ অভিজাত-শ্রেণী এবং সওদাগরগণই ইহা ভোগ করিতেন। দেশে

ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইলেই সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না। ধনসম্পদ তো সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয় না। কৃষক ও কারিগর-শ্রেণী এই বিপুল ধনসম্পদের অংশ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। রুশ পর্যটক নিকিতিন বিজাপুর সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, জনসাধারণ হতদরিদ্র। কবি আমীর খস্রুর বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

শিল্প

সুলতানদের শাসনের যুগে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর কুতুবমিনার আজও বিস্ময়ের বস্তু। কুতবউদ্দীন ও ইলতুৎমিস ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তুঘলক বংশের ফিরূজ তুঘলক কয়েকটি নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন—ফিরূজাবাদ, জৌনপুর ইত্যাদি।

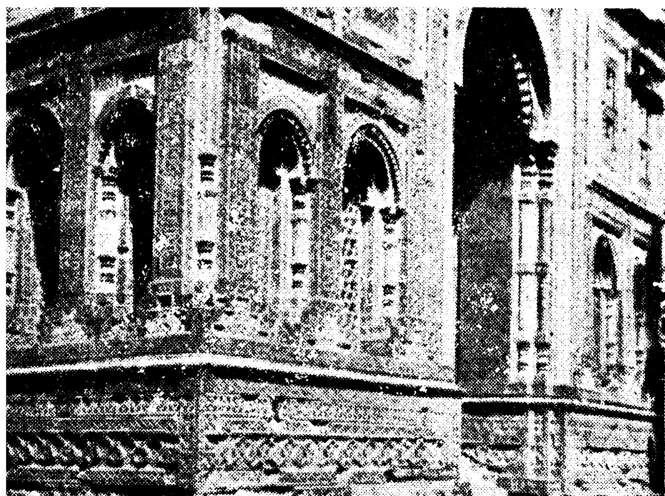
শিল্পের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। মুসলমানগণ অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু-শিল্পীদের নিয়োগ করিতেন। অনেক সময় হিন্দু-মন্দির ভাঙ্গিয়া উহার উপরই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ফলে এই সব ক্ষেত্রে হিন্দু শিল্পরীতির ছাপ পড়িয়াছে। মুসলমান ও হিন্দুদের মসজিদ, মন্দির ও প্রাসাদ-নির্মাণের ক্ষেত্রে একটা বড় মিল রহিয়াছে। উভয়েই মন্দির ও মসজিদ-গাত্র অলঙ্করণ করিতেন। সুলতানী যুগের শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন আজও টিকিয়া আছে :

কুতুবমিনার	...	দিল্লী
আলাই দরওয়াজা	...	দিল্লী
বড় সোনা মসজিদ	...	মালদহ
ছোট সোনা মসজিদ	..	,,
কদম রসুল	...	,,

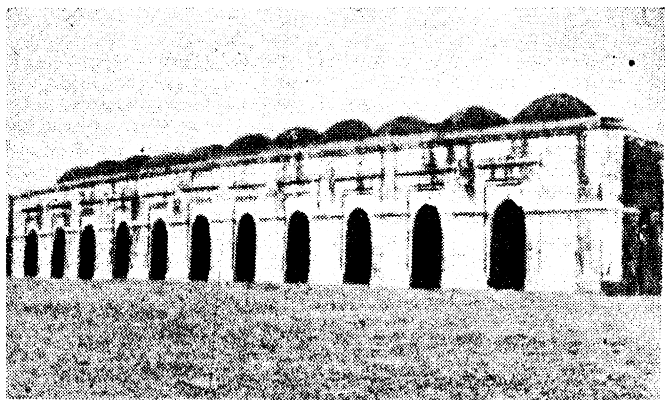
একলাখী সমাধি-মন্দির

জাম-ই-মসজিদ

পাণ্ডুয়া



আলাই দরওয়াজা



বড় সোনা মসজিদ

গোলগম্বুজ	বিজাপুর
অতালদেবী মসজিদ	জৌনপুর
চাঁদ-মিনার	দৌলতাবাদ
বিঠলস্বামী মন্দির	বিজয়নগর



ছোট সোনা মসজিদ

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এত মসজিদ, প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থ কোথা হইতে আসিত? সুলতান ও অভিজাতগণ তাঁদের বিপুল অর্থের একটা অংশ শিল্পকার্যে ব্যয় করিতেন সত্য। কিন্তু এই শিল্পকার্যের মূলে আছে দাস-শ্রম।

ক্রীতদাসদের এই সকল মসজিদ, প্রাসাদ, সমাধি-মন্দিব নির্মাণেব কাজে নিয়োগ করা হইত। দাস-শ্রমের তো কোন দাম দিতে হইত



অতালদেবী মসজিদের তোরণ

না, দাসগণ বেগাব খাটিত। স্বভাবতঃই দাস-কাবিগবদের মজুবি দিতে হইলে বিপুল অর্থ প্রয়োজন হইত।

প্রাদেশিক সাহিত্য

সুলতানী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—প্রাদেশিক সাহিত্যেব বিকাশ। এতকাল দেশে সংস্কৃতই ছিল প্রধান ভাষা। পণ্ডিত ও শাস্ত্রকাবকগণ সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহাব করিতেন। টোল ও চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষাই শিখিতেন। সুলতানী যুগে বিকাশলাভ করিল প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক সাহিত্য—বাংলা, হিন্দী, তেলেগু ইত্যাদি। এই যুগের ধর্ম-প্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের ধর্মমত বোধগম্য করিবার জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহাব

করিতে লাগিলেন। কবীর সহজ হিন্দী ভাষায় তাঁহার "দোঁহা" রচনা করিলেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই দোঁহা খুবই জনপ্রিয় ছিল। আজও উত্তর ভারতে এই দোঁহা সাধারণ মানুষ ভুলিয়া যায় নাই। নানক এবং তাঁহার শিষ্যগণ শিখদের 'গুরমুখী' লিপির পত্তন কবিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বৈষ্ণব কবি এবং লেখকদের অবদান বিরাট। বীরভূম জেলার বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে অপূর্ব পদাবলী রচনা করিলেন। মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল। গৌড়রাজের আনুকূল্যেই কৃত্তিবাস এই যুগে তাঁহার অমর "রামায়ণ" রচনা করিয়াছিলেন। সুলতান হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু "ভাগবত" বাংলায় অনুবাদ করিলেন। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বিজয়গুপ্ত লিখিলেন "মনসামঙ্গল"। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তেলেগু ভাষায় রচনা করিলেন "আমুক্ত মাল্যদা"।

ফারসী সাহিত্য

দিল্লীর সুলতান ও আমীরগণ অবশ্য ফারসী ভাষা ব্যবহার করিতেন। ফারসীতে এই যুগে কাব্য ও ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খস্‌রু—যিনি "ভারতের বুলবুল" বলিয়া বন্দিত। কাশ্মীরের উদার মতাবলম্বী সুলতান জয়নুল আবেদীনের উদ্যোগে মহাভারত এবং কহ্লনের "রাজতরঙ্গিণী" সংস্কৃত হইতে ফারসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এই যুগেই ঐতিহাসিক মিনহাজ "তবকাত-ই-নাসিরী" এবং জিয়াউদ্দীন বরনী "তারিখ-ই-ফিরূজশাহী" নামে মহামূল্যবান ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সুলতানী যুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

সমাজবিদ্যার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সুলতানী যুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে ; যথা—

(ক) এই যুগে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে ভারতের সমাজজীবনে একটি নূতন ধারা প্রবাহিত হইল—প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয়ের ধারা। একদিকে ইসলামের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সমাজ আরও কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল ; অপর দিকে একই দেশে একসঙ্গে বাস করিবার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম ও সমাজজীবনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা হইল। হিন্দু-মুসলমানগণ "সত্যপীরের" পূজা করিতে লাগিলেন। হিন্দু ও মুসলিম রীতির সংমিশ্রণে মসজিদ ও সমাধি-মন্দির নির্মিত হইল। অবশ্য এই সমন্বয়ের ধারা খুব বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, কেননা অগণিত হিন্দু মুসলমান স্বতন্ত্র ভাবেই ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনযাপন করিতেন।

(খ) মুসলমান হইলেও সুলতানদের অনেকে হিন্দুদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই রামায়ণ ও মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ সুলতান হুসেন শাহকে বলিতেন : "নৃপতি হুসন জগৎভূষণ।"

(গ) সামাজিক জীবনের ধারা গুপ্তযুগের মত একই খাতে প্রবাহিত ছিল। সমাজের উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিতেন অভিজাতগণ, সাধারণ মানুষ ছিল কত দরিদ্র। জাতিভেদ-প্রথা খুবই কঠোর ছিল। শূদ্রগণ সমাজে অচ্ছুৎ ছিলেন। ক্রীতদাস-প্রথা এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য নয়, গুপ্তযুগেও ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই যুগে ইহা আরও ব্যাপক হইয়াছিল।

(ঘ) রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও মোটামুটি একই রকম ছিল, সেই স্বেচ্ছাতন্ত্র, -গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র নয়। রাজা ও সুলতানগণই রাষ্ট্রের সর্বময় ভু। মন্ত্রীরা তাঁহাদের আজ্ঞাবাহক। জনসাধারণ রাজনৈতিক ধিকার ভোগ করিত না। অভিজাতগণ শক্তিশালী রাজতন্ত্র ঠনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন। রাজশক্তি দুর্বল হইলেই ইঁহারা দ্রোহ করিতেন, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেন।

ঘটনাপঞ্জী

কুতবউদ্দীন : সুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা	...	১২০৬	সাল
আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকাল	...	১২৯৬-১৩১৬	,,
মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল	...	১৩২৫-৫১	,,
বাংলার হুসেন শাহের রাজত্বকাল	...	১৪৮৩-১৫১১	,,
চৈতন্যদেবের জন্ম ...	...	১৪৮৫	,,
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ...	...	১৫২৬	,,

অনুশীলনী

১। কিভাবে ভারতে ইসলাম প্রবেশ করিল?

২। ভারতের সমাজজীবনে ইসলামের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। ইসলামের প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ম কিভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল?

৪। সুলতানী যুগে ভারতের বিপুল ধনসম্পদের উৎস কি? এই সম্পদ কিভাবে ব্যয় হইত?

৫। সুলতানী যুগে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল?

৬। সুলতানী যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল?

৭। সুলতানী যুগে প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক সাহিত্য কিভাবে গশলাভ করিল?

৮। গুপ্তযুগ এবং সুলতানী যুগের সমাজজীবনের তুলনা কর।

৯। পাল-সেন যুগ এবং সুলতানী যুগে বাংলার সমাজজীবনের তুলনা।

১০। বাংলার ইতিহাসে চৈতন্যদেবের প্রধান অবদান কি?

পঞ্চদশ অধ্যায়

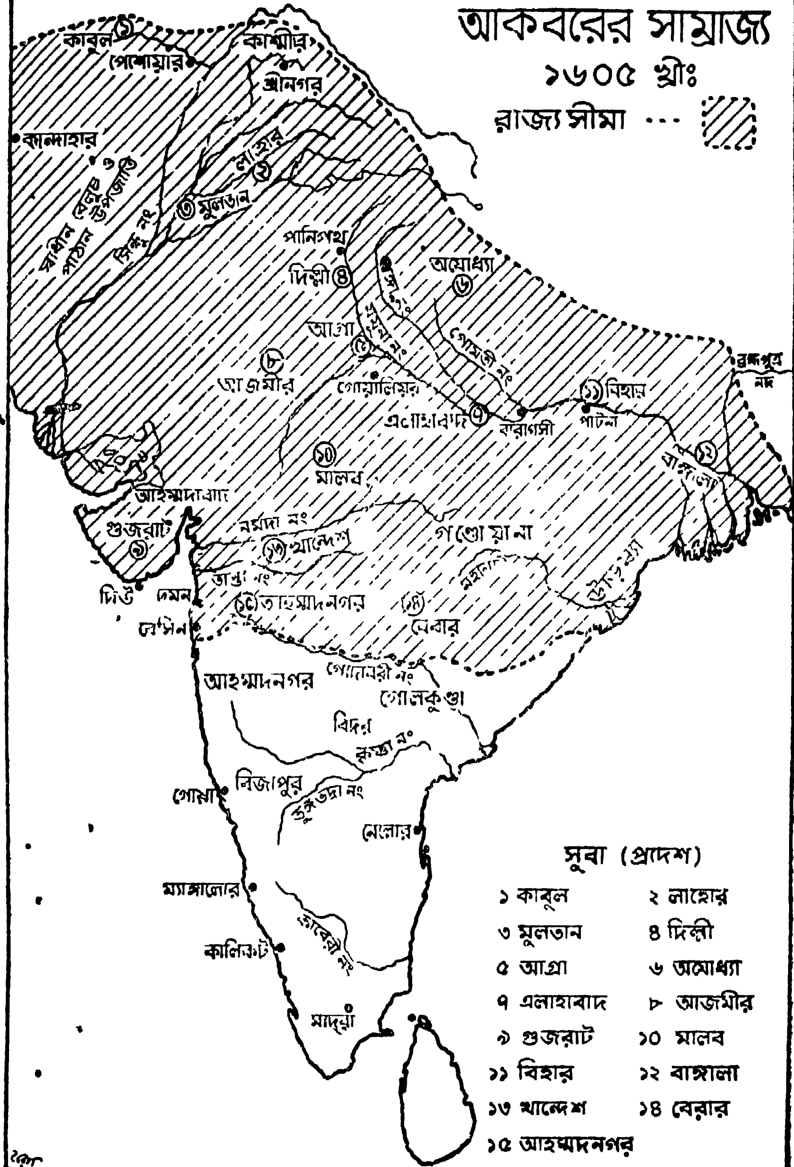
মোগলযুগ ; শাসন-ব্যবস্থা ; সমাজ ও সংস্কৃতি

রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো

ঐতিহাসিক পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ সালে বাবর দিল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে 'পরাজিত করিয়া হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভারতে শুরু হইল এক নূতন যুগ—মোগল যুগ।

কিন্তু এই মোগলগণ কাহারা? "মোঙ্গল" হইতেই মোগল নামের উৎপত্তি। মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মোঙ্গলগণ ইতিপূর্বে বার বার ভারতে অভিযান করিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খাঁ ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে সিন্ধুনদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকে তৈমুরলঙ্ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকে ইহাদেরই এক বংশধর বাবর ভারতে অভিযান করেন। ভারতে আসিবার পরে এই মোঙ্গলগণই 'মোগল' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

বাবর পানিপথের যুদ্ধের মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৫৩০ সালে মারা যান। স্বভাবতঃই একটি স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় তিনি পান নাই। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন আফগানবীর শেরশাহের নিকট পরাজিত হইয়া ভারত হইতে পলায়ন করিলেন। ভারতে কিছুদিনের জন্য পুনরায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। শেরশাহের মৃত্যুর পরে আফগান শাসন ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং হুমায়ুন পুনরায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আকবর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। বস্তুতঃ আকবরই ভারতে মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে আকবর


আকবরের সাম্রাজ্য
১৬০৫ খ্রীঃ
রাজ্যসীমা ...
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
সিন্ধু নং
পানিপথ
দিল্লী
অযোধ্যা
আগ্রা
আজমীর
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বারাণসী
বিহার
পাটনা
বাঙ্গালা
ব্রহ্মপুত্র নদ
মালব
আহম্মদাবাদ
গুজরাট
নর্মদা নং
খান্দেশ
গণ্ডোয়ানা
দিউ
দমন
বেরার
আহম্মদনগর
গোদাবরী নং
গোলকুণ্ডা
বিদর
কৃষ্ণা নং
গোয়া
বিজাপুর
তুঙ্গভদ্রা নং
নেলোর
ম্যাঙ্গালোর
কালিকট
কাবেরী নং
মাদুরা
সুবা (প্রাদেশ)
১ কাবুল
২ লাহোর
৩ মুলতান
৪ দিল্লী
৫ আগ্রা
৬ অযোধ্যা
৭ এলাহাবাদ
৮ আজমীর
৯ গুজরাট
১০ মালব
১১ বিহার
১২ বাঙ্গালা
১৩ খান্দেশ
১৪ বেরার
১৫ আহম্মদনগর

একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহারই রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মালব, মেবার, গুজরাট, বাংলা, উড়িষ্যা, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থান, কান্দাহার তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে উত্তর ও মধ্য ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ একই রাষ্ট্রের অধীনে উত্তর ও মধ্য ভারত ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর সম্রাট হইলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্যের সীমা আরও বিস্তৃত হইল। যুবরাজ খুর্‌রম্ দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর জয় করিলেন, আনন্দিত সম্রাট খুর্‌রম্‌কে "শাহ্‌জাহান" বা জগতের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের পরে শাহ্‌জাহান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অভিযান করিলেন। আহম্মদনগরের নিজামশাহী বংশের অবসান ঘটিল এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিল। তাঁহার শেষ জীবন পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া রক্তাক্ত যুদ্ধের ফলে দারুণ অশান্তিময় হইয়াছিল। পিতাকে বন্দী করিয়া, ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া, রক্তের নদী পার হইয়া আওরঙ্গজেব সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। মোগলবংশের তিনিই শেষ বড় সম্রাট। তাঁহার রাজত্বকালে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কাবুল হইতে চট্টগ্রাম, কাশ্মীর হইতে কাবেরী পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। কিন্তু তাঁহারই রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন সুরু হইল। একজন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান আওরঙ্গজেব আকবরের উদার ধর্মনীতি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া অমুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা কঠোর ও পীড়নমূলক

ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। অমুসলমানদের ধর্মান্তরিত করিবার জন্যও তিনি চেষ্টা করিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার এই চরম গোঁড়ামি হিন্দুদের মধ্যে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি করিল। জাঠ, বুন্দেলা, শিখ, রাজপুত এবং মারাঠাগণ একে একে মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ফলে আওরঙ্গজেব হারাইলেন অজস্র অর্থ এবং অসংখ্য সৈন্য। জীবন-পথের শেষে তিনি পুত্রকে লিখিয়াছেন—

"এই দেশ এবং ইহার লোকজনের ভাল আমি করি নাই; ভবিষ্যতও অন্ধকার।" ১৭০৭ সালে তাঁহার মৃত্যুর পরে, সত্যই মোগল সাম্রাজ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সুলতানী আমলের শেষ পর্বে তৈমুরলঙ্‌ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। মোগল যুগের শেষ পর্বেও ১৭৩৯ সালে নাদিরশাহ্‌ দিল্লীতে রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়া বিখ্যাত কোহিনূর মণি, শাহ্‌জাহানের ময়ূর সিংহাসন এবং অজস্র ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেন। নাদিরশাহের পরে আহম্মদশাহ্‌ দুররানী ভারতের বুকে কয়েকবার অভিযান করিলেন। বিদেশী অভিযানের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া-পড়া মোগল সাম্রাজ্য একেবারেই ধসিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ভাগ্য-নক্ষত্র ধীরে ধীরে দিক্‌চক্রবাল-রেখার উপর উদিত হইয়াছিল।

মোগল শাসন-ব্যবস্থা

মোগল যুগে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একটি সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। আধুনিক যুগের শাসন-ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ একটি কাঠামো মোগল যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সমগ্র সাম্রাজ্য বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সুবার শাসনভার ছিল সিপাহশালার কিংবা সুবাদার-এর উপর (বর্তমানে যেমন রাজ্যপালের উপর প্রদেশের শাসনভার থাকে)। সুবা বিভক্ত ছিল কতকগুলি "সরকারে"। "সরকার" অনেকটা বর্তমান জেলার মত। ফৌজদার ছিলেন সরকারের শাসনকর্তা। সরকার বিভক্ত ছিল কতকগুলি "পরগনায়"। কয়েকটা গ্রাম লইয়া পরগনা গঠিত হইত। (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা জেলা কয়েকটা পরগনা লইয়া গঠিত)। নগরে শান্তিরক্ষার ভার ছিল কোতোয়ালের উপর। কাজী বিচার করিতেন। আরও বিভিন্ন রকমের প্রাদেশিক কর্মচারী ছিলেন ; যথা—

দেওয়ান ... রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী
বক্সী ... বেতন-বিভাগের কর্তা
সদর .... মসজিদ ও দাতব্য-বিভাগের কর্তা
আমিল .... রাজস্ব আদায়কারী
বিতিকচি ... রাজস্বের হিসাবরক্ষক
পোতদার ... কোষাধ্যক্ষ
ওয়াকিয়া-নবিস ... সংবাদ-লেখক
মুতাসিব .... প্রজাদের নৈতিক জীবনের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী
কানুনগো ... রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মোগল যুগের কর্মচারীদের কিছু

ইত্যাদি।

বর্তমান যুগের শাসন-ব্যবস্থার সহিত মোগল সাম্রাজ্যের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। মোগল শাসন-ব্যবস্থা স্বেচ্ছাতন্ত্রের উপর

প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা। মন্ত্রীরা সম্রাটের আজ্ঞাবহ। সম্রাটের কাজে সাহায্য করিতেন কয়েকজন কর্মচারী; যথা—ভকিল (প্রধান মন্ত্রী), উজীর (অর্থ-সচিব), প্রধান বক্সী (খাজাঞ্চি) ইত্যাদি। সম্রাট এবং এই সকল মন্ত্রী ও কর্মচারী লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ছিল। বর্তমান যুগে শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি জনসাধারণ। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করেন। একজন রাজা বা সম্রাটের নির্দেশে দেশ শাসিত হয় না। মোগল যুগে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

মনসবদারি প্রথা

আকবর মোগল শাসন-ব্যবস্থায় একটি অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, উহাই মনসবদারি প্রথা। মনসবদাররা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সরাসরি রাজকোষ হইতে তাহাদের বেতন দেওয়া হইত। আকবর ৩৩টি শ্রেণীতে মনসবদারদের বিভক্ত করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর মনসবদার দশ হাজার সৈন্য রাখিতে পারিতেন। সাত হাজারী, পাঁচ হাজারী মনসবদার হইতে দশজন সৈনিকের অধিনায়ক মনসবদারও ছিলেন। এই মনসবদারি প্রথাই ছিল সেনাবিভাগের ভিত্তি। মনসবদারদের সৈনিকরাই যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত। সম্রাটের অধীনে স্থায়ী সৈন্য-সংখ্যা তাই কম ছিল।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

সম্রাট আকবরের সময় এক সুশৃঙ্খল রাজস্ব-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। দেওয়ান তোডরমল এই রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রধান নির্মাতা। তোডরমল যে রাজস্ব-ব্যবস্থার পত্তন করেন উহার তিনটি বৈশিষ্ট্য—(ক) জমি জরিপের ব্যবস্থা, (খ) বিভিন্ন শ্রেণীতে জমি ভাগ করা,

(গ) খাজনার হার নির্দিষ্ট করা। এই সুবিশাল দেশে জমি জরিপের কাজ দুরূহ, অথচ জমি জরিপ না করিলে কোন্ প্রজার কোন্ জমি, জমির শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি স্থির করা যায় না। জমি জরিপের ব্যবস্থা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব জমি সমান নয়, তাই জমির শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন। তোডরমলী ব্যবস্থায় জমি চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইল—**পোলজ** অর্থাৎ যে জমি প্রতি বৎসর চাষ হয়; **পরৌটি** অর্থাৎ যে জমি চাষযোগ্য করিবার জন্য কিছুকাল অনাবাদী থাকিত; **চচর** বা যে তিন চার বৎসরের অনাবাদী জমি; **বঞ্জর** বা যে জমি পাঁচ বৎসর চাষ হয় নাই। জমির শ্রেণীভাগের পরে খাজনার হার নির্দিষ্ট হইত। যে জমিতে চাষবাস হইত কেবল উহার উপর খাজনা ধার্য হইত। খাজনার হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। নগদ টাকায় বা শস্যে খাজনা দিতে হইত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে জমির বন্দোবস্ত কাহার সহিত হইত? জমিদারের সহিত, না রায়ত বা প্রজার সহিত? উত্তর ভারত, গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতে রায়তদের সহিত জমির বন্দোবস্ত হইত। রায়তরা সরাসরি সম্রাটকে ভূমিরাজস্ব দিতেন। দেওয়ান, আমিন, বিতিকচি, কানুনগো প্রভৃতি সম্রাটের কর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করিতেন। বাংলা সুবায় সম্ভবতঃ জমিদারদের সহিত জমির বন্দোবস্ত হইত। জমিদারগণ সরকারকে দিতেন 'পেশকস' (tribute)। মোগল যুগে বাংলাদেশে কয়েকটি জমিদার পরিবারও গড়িয়া উঠিয়াছিল, যথা—"ভুইঞাগণ" (যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, বাখরগঞ্জের কন্দর্পনারায়ণ, ঢাকা ও মৈমনসিংহের ঈশা খাঁ প্রভৃতি); নপাড়ার চৌধুরীগণ; সুসংএর রাজারা ইত্যাদি।

কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত জমিই জমিদারদের দখলে ছিল না।

"খালসা" বা সরকারের খাসজমিও ছিল। "খালসার" রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা হইত।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জমির ইজারা দিবার প্রথা তখন চালু হয় নাই। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ ইজারাদারি প্রথা চালু করেন। যে জমিদারগণ সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইতেন, তাঁহারা জমির ইজারা পাইতেন। এই ইজারাদারগণ প্রজাদের কাছ হইতে খাজনা আদায় করিতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর প্রবর্তিত ইজারাদারি প্রথা হইতেই ব্রিটিশ আমলে জমিদারি প্রথার জন্ম হইয়াছিল।

সামাজিক অবস্থা

গুপ্ত ও সুলতানী যুগে যে সামাজিক অবস্থা প্রচলিত ছিল, মোগল যুগে উহার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতের সমাজ যেন বদ্ধ ডোবার মত শত শত বৎসর ধরিয়া স্থির নিশ্চল হইয়াছিল।

বিদেশীদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দেশে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। পর্তুগীজ পাদ্রী মনসারেট লিখিয়াছেন—আফিঙ, ভাঙ বা ধুতরা খাওয়াইয়া মেয়েদের অজ্ঞান করিয়া মৃত স্বামীর চিতায় পাঠান হইত। বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। পূর্বের মত মোগল যুগেও হিন্দুগণ বহু দেবদেবীর মূর্তি পূজা করিত। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের লিখিয়াছেন—গ্রহণ উপলক্ষে মেয়ে-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক দল বাঁধিয়া স্নান করিত। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হইত।

সমাজের উপর তলায় অবস্থান করিতেন অভিজাতগণ। তাঁহারা জায়গির ভোগ করিতেন। মনসারেট লিখিয়াছেন—ধনীরা বাস

করিত বড় বড় বাড়ীতে। বাড়ীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কৃত্রিম ফোয়ারা হইতে অবিরাম জলধারা নির্গত হইত। বার্নিয়ের লিখিয়াছেন—ধনীরা ব্যবহার করিতেন মূল্যবান পোশাক, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার। সুসজ্জিত পালকীতে বসিয়া তাঁহারা যাতায়াত করিতেন, সঙ্গে চলিত একদল চাকর।

সাধারণ মানুষের অবস্থা কি ছিল? বার্নিয়ের লিখিয়াছেন—প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং জায়গিরদারদের অত্যাচারে কৃষক এবং কারিগরদের জীবন দুর্বিষহ ছিল। জায়গিরদারদের অত্যাচারের জন্য চাষী ভাল করিয়া জমি চাষবাস করিত না। মনস্যুরেট লিখিয়াছেন—সাধারণ মানুষ বাস করিত ছোট ছোট কুঁড়েঘরে।

মুসলমানদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? বাংলা দেশের মুসলমানদের জীবনযাত্রার সুন্দর বিবরণ মেলে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে:

"ফজর সময় উঠি বিছায়া লোহিত পাটি
পাঠাবরি করয়ে নামাজ।
ছিলমালী মালা ধরে জপে পীর পয়গম্বরে
পীরের মোকামে দিই সাঁজ॥

মাথে নাহি রাখে কেশ
মুখে আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
টুপি মাথে, ইহার পরয়ে দৃঢ় পাগড়ি॥"

অর্থনৈতিক অবস্থা

মোগল যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিপুল প্রসারলাভ করিয়াছিল।

ইতিপূর্বে ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই পথ ধরিয়া পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী,ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশী বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসেন। বহির্বাণিজ্যে ভারতেরই লাভ হইত বেশী। বার্নিয়ের লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষ অফুরন্ত ধন-সম্পদের দেশ। পৃথিবীর সোনারূপার ভারতে প্রবেশদ্বার অনেক ; কিন্তু নির্গমের দ্বার নাই একটিও। সোনারূপা দিয়াই বিদেশী বণিকগণ ভারতের মসলিন, রেশম, নীল প্রভৃতি পণ্য কিনিতে পারিত। তাই বাণিজ্যের ফলে প্রচুর সোনারূপা ভারতে আসিয়া জমিত। তখন সুরাট, ব্রোচ, সপ্তগ্রাম, মসলিপত্তনম ছিল সমৃদ্ধ বন্দর। এই সকল বন্দর হইতে বাণিজ্য-সম্ভার বোঝাই জাহাজ পেগু, শ্যাম, আরাকান, ওরমুজ, মাদাগাস্কার প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত।

বাণিজ্যের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, ভারত তখন শিল্পে উন্নত ছিল। অবশ্য এই শিল্প হস্তচালিত, যন্ত্রশিল্প তখনও দেশে প্রবর্তিত হয় নাই। বাড়ীতে বসিয়া ছোটখাট যন্ত্রপাতি (যেমন তাঁত) দ্বারা কারিগরগণ তৈয়ার করিতেন নানারকম শিল্পদ্রব্য, যথা—বিভিন্ন রকমের বস্ত্র এবং মসলিন, রেশম এবং রেশমবস্ত্র। যন্ত্রপাতির মালিকও ছিলেন কারিগরগণ। জিনিসপত্র রাঙাইবার জন্য তখন নীলের জুড়ি ছিল না। তাই নীল ছিল খুবই মূল্যবান পণ্য এবং ইহা ভারতে উৎপন্ন হইত। হস্তশিল্পই ছিল দেশের বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা। প্রায় ঘরে ঘরে তাঁত ছিল। মেয়েরা হস্তশিল্পে অংশ গ্রহণ করিত। ভারতের কারিগরগণ এমন অপরূপ সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত করিতেন যে, ইউরোপ উহার সহিত প্রতিযোগিতায় হার মানিয়াছিল।

বাণিজ্যের কেন্দ্রে, হস্তশিল্পের কেন্দ্রে, রাজধানী এবং শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ জনবহুল নগরী গড়িয়া উঠিয়াছিল; যথা—দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, লাহোর, পাটনা, ঢাকা, রাজমহল, বারাণসী, আমেদাবাদ, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, দৌলতাবাদ ইত্যাদি। এই সকল নগরীতে অবস্থান করিতেন রাজকর্মচারী, সৈনিক, বণিক, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণী। অবশ্য জনবহুল নগরীর অস্তিত্ব থাকিলেও, ব্যাপক জনসাধারণ বাস করিত গ্রামে। সহর-বাসীর তুলনায় গ্রামবাসীর সংখ্যা কয়েক গুণ বেশী ছিল।

বড় বড় নগরে টাকশাল ছিল। কেনা-বেচার জন্য ব্যবহৃত হইত রৌপ্যমুদ্রা, তামার পয়সা এবং কড়ি। ৪০টি কড়িতে এক পয়সা হইত। মুদ্রা জাল করিলে অপরাধীর হাত কাটিয়া ফেলা হইত।

মোগল যুগে বাংলার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন বার্নিয়ের—ধনধান্যে, ফুলে-ফলে ভরা ছিল সোনার বাংলা। বাংলার পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান প্রতিবেশী দেশগুলিতে, এমন কি দূর দেশেও চালান যাইত। বাংলা দেশে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত। সূতীবস্ত্র, রং ও রেশমের জন্য বাংলা দেশ ছিল প্রসিদ্ধ। দেশে আম, আনারস, আদা, লেবু প্রচুর ফলিত। জিনিসপত্র বেশ সস্তা ছিল। এক টাকায় বিশটা মুরগী পাওয়া যাইত।

সাহিত্য

মোগল যুগে প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও শৃঙ্খলার কল্যাণে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস-গ্রন্থ, বাংলা ভাষায় পাঁচালী ও বৈষ্ণব সাহিত্য এবং হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য।

ফারসী সাহিত্য (ইতিহাস)—আবুল ফজলের "আকবরনামা", "আইন-ই-আকবরী"; বদায়ুনির "তারিখ-ই-বদায়ুনি"; ফিরিশ্‌তার "ইতিহাস", খাফী খাঁর "মুন্তখব্‌-অল্‌-লুবাব"; বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল" (মঙ্গলকাব্য), কাশীরাম দাসের "মহাভারত" (পাঁচালী), কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" (জীবনী), বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" (জীবনী) ইত্যাদি।

হিন্দী সাহিত্য—তুলসীদাসের "রামচরিত-মানস", অন্ধকবি সুরদাসের "সুরসাগর"; হাস্যরসিক বীরবলের কাব্য ইত্যাদি।

মারাঠী সাহিত্য—শিবাজীর সমসাময়িক রামদাস ও তুকারামের রচনাবলী

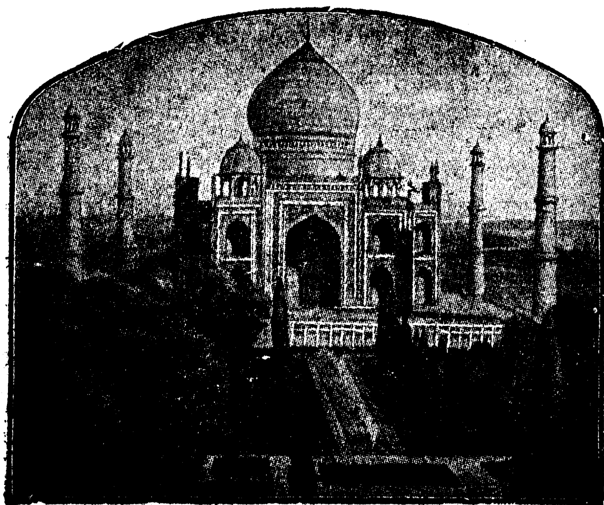
মোগল যুগের স্থাপত্য ভারতের গৌরব। একমাত্র আওরঙ্গজেব ছাড়া মোগলসম্রাটগণ প্রায় সকলেই দুর্গ, সমাধিমন্দির, প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য ও কারুকার্যে সেগুলি অতুলনীয়।

মোগল যুগের স্থাপত্যশিল্পে ভারতীয় ও পারস্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এই যুগের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আজও টিকিয়া আছে; যথা—

আকবর—আগ্রার দুর্গ; ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদগুলি; সেকেন্দ্রা ইত্যাদি।

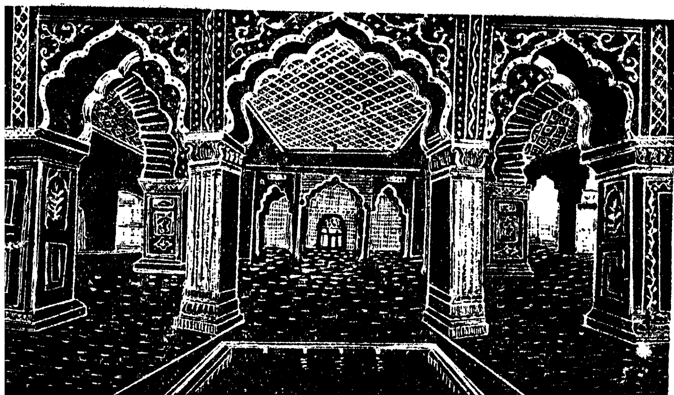


আগ্রার দুর্গ



আগ্রার তাজমহল

জাহাঙ্গীর—মার্বেল পাথরে তৈয়ারী ইতিমদ্‌উদ্দৌলার সমাধি-মন্দির, আগ্রা; সেকেন্দ্রার সমাধি-মন্দির তাঁহার সময়ে সমাপ্ত হইয়াছিল।



দেওয়ান-ই-খাস (দিল্লী)



দেওয়ান-ই-আম (দিল্লী)

শাহ্‌জাহান—দিল্লীর লালকেল্লার "দেওয়ান-ই-আম" ও "দেওয়ান-ই-খাস", দিল্লীর "জাম-ই-মসজিদ", আগ্রার "তাজমহল" ইত্যাদি।



ময়ূর-ময়ূরী (মোগল চিত্র)

স্থাপত্যের মত মোগল যুগের চিত্রশিল্পেও ভারতীয় ও পারসীক রীতির সমন্বয় দেখা যায়। আকবরের সময়ে ১৭ জন প্রধান চিত্র-শিল্পীর মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন হিন্দু। এই যুগে রাজপুতানায়, বিশেষ করিয়া জয়পুরে চিত্রশিল্পের উন্নতি দেখা গিয়াছিল।

ঘটনাপঞ্জী

বাবর: পানিপথের প্রথম যুদ্ধ	...	১৫২৬	সাল
শেরশাহ্: হুমায়ুনের পলায়ন	...	১৫৩৯	„
হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তন	...	১৫৫৫	„
আকবরের রাজত্বকাল	...	১৫৫৬-১৬০৫	„
আওরঙ্গজেবের মৃত্যু	...	১৭০৭	„

অনুশীলনী

১। মোগল যুগের শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি? ইহার সহিত আধুনিক যুগের শাসন-ব্যবস্থা তুলনা কর।

২। মোগল যুগের জায়গিরদারি ও বর্তমানের জমিদারি প্রথার তুলনা কর।

৩। মোগল যুগে হিন্দু ও মুসলমানের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও।

৪। মোগল যুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ কি?

৫। মোগল যুগের বন্দর ও নগরীগুলির নাম কর। নগরীগুলি কি করিয়া গঠিত হইল?

৬। হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে তফাৎ কি? মোগল যুগে ইহার কোন্‌টি চালু ছিল?

৭। মোগল যুগের প্রধান শিল্পদ্রব্যের বিবরণ দাও।

৮। মোগল যুগে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ রচনা কর।

৯। মোগল যুগের শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

১০। মোগল যুগ এবং বর্তমান যুগের সমাজজীবনের মধ্যে মিল এবং পার্থক্য কোথায়?

ষোড়শ অধ্যায়

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ; ইউরোপীয়দের আগমন ; অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ

নাদিরশাহের আক্রমণের পরে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয় পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাটগণ তখন নামেমাত্র সম্রাট। দেশব্যাপী চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার এই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বাংলা, অযোধ্যা ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল মারাঠাগণ। ইতিমধ্যে ভারতের দিগন্তে একটি নক্ষত্র ঝিকিমিকি জ্বলিতেছিল—উহা উদীয়মান বৃটিশ শক্তি।

ইউরোপীয়দের আগমন

প্রধানতঃ বাণিজ্যের তাগিদেই ইউরোপীয়দের ভারতে আগমন ঘটে। প্রাচীন যুগ হইতেই তাহাদের কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন ছিল, যথা—মসলা, তূলা, রেশম ইত্যাদি। এই জিনিসগুলি আসিত এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে। ইউরোপের বাজারে এই জিনিসগুলির বিপুল চাহিদা ছিল। এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করিবার জন্যই ইউরোপীয়গণ সরাসরি জলপথে প্রাচ্যের সোনার দেশগুলিতে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া কালিকট বন্দরে পৌঁছেন। ভাস্কো-ডা-গামার আবিষ্কৃত পথ ধরিয়া এই দেশে আসিতে লাগিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি। ভারতের বিভিন্ন অংশে ইহারা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিল।

পর্তুগীজগণ—গোয়া, দমন, দিউ, সালসেটি, হুগলী, বেসিন, বোম্বাই

ওলন্দাজগণ—গুজরাট, সুরাট, চুচুঁড়া, কাশিমবাজার, পাটনা

ফরাসীগণ—চন্দননগর, মসলিপত্তনম, সুরাট, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল

ইংরাজগণ—সুরাট, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হুগলী, কাশিমবাজার, পাটনা, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রথমে পর্তুগীজদেরই প্রাধান্য ছিল। ১৫১০ সালে গোয়া জয় করিয়া তাহারাই প্রথমে ভারতের মাটিতে বিদেশী পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে বাণিজ্য জগতে নব নব প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়—ওলন্দাজ এবং ইংরাজ। ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পর্তুগীজগণ পরাজিত হন। পরে ওলন্দাজগণ ইংরাজদের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হন। তারপর সুরু হয় ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘর্ষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরাজগণই ফরাসীদের পরাজিত করিয়া ভারতে প্রাধান্যলাভের পথ পরিষ্কার করে।

বঙ্গদেশ

বঙ্গদেশ হইতেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা। ১৭৫৭ সালে পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজগণ বাংলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়েঃ

"সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ,
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে।"

দক্ষিণ ভারত ঃ মহীশূর

দক্ষিণ ভারতে মহীশূর একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহীশূরের হায়দার আলি এবং তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান অপূর্ব বীরত্বের সহিত ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৮১ সালে পোর্টোনোভোর যুদ্ধে স্যার আয়ার কূটের নিকট হায়দার আলি পরাজিত হন। পরের বৎসরই ভগ্নহৃদয়ে তিনি মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পরে টিপু সুলতান ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং ১৭৯৯ সালে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনমের দুর্গের তোরণে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। মহীশূর রাজ্যটি ইংরাজ এবং হায়দরাবাদের নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নেন।

মারাঠাগণ

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের শেষ দৃশ্যে মারাঠাগণ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছিল। মনে হইল মারাঠাগণ বুঝি ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইবে। কিন্তু ১৭৫৯ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে নাদির শাহের অন্যতম সেনাপতি আফগানিস্থানের স্বাধীন রাজা আহম্মদশাহ্ দুর্‌রানী মারাঠাদের শোচনীয় ভাবে 'পরাজিত করিলেন। মারাঠাগণ পানিপথের বিপর্যয়ের ধাক্কা ক্রমশঃ সামলাইয়া উঠিল। ইংরাজদের সহিত তাহাদের শক্তি পরীক্ষা সুরু হইল। ১৮১৭ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের পতন ঘটিল।

ইংরাজদের সাফল্যের কারণ

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে ইংরাজগণ কি করিয়া এত সহজে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল? 'বণিকের মানদণ্ড' কি করিয়া 'রাজদণ্ডে' পরিণত হইল?

ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, ভারতবাসীর অনৈক্যই ইংরাজদের

সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী ঐক্যবদ্ধ-ভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। এই যুদ্ধে সেনাপতি মীরজাফর এবং বণিক জগৎশেঠ ও উমিচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা সুবিদিত। হায়দর আলির সহিত মারাঠাগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন নাই। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে রাজপুতগণ মারাঠাদের সহিত যোগ দেন নাই। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারাঠাগণও মিলিতভাবে যুদ্ধ করেন নাই। ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, বরোদার গাইকোয়ার, বিদর্ভের ভোঁসলা নিজেদের মধ্যে অবিরাম আত্মকলহে নিমগ্ন হইয়া শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ একে একে তাঁহাদের প্রত্যেককেই পরাজিত করিলেন। উহারা ঐক্যবদ্ধ-ভাবে যুদ্ধ করিলে ইতিহাসের গতি কি হইত বলা যায় না।

যে কোন দেশের শক্তির উৎস জাতীয় ঐক্য। জাতির বিভিন্ন অংশ বহুধা বিভক্ত থাকিলে, উহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের ইতিহাসের ইহাই প্রধান শিক্ষা।

শুধুমাত্র সামরিক কৌশলের কল্যাণে ইংরাজগণ এদেশে সাম্রাজ্য-স্থাপনে সফল হইয়াছিলেন—এই কথা পুরাপুরি সত্য নয়। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ কি সামরিক কৌশলের জন্য জয় লাভ করিয়াছিলেন? হায়দার আলি এবং মারাঠাগণ কয়েকটি যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজিত করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে ইতিহাসের গতি কি অন্যরূপ হইত না?

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী একটি ওলট-পালটের যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ইংরাজগণ তখন ভারতের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ পরিচালনায় এবং সাম্রাজ্য স্থাপনেই ব্যস্ত। একটি সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা তখনও প্রবর্তিত হয় নাই। রেলগাড়ী, ডাকবিভাগ,

রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচের জন্য খাল কাটা ইত্যাদি সবই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগলসম্রাট শাহ্‌ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ানী লাভের পরে ইংরাজদের প্রধান দৃষ্টি ছিল রাজস্ব আদায়ের দিকে। ভারতে যে সকল যুদ্ধ চলিতেছিল উহার বিপুল ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। তাই ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের দিকেই ইংরাজদের দৃষ্টি ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি অতি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬ সন) বাংলায় দেখা দিল এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ—'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, অনেক সমৃদ্ধ জনপদ জঙ্গলে পরিণত হইল। দুর্ভিক্ষের ভীষণ ধ্বংসলীলা হইতে মানুষকে বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থাই হইল না, অথচ দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইংরাজগণ ক্রমশঃ ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকেন। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলিকাতায় স্থাপিত হইল কয়েকটি বিলাতী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (Agency Houses); যথা—মেসার্স ফার্গুসন, ফেয়ার্লি এণ্ড কোং, কোলভিন্‌স্‌ এণ্ড ব্যাজেট ইত্যাদি। এই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। লবণের ব্যবসা তো ছিল ইংরাজদের একচেটিয়া। ইংরাজগণ এদেশ হইতে প্রধানতঃ সংগ্রহ করিত বস্ত্র, তুলা, নীল, চিনি, আফিম ইত্যাদি। ভারতীয় বণিকেরা দেশের

আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতে লাগিল, আর তাঁহাদের স্থান দখল করিল বিদেশী বণিকগণ।

"বানিয়া"

একদল দেশী বণিক ইংরাজদের "বানিয়া" (bania) হিসাবে কাজ করিত। বানিয়াদের কাজ ছিল গ্রাম গ্রামান্তর হইতে পণ্য (যথা তুলা, নীল ইত্যাদি) সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ বণিকদের নিকট জমা দেওয়া। বিদেশী হওয়ায় স্বভাবতঃই ইংরাজদের এই বানিয়াদের উপর নির্ভর করিতে হইত। 'বানিয়া'-গিরি করিয়া অনেকে খুবই বিত্তবান হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে এই বানিয়াদের অনেকের নামও আমরা জানি—হৃদয়রাম, অক্রূর দত্ত, "নবকিশেন", গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি। "নবকিশেন"ই পরে মহারাজা নবকৃষ্ণ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহই পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলার মত বোম্বাই, ব্রোচ এবং সুরাটে পার্শীরা বিদেশী বণিকদের বানিয়ার কাজ করিতেন। পার্শীরাও এই ব্যবসায়ে বিরাট লাভ করিতেন। অনেক সময় ইঁহারা ইংরাজদের দোভাষীর কাজও করিতেন। বিদেশী জাহাজে ইঁহারা দেশে-বিদেশে যাইতেন। এইভাবে একদল পার্শী বণিক খুবই বিত্তবান হইয়াছিলেন।

অনুশীলনী

১। কি করিয়া বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল ?
২। ভারতে ইউরোপীয়গণ কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন ?
৩। ভারতে ইংরাজদের সাফল্যের কারণ কি ?
৪। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য কি ?
৫। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কি ?
৬। বাংলা দেশের 'বানিয়া'দের সম্পর্কে কি জান ?

সপ্তদশ অধ্যায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ; শাসন-ব্যবস্থা ; ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭

ঐতিহাসিকগণ বলেন, ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন, ওয়ারেন হেস্টিংস উহাকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, আর ওয়েলেস্‌লী এবং ডালহৌসী উহার সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ সালের "প্রাসাদবিপ্লব"-এর নেতা ক্লাইভ। দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রাধান্য বিলোপের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে হায়দার আলির পতন ঘটে এবং প্রথম ইংগ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেস্‌লী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এক নূতন নীতি—অধীনতা-মূলক মিত্রতার নীতি। এই নীতির মূল কথা ছিল এই যে, ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করিয়া উহাদেব মিত্রতা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার সময়ে দিল্লী, অযোধ্যা, মহীশূর, হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, সুরাট এবং তাঞ্জোর বৃটিশ প্রভাবাধীন হইয়াছিল। লর্ড হেস্টিংসের সময় মারাঠাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং মধ্য ভারত ও রাজপুতনায় (উদয়পুর, জয়পুর, কিষণগড়, প্রতাপগড়, জয়সলমীর ইত্যাদি রাজপুত রাজ্যগুলি) বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হইতে ১৮১৮ সালে রাজপুতনায় বৃটিশ প্রভুত্বের বিস্তার—এই মাত্র ৬১ বৎসরের মধ্যে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ৬১ বৎসরে ভারত ক্রমশঃ উহার স্বাধীনতা হারাইয়াছিল।

শিখদের উত্থান ও পতন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে উত্তর ভারতে যে শিখজাতি বৃটিশ প্রভুত্বের সম্মুখীন হইয়াছিল, উহার উত্থান ও পতন ঘটে। রণজিৎ সিংহ বিবদমান শিখ মিস্‌ল্‌ বা দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া "খালসা" নামে সামরিক বাহিনী গঠন করিয়া একটি অখণ্ড শিখরাজ্য গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ১৮০৯ সালের অমৃতসর চুক্তি অনুসারে শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরে তাঁহার প্রভাব সীমাবদ্ধ রহিল। কাশ্মীর ও পেশোয়ারেও তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে শিখরাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। লাহোর দরবারের নেতারা এবং খালসা সেনার মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইল। অতঃপর ইংরাজদের সহিত শিখদের যুদ্ধ বাধিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে শিখসেনা প্রশংসনীয় বীরত্ব এবং সাহস দেখাইয়াছিল, কিন্তু সেনাপতিগণের চরম ও অবিশ্বাস্য অযোগ্যতার জন্য তাঁহারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইলেন। ১৮৪৯ সালে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

ব্রহ্ম

লর্ড ডালহৌসীর সময় দ্বিতীয় ইংগ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘটে। ইতিপূর্বে বর্মীগণ পেগু, আরাকান, মণিপুর ও আসাম জয় করিয়া বাংলা দেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলে, ইংরাজদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে। ইহাই প্রথম ইংগ-ব্রহ্ম যুদ্ধ। ১৮২৬ সালে দুই পক্ষে সন্ধি হয় এবং আসাম, মণিপুর, আরাকান ও টেনাসেরিমে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ইংগ-ব্রহ্ম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডালহৌসী নিম্ন ব্রহ্ম অধিকার করেন (১৮৫২ সাল)।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য

হেস্টিংসের সময় 

ওয়েলেসলীর সময় 

ডালহৌসীর সময় 

কাশ্মীর
আফগানিস্তান
তিব্বত
লাহোর
মুলতান
দিল্লী
নেপাল
ভূটান
অযোধ্যা
যোধপুর
গোয়ালিয়র
আসাম
রাজপুতানা
এলাহাবাদ
বিহার
বঙ্গদেশ
কচ্ছ
কলিকাতা
নাগপুর
দিউ
বোম্বাই
নিজামের রাজ্য
পুনা
উত্তর সরকার
হায়দরাবাদ
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
আরব সাগর
মহীশূর
মাদ্রাজ
মাহে
পণ্ডিচেরী
কারিকল
সিংহল

স্বত্ব-বিলোপের নীতি

ডালহৌসী আশ্রিত রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার মানসে স্বত্ব-বিলোপের নীতির (Doctrine of Lapse) উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই নীতি অনুসারে মারাঠাদের সাতারা রাজ্য প্রথম বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তারপর তিনি ঝাঁসী, নাগপুর এবং আরও কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিলেন। ডালহৌসীর সময় সিকিম রাজ্যের কিছু অংশ, উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুর এবং অযোধ্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ একবার বলিয়াছিলেন—"সব লাল হো যায়েগা।" তাঁহার কথাই সত্য হইল। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা উড়িতে লাগিল। হায়দার আলি ও টিপুসুলতান, মারাঠাগণ, শিখগণ,—শেষ পর্যন্ত সকলেই ইংরাজের নিকট পরাজিত হইলেন।

শাসন-ব্যবস্থা

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণ একটি শাসন-ব্যবস্থার পত্তন করিয়া চলিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রদেশগুলিকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করিলেন। জেলার দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য জজ সাহেব নিযুক্ত হইলেন। জেলা বিভক্ত হইল থানায় এবং থানার শান্তিরক্ষার ভার পড়িল দারোগার উপর। জেলার শাসন-ব্যবস্থার পুরোভাগে রহিলেন—কলেক্টর এবং জজ সাহেব। কলেক্টর রাজস্ববিভাগ এবং জজ সাহেব বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। অবশ্য এই সমস্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার অধিকার ছিল ইংরাজদের, ভারতীয়দের নয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক এই শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। তিনি কয়েকটি জেলা লইয়া একটি বিভাগ (Presidency) গঠন করিলেন। বিভাগের

ভার পড়িল কমিশনারের উপর। তাঁহার নীচে রহিলেন জেলার কলেক্টর। কলেক্টরকে সাহায্য করিবার জন্য একদল নূতন কর্মচারীর পদ সৃষ্ট হইল—ডেপুটি কলেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি। এই সকল উচ্চপদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হইল।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও ভারতীয় সাম্রাজ্য

পলাশীর যুদ্ধের পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় সাম্রাজ্য-শাসন করিতে থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল—এই একশত বৎসর এদেশে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইভাবে একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান একটি সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালিত করিতেছিল। প্রথম দিকে বৃটিশ পার্লামেণ্ট কোম্পানীর শাসন-কার্যে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। ক্রমশঃ পার্লামেণ্ট কয়েকটি আইন পাশ করিয়া কোম্পানীর শাসন নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করে। ইহার পরিণতিতে ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে পার্লামেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে।

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং এ্যাক্ট, ১৭৭৩

১৭৭৩ সালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ রেগুলেটিং এ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন পাশ করেন। এই আইন দ্বারা স্থির হইল যে, বাংলার গভর্নর 'গভর্নর-জেনারেল' বলিয়া অভিহিত হইবেন। গভর্নর-জেনারেল এবং চারজন সদস্য লইয়া একটি কাউন্সিল বা পরিষদ গঠিত হইবে। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত স্থাপিত হইবে।

পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪

প্রধান মন্ত্রী পিট একটি নূতন আইন পাশ করেন। এই আইন

অনুসারে ভারতের শাসন-ভার একটি বোর্ডের হাতে দেওয়া হইল। এই বোর্ড ইংলণ্ডের রাজা নিযুক্ত করিতেন। বোর্ডের সভাপতি হইলেন ইংলণ্ডেরই একজন মন্ত্রী অর্থাৎ পার্লামেণ্টের হাতে ভারত-শাসনভার কার্যতঃ চলিয়া আসিল।

১৮১৩ সালের সনদ

বৃটিশ পার্লামেণ্ট ১৮১৩ সালে Charter Act বা একটি সনদ পাশ করিয়া ভারতের বাণিজ্যে সকল ইংরাজদের অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইল। এতকাল এই লাভজনক বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, অন্যান্য বণিকেরা ভারতের বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। অবশ্য চীনের সহিত বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল।

নূতন সনদ, ১৮৩৩ সাল

১৮৩৩ সালের বেণ্টিঙ্কের সময় একটি নূতন সনদ বা চার্টার এ্যাক্ট পাশ হয়। ইতিমধ্যে প্রায় সমগ্র ভারতেই বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিল যে, কোম্পানীর ন্যায় একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের হাতে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-ভার রাখা হইবে কি-না। নূতন সনদ এই প্রশ্নের নিম্নলিখিত মীমাংসা করিল ঃ

১। কোম্পানীর নামেই ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসিত হইবে।

২। বাংলার গভর্নর সারা ভারতের গভর্নর-জেনারেল আখ্যা পাইবেন।

৩। গভর্নর-জেনারেল এবং তাঁহার পরিষদ বা কাউন্সিল ভারতের জন্য আইনকানুন পাশ করিতে পারিবেন।

৪। ভারতীয়গণ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

৫। চীনের বাণিজ্যে কোম্পানীর যে একচেটিয়া অধিকার ছিল, উহা অবলুপ্ত হইবে।

১৮৫৩ সালের সনদ

কুড়ি বৎসর পরে ডালহৌসীর সময় আবার একটি নূতন সনদ পাশ হইল। এই সনদ অনুসারে বাংলা এবং বিহারের শাসনভার একজন ছোট লাটের হাতে দেওয়া হইল। আইন প্রণয়নের জন্য ভারতে একটি Legislative Council বা ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। ইহাই কোম্পানীর শেষ সনদ।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, ১৮৫৭ সাল

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের মীরকাশিম, মহীশূরের হায়দার আলি ও টিপু সুলতান, মারাঠা ও শিখগণ যে সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন, উহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ধীরে ধীরে ভারতের মানচিত্র "লাল" হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতবাসীর মনে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল এবং এই বিক্ষোভ খণ্ড খণ্ড সংগ্রামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩১-৩২ সালে বর্তমান বারাসাতে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের বীর নেতা তিতুমীর "বাঁশের কেল্লা" গঠন করিয়া ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা, বিহার ও বাংলা দেশের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া সাঁওতাল কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দুইজন সাধারণ কৃষক—সিধু ও কানু। হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষকের এই অভ্যুত্থানে ইংরাজ শাসকগণ রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত অমানুষিক বর্বরতার অনুষ্ঠান করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহের মাত্র দুই

বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ' ঘটে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহকে "ভারতীয় মহাবিদ্রোহ" এবং "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শতদ্রু হইতে নর্মদা পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মীরাট, লখনৌ, কানপুর, দিল্লী, ঝাঁসী, মধ্যভারত, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহীগণ বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী দখল করিয়া স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মোগল-সম্রাট বাহাদুরশাহ কে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া-ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর অভ্যন্তরে একটি কোর্ট বা পরিষদ গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডে স্থানীয় কৃষক ও তালুকদারগণ বিদ্রোহী সিপাহীদের পক্ষে যোগ দিবার ফলে, এই অঞ্চলে এক গণ-অভ্যুত্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল। কানপুরে নানাসাহেব, মধ্যভারতে তাঁতীয়া টোপী, ঝাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারে কুনওয়ার সিংহ, অযোধ্যায় মৌলবী আহম্মদুল্লাহ্ এবং নবাবজাদা ফিরুজশাহ্ ছিলেন বিদ্রোহের নেতা। সহস্র সহস্র সিপাহী ও কৃষকদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী মহা-বিদ্রোহকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঝাঁসীর অমর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের কুনওয়ার সিং, অযোধ্যার মৌলবী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। তাঁতীয়া টোপীর ফাঁসী হয়, আর নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে চিরকালের জন্য আত্মগোপন করেন। ফিরুজশাহ্ ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজা সর্বতোভাবে ইংরাজদের সাহায্য করেন। গোয়ালিয়রের স্যার দিনকর রাও, হায়দরাবাদের



ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

স্যার সালার জঙ্গ, নেপালের জঙ্গ বাহাদুর প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছিলেন।



বন্দী অবস্থায় তাঁতীয়া টোপী

রক্ত আর আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে ভারতের প্রথম

স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান ঘটে। ইংরাজগণ দিল্লী পুনরায় অধিক করেন। হাড্‌সন নামে এক ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ বাহাদুরশাহে পুত্রগণ এবং এক পৌত্রকে গুলী করিয়া হত্যা করেন। মহাবিদ্রোহে অন্যান্য ঘাঁটিগুলিও ইংরাজদের দখলে আসে

মহারাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৫৮ সাল

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডি কোম্পানীর শাসনেরও অবসান ঘটে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতী সাম্রাজ্যের শাসনভার সরাসরি বৃটিশ ক্রাউন বা রাজশক্তির হাে অর্পণ করে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী হিসাবে এ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়,—ভারতী রাজাদের অধিকার ও মর্যাদাকে সম্মান করা হইবে; জাতি-ধ নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতানুসারে সরকারী চাকরিতে নিযু করা হইবে। এলাহাবাদ দরবারের কয়েকদিন পরে শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুরশাহ্‌ ব্রহ্মের পথে যাত্রা করেন। ব্রহ্মে বন্দ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মহাবিদ্রোহের ঘটনাপঞ্জী

ঘটনা		তারিখ
মীরাটের বিদ্রোহ; বিদ্রোহীদের দিল্লী অধিকার	....	১০ই মে, ১৮৫৭ সাল
কানপুরের বিদ্রোহ	...	৬ই জুন "
বিদ্রোহীদের লখ্‌নৌ রেসিডেন্সি অবরোধ	...	১লা জুলাই "
ইংরাজদের দিল্লী পুনরুদ্ধার	....	১৮ই সেপ্টেম্বর "
কানপুর উদ্ধার	...	৬ই ডিসেম্বর "
মধ্য ভারত—ঝাঁসীর রাণীর মৃত্যু	...	জুন, ১৮৫৮ "
তাঁতীয়া টোপীর ফাঁসী	....	নভেম্বর, ১৮৫৯ "

অনুশীলনী

১। কর্ণওয়ালিস ও বেণ্টিঙ্কের শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

২। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সহিত ১৭৫৭-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সাম্রাজ্যের কি সম্পর্ক ছিল ?

৩। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কিভাবে সীমাবদ্ধ করিয়াছিল ?

৪। ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের সনদের তাৎপর্য কি ?

৫। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বৃটিশ শাসন ও ভারতীয় অর্থনীতি

বৃটিশ শাসনের যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নূতন ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা, যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন, ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলির ধ্বংস, বাণিজ্যে বিদেশীদের প্রাধান্য, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি—এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য। ইহা নিঃসন্দেহে এক নূতন যুগ। মোগল যুগের সহিত ইহার পার্থক্য মৌলিক। মোগল যুগে যে ভূমি-ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প, যানবাহন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এই যুগে উহাদের প্রকৃতি পাল্টাইয়া গেল।

ভূমি-ব্যবস্থা : জমিদারি প্রথা

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ চিরকালের জন্য জমির মালিক হইলেন। ইহার বিনিময়ে সরকারকে জমিদাররা নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক রাজস্ব দিতেন। মোগল আমলে জমিদাররা ছিলেন প্রধানতঃ রাজস্ব

আদায়কারী, বৃটিশ আমলে তাঁহারা হইলেন জমির মালিক। জমিদারি প্রথার ফলাফল কি হইল?

(ক) জমিদাররা জমির মালিক হইলেন বটে, কিন্তু জমির উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। দীঘি-পুষ্করিণীগুলি মজিয়া যাইতে লাগিল। খাজনা আদায়ের জন্য তাঁহারা প্রজাদের উপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ চালাইতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিতেন এবং তাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতেন। পরবর্তীকালে প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনকানুন পাশ করিতে হইয়াছিল।

(খ) কোম্পানীর সরকার উচ্চ হারে রাজস্ব নির্ধারণ করিয়াছিলেন। সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারিলে জমিদারি নিলামে উঠিত। ফলে বাংলার বহু প্রাচীন জমিদার ধ্বংস হইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদের স্থান দখল করিলেন এক নূতন শ্রেণীর জমিদার, যাঁহারা আরও নির্মম এবং বিবেকহীন।

(গ) লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"জমির বন্দোবস্ত স্থায়ী হইলে, দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকেই তাঁহাদের বিপুল পুঁজি ভূসম্পত্তি ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করিবেন।" ঠিক ইহাই ঘটিল। বাংলার বিত্তশালী ব্যক্তিগণ জমি কিনিতে লাগিলেন। জমি হইল ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস। এই জমি অবশ্য তাঁহারা প্রজাদের দ্বারা চাষ করাইতেন। এইভাবে জমির উপর নির্ভরশীল একদল মধ্যবিত্তের জন্ম হইল।

রায়তওয়ারী প্রথা

সারা ভারতে অবশ্য এই ব্যবস্থা চালু হয় নাই। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় স্যার মুনরোর তত্ত্বাবধানে মাদ্রাজে "রায়তওয়ারী" প্রথা

প্রবর্তিত হয়। এখানে জমিদারের সহিত নয়, রায়ত বা প্রজার সহিত জমির বন্দোবস্ত হইল। রায়তগণ সরাসরি সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতেন। অবশ্য এই রায়তরা সকলেই সমান জমি ভোগ করিতেন না। রায়তদের মধ্যে অনেকে ছিলেন শত শত বিঘা জমির মালিক। ইহারা নিজেরা জমি চাষও করিতেন না। ইহাদের নাম "রায়ত" হইলেও বাস্তবে জমিদারের মতই ইহাদের হাতে বহু জমি কেন্দ্রীভূত হইল।

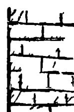
বাণিজ্যে বিদেশীর প্রাধান্য

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধিশালী। মোরল্যাণ্ড (Moreland) সাহেব মোগল যুগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

ইংরেজ আমলে ভারতের বাণিজ্য

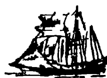
ভারতীয় পণ্য





শুল্ক প্রাচীর

ভারতের কাঁচা মাল



ইংল্যাণ্ডের কলকারখানায় প্রস্তুত



ভারতে আমদানি

"ভারতে বিদেশী সওদাগরেরা শুধুহাতে আসেন না, তাঁহারা সঙ্গে নিয়া আসেন তাল তাল সোনা এবং তাহার সবটাই রাখিয়া যান ভারতে ; এ যেন সব নদীর সাগরে মিলন।" ইংরাজ আমলে দৃশ্য পাল্টাইয়া গেল। বিদেশীরাই ভারতের বাণিজ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিল। বিদেশী জাহাজেই বাণিজ্য পরিচালিত হইত। আবার ভারতীয় পণ্যের বৃটিশ বাজারে চড়া শুল্ক দিতে হইত। অথচ বৃটিশ

পণ্য বিনা শুল্কে ভারতের বাজারে প্রবেশ করিত। বাণিজ্য ছিল এক-মুখী স্বাধীন বাণিজ্য ("One-way free trade") অর্থাৎ ভারতে বৃটিশ পণ্যের বিনা শুল্কে প্রবেশাধিকার ; আর বৃটিশ বাজারে ভারতীয় পণ্যের জন্য শুল্ক-প্রাচীর। এই একমুখী স্বাধীন বাণিজ্যের ফলে ভারতীয় বণিকদের সর্বনাশ হইল। ইংরাজদের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া তাঁহারা দৃষ্টি দিলেন জমির দিকে। একদিন যাঁহারা ছিলেন বণিক, এখন তাঁহারা হইলেন জমিদার।

প্রাচীন শিল্পের ধ্বংস

ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলি একে একে ধ্বংস হইতে লাগিল। পূর্বে ভারতীয় সূতা ইউরোপের বাজারে চালান যাইত। ইউরোপীয় বাজার হইতে ভারতীয় সূতা বিতাড়িত হইল। ভারতে আমদানি হইতে লাগিল বিলাতী সূতা এবং বিলাতী বস্ত্র। ফলে তাঁতীর তাঁত বন্ধ হইল। বিশ্ববিখ্যাত ঢাকার মস্‌লিন ধ্বংস হইল। সস্তা বিলাতী বস্ত্রে দেশ ছাইয়া গেল। শুধু সূতা এবং বস্ত্রই নয়, বিলাতী ছুরি-কাঁচি, তেল-সাবান, বাক্স-প্যাটরা ভারতের হাটে বাজারে মেলায় আমদানি হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র তাঁতী, কারিগর, কামার, কুমার হঠাৎ কর্মচ্যুত হইয়া পড়িল। তাঁহারা খাইবে কি ? তাঁহারা বাধ্য হইয়া জমির উপর চাপিয়া বসিল। ফলে জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিল। আদম-শুমারীর রিপোর্ট (Census Report) হইতে নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায় ঃ

কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের শতকরা হিসাব—

১৮৯১	৬১·১
১৯০১	৬৬·৫
১৯১১	৭২·২
১৯২১	৭৩·০
১৯৩১	৭৬·৬

কিন্তু কৃষির উৎপাদনের পরিমাণ এত বিপুল নয় যে, শতকরা
৭ জনের লালন-পালন সম্ভব। ফলে গ্রামদেশে চরম দারিদ্র্যের
ষ্টি হইল।

শিল্পের প্রবর্তন

বৃটিশ আমলেই ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হয়। মোগল যুগেও
ারতে বস্ত্র এবং অন্যান্য শিল্প ছিল, কিন্তু উহা যন্ত্র দ্বারা নয়,
স্ত দ্বারা চালিত হইত, তাই উহাকে হস্তশিল্প (Handicraft)
ল। কারিগরগণ বাড়ীতে বসিয়া তাঁত চালাইতেন এবং সূতা
াটিতেন। তাঁহারাই ছিলেন তাঁতের মালিক। বৃটিশ আমলে এই
ৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই যুগে স্থাপিত
ইল বিরাট বিরাট কারখানা (Factory), কারখানায় নানা
্র বসান হইল। শত শত মজুর এই সকল কারখানায় কাজ
রিত। কারখানার নিকটে মজুরদের বস্তিও স্থাপিত হইল।
াবখানা এবং উহার যন্ত্রের মালিক একদল পুঁজিপতি, মজুরগণ
া। উৎপাদনের এই ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Capitalist
stem)'নামে পরিচিত। মোগল যুগে যে কারিগরগণ স্বাধীন
াবে ঘরে বসিয়া তাঁত বুনিত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহারা হইল
ারখানার মজুর। গ্রাম হইতে জমিহারা কৃষকরাও কারখানায়
জুর খাটিতে আসিল। ইউরোপীয়গণ পাট এবং কয়লাশিল্প স্থাপন
রে। ১৮৫৪ সালে বর্তমান হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে অক্ল্যাণ্ড
হেব বিদেশী মূলধন এবং পরিচালনায় প্রথম যন্ত্রচালিত পাটকল
পন করেন। এই পাটশিল্প ক্রমশঃ সমৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল,
ননা "প্যাকেজ ম্যাটিরিয়াল" হিসাবে পাটের দড়ি এবং বস্তার
াকক্ষ কোনো জিনিস দুনিয়ায় ছিল না। হুগলী নদীর দুই পাড়ে

বিদ্যুৎ-আলোকিত চটকলগুলি ইংলণ্ডের শিল্পসমৃদ্ধির পথ আলোকিত করিয়া চলিল।

কলিকাতার অদূরে রাণীগঞ্জে স্থাপিত হইল কয়লাখনি। ১৮৪৩ সালে বেঙ্গল কোল কোম্পানী স্থাপিত হইল। ১৮৬০ সালে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় ৫০টি কোলিয়ারী চালু হইয়া গেল।

ইংরাজগণ আরও একটি শিল্প গড়িয়া তুলিলেন—চা। ইহা অবশ্য যন্ত্রশিল্প নয়, ইহা বাগিচা-শিল্প (Plantation industry) নামে অভিহিত। আসাম এবং উত্তরবঙ্গ চা-শিল্পের কেন্দ্র। ১৮৬০ সালে চা-বাগানের সংখ্যা হইল ৪৮টি।

বোম্বাই এবং আমেদাবাদে ভারতীয়গণ ভারতীয় মূলধনে গড়িয়া তুলিল বস্ত্রশিল্প। ১৮৫৪ সালে পার্শী পুঁজিপতি কোয়াসজী নানাভয় দাভর বোম্বাইতে যন্ত্রচালিত কাপড়ের কল স্থাপন করিলেন। ১৮৬১ সালে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়াইল ৯টি, ১৮৬৫ সালে ১৩টি এবং ১৮৭৭ সালে ৫১টি। বোম্বাইর একপাশে দেখা দিল সাবিবদ্ধ কারখানার চিমনী; বিরাট বিরাট কারখানা, সিমেণ্টের পাকা রাস্তা। ভারতীয় পুঁজিপতিদের রাজধানীরূপে আবির্ভূত হইল, বোম্বাই নগরী।

যে কোন দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির বনিয়াদ হইল লোহা ও ইস্পাত শিল্প। লোহা ও ইস্পাত হইতেই তৈয়ারী হয় কলকারখানায় যন্ত্রপাতি, রেল লাইন, ইঞ্জিন ইত্যাদি। ১৯০৭ সালে জামসেদপুরে স্থাপিত হইল লোহা এবং ইস্পাতশিল্প—"টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী" এবং যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা,তাঁহার নাম জামসেদজী টাটা।

রেল ও রাস্তা

ইংরাজ আমলে পরিবহণ-ব্যবস্থায় এক বিপ্লব ঘটিল। গরুর গাড়ীর জায়গায় আসিল রেলগাড়ী, নৌকার স্থলে জাহাজ ও স্টীমার,

আর মোগল যুগের ভাঙ্গাচুরা কাঁচা মাটির রাস্তার স্থলে পিচ-ঢালা রাস্তা (metalled road)।

কারখানার মালপত্র গ্রাম-গ্রামান্তরের হাটে-বাজারে, মেলায় পৌঁছানো এবং গ্রাম হইতে পাট, তুলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বন্দরে এবং সহরে আনার জন্যই রেল ও রাস্তার প্রয়োজন ছিল। এই বাণিজ্যিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা তৈয়ার হইয়াছিল। নগরী ও বন্দর যুক্ত হইল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক লাইনের মাধ্যমে, যেমন কলিকাতা ও বোম্বাই এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ রেললাইন দ্বারা সংযুক্ত হইল। তুলাচাষ এলাকা এবং কয়লাখনির দিকে রেললাইন প্রসারিত হইল, যেমন আহমেদাবাদ, গুজরাট, খান্দেশ, বেরার (তুলাচাষ এলাকা) সংযুক্ত হইল বোম্বাই, নাগপুর এবং শোলাপুর (বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র)-এর সহিত। ১৮৩৬ সালে কলিকাতা হইতে সর্বপ্রথম রেলপথ তৈরী হইল রাণীগঞ্জের কয়লাখনি পর্যন্ত।

ভারতে রেলপথ প্রসারের হিসাব নীচে দেওয়া হইল :

১৮৫৩ সাল	২০ মাইল
১৮৫৬ „	২৭৩ „
১৮৫৭ „	২৮৮ „
১৮৬১ „	১৮৮৮ „
১৮৮২ „	১০,১৪৪ „
১৮৯২ „	১৭,৮৯৪ „
১৯০০ „	২৪,৭৬০ „

১৮৫৩ সালে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত বিখ্যাত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সংক্ষেপে জি. টি. রোড) নির্মাণ শেষ হইল। সহরে এবং জেলায় জেলায় পিচের তৈরী প্রশস্ত রাস্তা এবং ইট-

সুরকীর রাস্তা নির্মিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ৩৭,০০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১,৩৬,০০০ মাইল কাঁচা ইট-সুরকীর রাস্তা হইয়া গেল।

পরিবহণ-ব্যবস্থার এই বিপ্লবের ফল কি হইয়াছিল ? প্রথমতঃ রেলগাড়ীর প্রবর্তন দেশের কুটিরশিল্পকে শেষ আঘাত হানিল। রেলপথে গ্রাম-গ্রামান্তরে কারখানায় প্রস্তুত জামা কাপড় ইত্যাদি দ্রুত পৌছানো সম্ভব হইল। এই সকল জিনিসের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ায়, কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হইল। কারখানায় প্রস্তুত জিনিসপত্র রেলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমদানি করা সম্ভব হইল। আভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হইবার ফলে কলকারখানার সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইল। তৃতীয়তঃ সমগ্র দেশে জিনিসপত্রের দর মোটামুটি একই রকম হইল। চতুর্থতঃ দূর দূর অঞ্চলে মানুষের পক্ষে যাতায়াত সহজ হইল।

অনুশীলনী

১। মোগল এবং ইংরাজ আমলের ভূমি-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

২। ইংরাজ আমলের ভূমি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছে ?

৩। ইংরাজ আমলে ভারতীয় বাণিজ্যের কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ?

৪। ইংরাজ আমলে ভারতীয় বণিকদের ভাগ্যে কি ঘটিল ?

৫। ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা এত বিপুল কেন ? ইহার সমাধান কি ?

৬। হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে তফাৎ কি ? ভারতের প্রধান যন্ত্রশিল্পগুলির বিবরণ দাও।

৭। রেল ও রাস্তার প্রয়োজনীয়তা কি ?

ঊনবিংশ অধ্যায়

নূতন ভারতের সূচনা

আমরা অষ্টাদশ শতাব্দী পার হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দী নূতন ভারতের সূচনার যুগ। এই যুগে দেশে টেলিগ্রাফের তার বসিল, শিল্পদ্রব্য এবং যাত্রী লইয়া রেলগাড়ী ছুটিয়া চলিল। নদীপথে বাষ্পীয় জাহাজের চলাচল সুরু হইল। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনের ফলে কলকারখানার কেন্দ্রগুলিতে নূতন নূতন সহর গড়িয়া উঠিল। সহরের বাসিন্দা হইলেন নানা শ্রেণীর লোক—ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, কারখানার মজুর, দোকানদার ইত্যাদি।

বাংলার নব জাগরণ *

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা সহরকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা দেশে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। বাংলা দেশে ইতিমধ্যে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতা সহরই ছিল এই নবীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান কেন্দ্র। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিলেন বাংলার নবজাগরণের নেতা। ইহার কারণ কি ?

(ক) মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ইহারা ইংরাজী ভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বইপত্র পড়িতে পারিলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত তাঁহারা পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনা বিকাশলাভ করিল। বিশ্বাসের স্থান দখল করিল যুক্তি। তাঁহাদের মনে নানা প্রশ্ন জমা হইল। ভারতের সনাতন বিধি-বিধান কি অভ্রান্ত ? সতীদাহ,

বিধবাবিবাহ, বহু বিবাহ কি সমর্থনযোগ্য ? বহু দেবদেবীর পূজা কি বেদসম্মত ? মূর্তিপূজা কি শাস্ত্রসম্মত ? এই সকল প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিন্তার জগতে এক নবজাগরণের সূত্রপাত হইল।

(খ) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যান্য অংশের (কৃষক, 'শ্রমিক ইত্যাদি) মধ্যে এই নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হইল না, কেননা উহারা তো ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে নাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে তখন পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া কৃষক-মজুরগণ মাতৃভাষায়ও শিক্ষিত ছিল না।

(গ) মুসলমানদের মধ্যেও প্রথমে এই নবজাগরণের বার্তা ছড়াইয়া পড়ে নাই, কারণ মুসলমান মধ্যবিত্তরা প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছিল।



রাজা রামমোহন রায়

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য কি ? শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি, সামাজিক ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন—এইগুলিই বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য। এই নবজাগরণের মধ্য হইতেই আধুনিক বাংলার জন্ম। মোগল যুগে বা কোম্পানীর শাসনের প্রথম

পর্বে যে বাংলা ছিল, উহার মধ্যে এই যুগে দেখা দিল এক পরিবর্তনের ধারা।

শিক্ষার প্রসার

এতকাল টোল এবং মাদ্রাসায় কেবল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী পড়ানো হইত। বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় তখন পড়ানো হইত না। ইংরাজী শিক্ষাও প্রবর্তিত হয় নাই। খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকগণই প্রথম এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন উইলিয়ম কেরী। তাঁহারই চেষ্টায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৭ সালে স্বনামধন্য ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় এবং হিন্দুদের দানে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। এই হিন্দু কলেজই পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৩৫ সালে সরকার এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৪ সালে স্যার চার্লস্ উড ইংলণ্ড হইতে তাঁহার সুবিখ্যাত শিক্ষা-সংক্রান্ত মতামত (Education Despatch) পাঠাইয়াছিলেন। উড সাহেবের এই মতামতকে কেন্দ্র করিয়া এদেশে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে ধাপে ধাপে কলেজী শিক্ষার সুপারিশ করিলেন এবং ইহার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহরে কলেজ এবং বড় বড় নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিলেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে বড় বড় সহরে কলেজ স্থাপিত হইল। এগুলি স্থাপিত হইয়াছিল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায়।

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ প্রভৃতি সহবগুলি ছিল কলেজগুলিব কেন্দ্র। মফঃস্বল সহরে তখন কলেজ ছিল না বলিলেই হয। বাংলা দেশে ১৮২৪ হইতে ১৮৬৫ সনের মধ্যে নিম্নলিখিত কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল ঃ

	সরকারী কলেজ	যে সালে স্থাপিত
১।	প্রেসিডেন্সি কলেজ	১৮৫৫
২।	ঢাকা কলেজ	১৮৪১
৩।	বহবমপুব কলেজ	১৮৫৩
৪।	কৃষ্ণনগব কলেজ	১৮৪৬
৫।	পাটনা কলেজ	১ ৬২
৬।	সংস্কৃত কলেজ	১৮৩৬
৭।	হুগলী কলেজ	১৮২৪
	বেসরকারী কলেজ	
৮।	ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলিকাতা	১৮৬৫
৯।	ডাভটোন কলেজ, কলিকাতা	১৮৬৫
১০।	ফ্রি চার্চ ইনস্টিট্যুসন, "	১৮৩০
১১।	জেনাবেল এ্যাসেমব্লিস ইনস্টিট্যুসন, কলিকাতা	১৮৫০
১২।	সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলিকাতা	১৮৬০

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পতন হইল বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তাব মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। বিশেষ করিয়া গ্রামদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। এমন কি কলিকাতাব বিভিন্ন স্কুলেও ছাত্র-সংখ্যা মোটেই বেশি ছিল না। ১৮৩৪ সালে কলিকাতায় কয়েকটি নাম-করা স্কুলে ছাত্র-সংখ্যা ছিল এই রকম ঃ

স্কুল	ছাত্র-সংখ্যা
হিন্দু কলেজ	৩০৮
ইউনিয়ন স্কুল	১২০
হিন্দু ফ্রি স্কুল	১৬০
পাদরী ডাফ সাহেবের পাঠশালা	৩৫০

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ পাইত। শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত ছিল। তদুপরি শিক্ষার মাধ্যম মাতৃ-ভাষা ছিল না। ফলে জনসাধারণের শতকরা প্রায় ৯০ জন নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের



দীনবন্ধু



বঙ্কিমচন্দ্র

অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারক উইলিয়ম কেরীর কথা

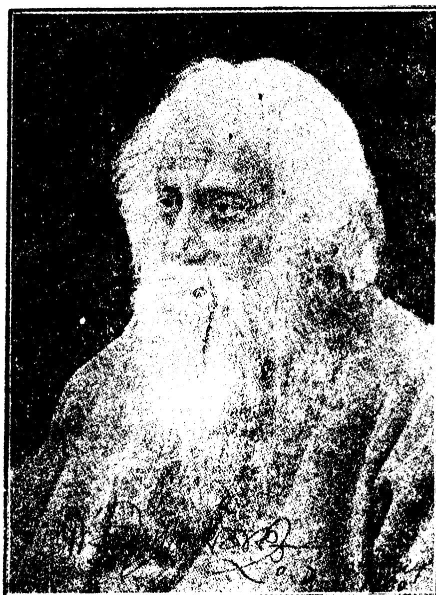
পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহারই চেষ্টায় বাংলা ভাষায় দুইখানি বই সংকলিত হইল—"কথোপকথন" ও "ইতিহাসমালা"। বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্তন তাঁহারই কীর্তি। বাংলা গদ্যের প্রথম শক্তিশালী লেখক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩)। বাংলা গদ্যে তিনি রচনা করিয়াছিলেন "বেদান্ত গ্রন্থ" ও "বেদান্ত



মাইকেল মধুসূদন

সার"। রামমোহনের সমসাময়িক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—১৮৫৯) সরল সহজ বাংলায় নীতি-আদর্শ, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা রচনা করিলেন। এই যুগেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০—১৮৯১) আবির্ভাব। প্রাচীন ভারতের নানা কাহিনী,

রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, সংস্কৃত কাব্যের গল্প প্রভৃতি ভিত্তি করিয়া তিনি বাংলা গদ্যে বহু পুস্তক রচনা করিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে এক নূতন যুগেব সূচনা



রবীন্দ্রনাথ

করিলেন মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। তাঁহারা রচনা করিলেন নূতন ধরনের কাব্য, নাটক, প্রহসন, গল্প ও উপন্যাস। বাংলা সাহিত্য ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নূতন মর্যাদা লাভ করিল।

বাংলা সংবাদপত্র

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। বাংলা দেশের ইতিহাসে বাংলা

ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রকাশ এক সম্পূর্ণ নূতন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষ দেশবিদেশের সংবাদের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেন। এই যুগে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ছিল :

সংবাদপত্রের নাম	সম্পাদকের নাম
সমাচারদর্পণ	মার্সম্যান
সংবাদকৌমুদী	রামমোহন রায়
সংবাদপ্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা ছাপাখানা

বাংলা ছাপার হরফ তৈরী হইবার পরে কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে বাংলা ছাপাখানা স্থাপিত হইল। ছাপাখানার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। ছাপাখানা ছাড়া তো বেশী সংখ্যায় এবং দ্রুত বই প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছাপাখানা না থাকিলে শুধু হাতে লিখিয়া কখানা বই বাহির করা সম্ভব ? শিক্ষার বিস্তারে সস্তায় এবং বেশী পরিমাণে বই প্রকাশে ছাপাখানার গুরুত্ব তাই অসীম। ছাপাখানার কল্যাণেই সে-যুগে সংবাদপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৩১ সালে চন্দ্রিকা ছাপাখানায় নিম্নলিখিত বই ছাপা হইয়াছিল :

বইয়ের নাম	মূল্য
কবিকঙ্কনের চণ্ডী	৬৲
রামায়ণ আদিকাণ্ড	৩৲
জয়দেব	৩৲
বিদ্যাসুন্দর	৪৲
নলদময়ন্তী উপাখ্যান	১৲
কৌতুকসর্বস্ব নাটক	১৲

সমাজসংস্কার আন্দোলন

হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ঘটনা। শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজে কতকগুলি বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, যথা—সতীদাহ, কুলীনদের বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি। হিন্দু সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সকল প্রথার পক্ষে ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল,—যেহেতু এই প্রথাগুলি দীর্ঘদিন চলিয়া আসিতেছে, অতএব এইগুলি ভাল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণের নায়ক রামমোহন রায় এবং মহান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সকল প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইলেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমাজপতিরা যে সকল যুক্তি দেখাইতেন, ইহারা সেই সকল যুক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র হইতে নানা উদ্ধৃতি সংগ্রহ করিয়া রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার সহায় ছিলেন আর একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী—রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর। রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষে রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হৈ-চৈ সুরু করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়লাট বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে বীভৎস, বর্বর সতীদাহপ্রথা আইন করিয়া নিষিদ্ধ করিলেন।

১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর হিন্দুসমাজকে চমকাইয়া দিয়া বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন সুরু করিলেন। সে যুগে অল্পবয়সে অনেক মহিলার স্বামী মারা যাইত। সারা জীবন ইঁহাদের বিধবার নিষ্ঠুর জীবন যাপন করিতে হইত। রক্ষণশীল হিন্দুদের তীব্র সমালোচনার মধ্যে হিমালয় পর্বতের মত অটল ও অবিচল থাকিয়া বিদ্যাসাগর

বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে তুমুল আন্দোলন চালাইয়া গেলেন। "বিধবা বিবাহ কেন হওয়া উচিত" নামে তাঁহার বই প্রকাশিত হইল।



ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব

তাঁহাব এই আন্দোলনেব ফলেই সরকাব বিধবা-বিবাহের আইন পাশ কবিলেন। বিদ্যাসাগব স্বয়ং বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা কবিলেন।

শুধু বিধবা-বিবাহ নয়, বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও বিদ্যাসাগব আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। সে-যুগে ব্রাহ্মণ কুলীনগণ বহুবার বিবাহ করিত। অনেকে তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বার পর্যন্ত বিবাহ করিত। এই কদর্য প্রথার ফলে বাঙালী মেয়েদের দুঃখকষ্টের সীমা ছিল না। দেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের বহু বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা রামমোহন রায় ১৮১৫ সাল হইতে ১৮১৭ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় বেদান্তের অনুবাদ বাহির করিয়া প্রচার করিলেন যে, বেদে এক ঈশ্বরের কথাই বলা হইয়াছে। পুরোহিততন্ত্র এবং মূর্তিপূজাকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসভার পত্তন করেন। যাহারা একজন ব্রহ্মে বিশ্বাসী এবং মূর্তিপূজার বিরোধী, তাঁহাদের লইয়াই 'ব্রাহ্মসমাজ' গঠিত হইল। ১৮৩০ সালে একটি প্রার্থনা-মন্দির স্থাপিত হইল।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসভার নেতা হইলেন। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় এই নূতন মতবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সেই যুগে তিনি বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায়, এমনকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপিত হইল। কেশবচন্দ্র হিন্দুদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করিলেন এবং অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিল। কেশবচন্দ্র নূতন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। সেই যুগে ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ঃ পরমহংসদেব

ব্রাহ্ম মতবাদ বিস্তারের যুগে হিন্দুধর্মের অনুগামীদের মধ্যে এক নূতন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এই আন্দোলনের

স্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রামকৃষ্ণ কালীর উপাসক ছিলেন ধর্ম সম্পর্কে তিনি উদার মত পোষণ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন—



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পৃথিবীর ভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা জলকে বিভিন্ন নাম দিলেও জল যেমন জলই থাকে, তেমনি আল্লা, হরি, খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ প্রভৃতি একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বিবেকানন্দ (আসল

নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৯৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো নগরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা সম্পর্কে এক অপূর্ব বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ তাঁহারই কীর্তি। বাংলার জেলায় জেলায় এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গড়িয়া উঠে। মঠের "মহারাজগণ" পীড়িত ও দরিদ্রের সেবা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রার্থনাসমাজ

বাংলা দেশ হইতে ব্রাহ্ম মতবাদ সুদূর মহারাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৬৭ সালে কেশব সেনের চেষ্টায় এখানে প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মত প্রার্থনাসমাজের অনুগামীরাও এক ব্রহ্মে বিশ্বাসী, কিন্তু ইঁহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতেন। মহারাষ্ট্র প্রার্থনাসমাজের নেতা ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে প্রার্থনাসমাজ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, হরিজনদের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা উৎসাহী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তাঁহারা স্থাপন করিলেন অনাথ আশ্রম, হরিজনদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, বিধবাদের আশ্রম ইত্যাদি।

আর্যসমাজ

পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। রামমোহনের মত তিনিও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন এবং জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং

বিধবা-বিবাহের তিনি সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন। তিনি বলিতেন,—তাঁহার সমস্ত মতবাদই বেদে আছে। দয়ানন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়া আর্যসমাজের ভিত্তি ব্যাপক করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের মতবাদ কিন্তু প্রধানতঃ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

•

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা ঃ

(ক) যাহা সনাতন, যাহা দীর্ঘ দিন ধরিয়া সমাজে চালু আছে, উহা কি ধ্রুব সত্য ? সতীদাহ, কুলীনদের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ হিন্দু সমাজে শত শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এইগুলি বর্তমানে আমাদের কাছে বর্বর ও বীভৎস প্রথা বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ আমাদের মন যুক্তিধর্মী। যুক্তি দিয়া আমরা কোন সামাজিক প্রথার দোষগুণ বিচার করি, অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা নয়। ঊনবিংশ শতকে যুক্তিধর্মী চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে, তাই এই নবজাগরণের গুরুত্ব এত বেশী।

(খ) ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মানুষের কথা, মানুষের সমস্যা, মানুষের দুঃখকষ্ট ইত্যাদি বড় ছিল, ভগবান বা আত্মার কথা নয়। মাইকেল মধুসূদন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে এবং দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটকে সাধারণ চাষীর জীবনের কথা বলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষ" এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে হিন্দু সমাজের নারী ও পুরুষের নানা সমস্যা তুলিয়া ধরিলেন। ইতিপূর্বে, অর্থাৎ মোগল যুগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে কি বই লিখিত হইয়াছিল ? কবিকঙ্কনের "চণ্ডী-মঙ্গল" বা কাশীরাম দাসের "মহাভারত," বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের

"চৈতন্যচরিতামৃত" ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে আলোচ্য বিষয় চণ্ডীর মাহাত্ম্য, চৈতন্যের মাহাত্ম্য, মহাভারতের কাহিনী ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় **মানুষ** এবং তাহার **সমাজজীবন**।

(গ) এই নবজাগরণ কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরে সীমাবদ্ধ রহিল কেন? কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ কলিকাতা সহরে বাস করিতেন। গ্রামদেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা ব্যাপক ছিল। গ্রামের মানুষের উপর সনাতন সমাজের প্রভাবও বেশী ছিল।

অনুশীলনী

১। শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ নবজাগরণের নেতা ছিলেন কেন?

২। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত বাংলার নবজাগরণের সম্পর্ক কি?

৩। বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য কি?

৪। নবজাগরণের যুগে বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। ছাপাখানা কিভাবে শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করে?

৬। ব্রাহ্ম মতবাদের সহিত হিন্দু ধর্মের পার্থক্য কোথায়?

৭। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের গুরুত্ব কি?

৮। আর্যসমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মতবাদ ও কার্যকলাপের তুলনা কর।

বিংশ অধ্যায়

স্বাধীনতার আন্দোলন; স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য

সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ভারতবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঁচিয়া রহিল। "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?"—রঙ্গলালের এই গান ভারতবাসীরই অন্তরের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে ক্রমশঃ জাতীয়তার চেতনা বিকাশ লাভ করিতে থাকে। সুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জাতীয়তার অর্থ

প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—জাতীয়তা মানে কি? জাতীয়তা বলিতে বুঝায় যে, প্রত্যেক জাতি নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র চালাইবে, রাষ্ট্রের উপর জাতিরই কর্তৃত্ব থাকিবে, বিদেশীর নয়। ইতিপূর্বে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশে, ইটালীতে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে, জাতীয়তার আদর্শ জয়ী হইয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতীয়তার ঢেউ পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত ভারতেও পৌঁছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জাতীয়তার সহিত পরিচিত হইয়া জাতীয় আন্দোলন গঠনে নেতৃত্ব করিলেন। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, জাতীয়তার আদর্শ ধীরে ধীরে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ভারত সভা

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নানা অভিযোগের মধ্যে একটি বড় অভিযোগ ছিল যে, উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে বৃটিশ সরকার মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে গৃহীত "ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষায়

পাশ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহাকে বিনা কারণে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইল। এই সুরেন্দ্রনাথই ১৮৭৬ সালে ভারত সভা (Indian Association) নামে এক প্রতিষ্ঠান পত্তন করিলেন। ১৮৭৮ সালে বড়লাট লর্ড লিটন দুটি আইন পাশ করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন এবং ভারতীয়দের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিলেন। ভারত সভা এই দুটি আইনের বিরুদ্ধে সভা করিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় এক সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহূত হইল। এই সম্মেলন দাবী করিল—প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন, সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার ইত্যাদি। এই দাবীগুলি লক্ষ্য করিবার মত। ভারতের নূতন জাতীয়তাবোধ এই দাবীগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।


সুরেন্দ্রনাথ

কংগ্রেসের জন্ম

১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বোম্বাইর পার্শী নেতা দাদাভাই নৌরজী। পরের বৎসর নৌরজী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলন কংগ্রেসের সহিত মিশিয়া গেল।

দেশের বৃহত্তম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম দিকে অবশ্য কংগ্রেস খুবই নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান ছিল। কংগ্রেসনেতারা বৃটিশ শাসকদের কাছে কেবল আবেদন-নিবেদন করিতেন এবং বিনীত ভাষায় সংস্কার প্রার্থনা করিতেন। কোন গণ-আন্দোলন তাঁহারা সংগঠিত করেন নাই।

বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন :

লর্ড কার্জনের "বঙ্গ-ভঙ্গ আইন" উপলক্ষ করিয়াই ভারতে এবং বিশেষ করিয়া বাংলায় গণ-আন্দোলন উত্তাল হইয়া উঠে এবং জাতীয়তা দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে, সহর হইতে উহা গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন দেশবাসীর মনে বিরাট সাড়া জাগায়। ভারতীয় মূলধনে, ভারতীয় মালিকানায় গড়িয়া উঠে নানা স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান—কাপড়ের কল, সাবানের কারখানা, দিয়াশলাই কারখানা, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি। মুকুন্দরাম দাস যাত্রাগানের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের বন্যা সৃষ্টি করেন। তাঁহার একটি বিখ্যাত গানে আছে :

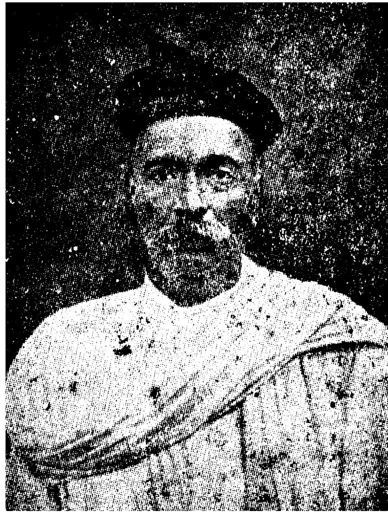
পণ করে সব লাগরে কাজে
খাটবো মোরা দিন রাত।
বাংলা যখন পরের হাতে
তখন কিসের মান আর কিসের জাত॥

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি রচনা করেন—"সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে", "এক সূত্রে বাঁধা আছে সহস্র জীবন" ইত্যাদি।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আব্দুল রসুল প্রভৃতি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। কংগ্রেসের উপর এই দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে কংগ্রেস "স্বরাজ"-এর লক্ষ্য ঘোষণা করে।)

নরমপন্থী ও চরমপন্থী

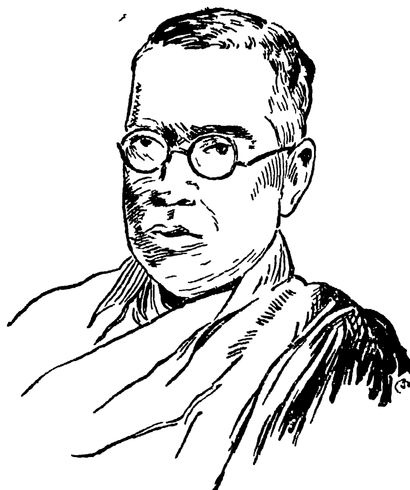
কংগ্রেসের সকল নেতাই কিন্তু গণ-আন্দোলনের পথ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অনেকেই তখনও আবেদন-নিবেদনের



বালগঙ্গাধর তিলক

পথ অনুসরণ করিতে চাহিলেন। ইংরাজদের সহিত সর্বতোভাবে আপোস ও সহযোগিতা করিয়া চলা এবং কিছু কিছু সংস্কার প্রার্থনা করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই ব্যক্তিদের নরমপন্থী বলা হয়। ইহাদের নেতা ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। অন্যদিকে

বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের একদল নেতা আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে চরমপন্থী



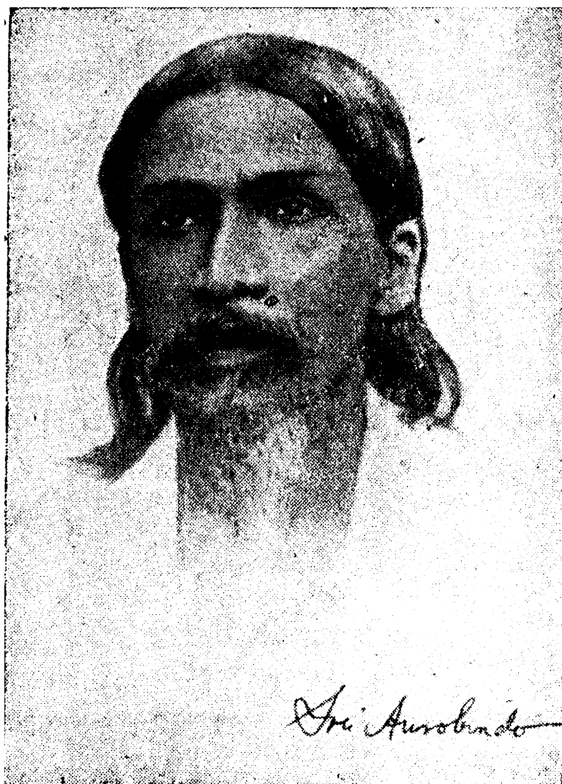
বিপিন পাল

বলা হয়। এই নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯০ সালে কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সুরু হয়। সন্ত্রাসবাদীরা কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করিতেন না। হিংসাত্মক উপায়ে বিদেশী শত্রুকে দেশ হইতে বিতাড়ন করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা বোমা প্রস্তুত করিতে এবং পিস্তল ব্যবহার করিতে শিখিলেন। ১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদী দলের এক

সাহসী যুবক ক্ষুদিরাম বসু মজঃফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে বোমা মারিয়া হত্যা করিতে যাইয়া ধরা পড়েন। বিচারে



শ্রীঅরবিন্দ

তাঁহার ফাঁসী হয়। কলিকাতায় মানিকতলা অঞ্চলে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। এই উপলক্ষে অরবিন্দ ঘোষ, তাঁহার ভাই বারীন ঘোষ, কানাই দত্ত, সত্যেন বসু এবং আরও অনেকে গ্রেপ্তার হন। এই অরবিন্দই পরে শ্রীঅরবিন্দ নামে বিখ্যাত

হইয়াছিলে। আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের পক্ষে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।



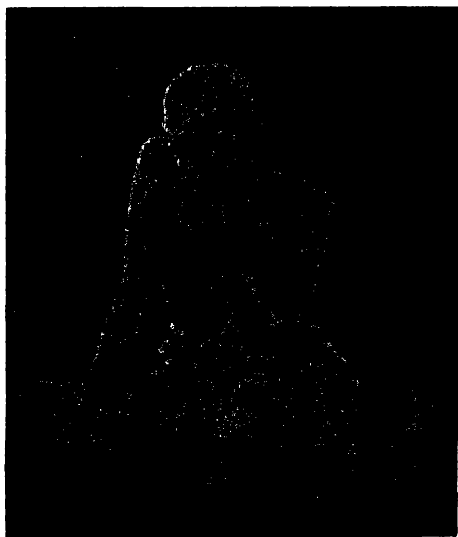
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

• বৃটিশ শাসকদের মধ্যে সন্ত্রাসসৃষ্টি ছিল সন্ত্রাসবাদীদের আশু লক্ষ্য। তাঁহাদের সাহস, সাধনা এবং ত্যাগ নিশ্চয়ই স্মরণীয়। কিন্তু এই পথ ভুল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জনসাধারণ ব্যাপক সাড়া দেয় নাই। আবার জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ছাড় জাতীয় আন্দোলন জয়ী হইতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। সমগ্র দেশে এক বিপুল গণ-জাগরণ

দেখা গেল। এই গণ-জাগরণের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের পথে পরিচালিত করিলেন। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হইল। অবশ্য গান্ধীজির পথ ছিল অহিংস। তিনি বিপ্লবী অভ্যুত্থানে বা সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাস করিতেন না। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিল। দেশকে শোষণ ও শাসন করার কাজে বৃটিশ সরকারের সহিত অসহযোগ—ইহাই ছিল আন্দোলনের নীতি। সরকারী খেতাব, আইন-আদালত,



মহাত্মা গান্ধী

আইনসভা, সরকারী স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বর্জন সুরু হইল। বিদেশী দ্রব্যবর্জন এবং হাটে-বাজারে বিলাতীবস্ত্র পোড়ানো সুরু হইল। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতে পদার্পণের দিনে ভারতবাসী দেশব্যাপী হরতাল পালন করিলেন।

আন্দোলন স্পষ্টতঃই নূতন আকার ধারণ করিল। আবেদন-নিবেদন নয়, সভা, মিছিল, সত্যাগ্রহ, হরতাল প্রভৃতি আন্দোলনের অস্ত্র হইল। শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে নয়, সহর ও গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিস্তৃত হইল।

পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রসারের যুগে এবং উহার প্রভাবে কংগ্রেস



জওহরলাল নেহরু

গ্রহণ করিয়াছিল "স্বরাজ"-এর লক্ষ্য। কিন্তু তখনও কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের পরে কংগ্রেস আর এক ধাপ অগ্রসর হইল। ১৯২৭ সালে লাহোর

অধিবেশনে জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে কংগ্রেস "পূর্ণ স্বাধীনতার" দাবী ঘোষণা করিল। ১৯৩০ সালের প্রথম দিবসে মধ্যরাত্রে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত করিয়া ভারত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করিল। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের নগরে নগরে উদ্‌যাপিত হইল 'স্বাধীনতা দিবস'। বিরাট বিরাট জনসভায় পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করা হইল। স্বাধীনতা-সংকল্পে বলা হইলঃ "বৃটিশ শাসনের নিকট এখনও বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ মনুষ্য সমাজ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই অপরাধ করা।" ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান হইতে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইল। আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে স্বাধীনতার চেতনা এবং আন্দোলন আরও বিস্তৃতি লাভ করিল।

বামপন্থী জাতীয়তা

আইন অমান্য আন্দোলনের অবসানের পরে ভারতের এক নূতন মতবাদ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, উহা বামপন্থী জাতীয়তা (Left nationalism) নামে পরিচিত। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার ফলে সারা তুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, উহা ভারতের জাতীয় আন্দোলনেও এক নূতন তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। ভারতেও সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ পৌঁছিল। কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থান করিয়াও কিছু কিছু নেতা সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে কয়েকটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল, যথা—কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল, নিখিল ভারত কৃষক সভা, নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অবশ্য ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশের শ্রমিক, কৃষক

বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিলেন। শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে চেতনার প্রসার খুবই উল্লেখযোগ্য, কেননা ইহারাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামে নূতন শক্তির সঞ্চার করিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নেতাদের কেন্দ্র করিয়াই কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী জাতীয়তা গড়িয়া উঠিতে থাকে। যাহারা এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা গান্ধীজির নীতি ও পথ পুরাপুরি সমর্থন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে আরও সংগ্রামী, আরও ব্যাপক, আরও সংগঠিত আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহাদের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীজির শিষ্য পট্টভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁহাকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি তখন "ফরওয়ার্ড ব্লক" নাম দিয়া একটি নূতন দল গঠন করেন। বামপন্থী জাতীয়তা দেশের যুবকদের মধ্যে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।



সুভাষচন্দ্র বসু

জিন্না ও পাকিস্তান দাবী

জিন্নার নেতৃত্বে ইতিমধ্যে মুস্লীম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে মুস্লীম লীগ লাহোর



জিন্না

অধিবেশনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন করিল। ইহাই প্রসিদ্ধ পাকিস্তান দাবী। এই পাকিস্তান দাবীরই পরিণতি দেশ বিভাগ।

স্বাধীনতা লাভ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম যে শক্তি অর্জন করে, ইতিপূর্বে তাহা দেখা যায় নাই। ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট হইতে আগস্ট আন্দোলন সুরু হয়। আগস্ট আন্দোলনে

ষাট হাজার নরনারী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। দেশের বাহিরে জাপানে সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করিয়া নূতন সংগ্রাম পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইতে রাজকীয় নৌবাহিনী (Royal Indian Navy) বিদ্রোহ করে। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিৎ কাঁপিয়া উঠে। ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহ্রুর নেতৃত্বে এক অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস ও মুস্লীম লীগের মধ্যে বিবোধ চরম আকার ধারণ করে। দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাব এক বীভৎস ও কলঙ্কময় অধ্যায় সুরু হয়। এই অবস্থায় বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দেশ বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস ও লীগ এই প্রস্তাব মানিয়া লয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্ট Indian Independence Act পাশ করে এবং ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়নের জন্ম হয়। স্বাধীন ভাবত নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিল। নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতকে "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জীবন সুরু হইয়াছে।

স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য

স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য—শান্তি ও সমৃদ্ধি। সারা দুনিয়ায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বাধীন ভারত চেষ্টা করিতেছে এবং করিবে। ভারত ও লোকতন্ত্রী চীন যে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করিয়াছে, পৃথিবীর বহু দেশ উহা গ্রহণ করিয়াছে ("আমাদের সমাজজীবন—তৃতীয় খণ্ড" দ্রষ্টব্য)। ভারতবাসীর সমৃদ্ধিও স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য।

স্বাধীন ভারত সমাজতন্ত্রবাদকে উহার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে বুঝায় যে, দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকিবে না, সমগ্র জনসাধারণই উহা ভোগ

করিতে পারিবে। দেশের কলকারখানায় মালিকানা শুধু টাটা-বিড়লার হাতেই থাকিবে না, রাষ্ট্রই হইবে কলকারখানার মালিক। দেশের জমি মুষ্টিমেয় জমিদার জোতদারের সম্পত্তি হইবে না, যে চাষী জমি চাষ করে সেও জমির মালিক হইবে।

ভারতের সমাজতন্ত্রবাদের সহিত অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশের সমস্ত কলকারখানার মালিক রাষ্ট্র; ও দেশে কলকারখানার মালিকানা কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে নাই। ভারতে কিন্তু টাটা-বিড়লা এবং অন্যান্যদের হাতে বহু কলকাবখানার মালিকানা আছে, আবার কিছু কিছু কলকারখানার মালিক রাষ্ট্র। সোভিয়েট রাশিয়ায় জমিদারদের সমস্ত জমি বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব কৃষক ও জমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতে কিন্তু জমিদারদের হাতে কিছু জমি রাখা হইরে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়া তাঁহাদের জমি দখল করা হইয়াছে।

সমৃদ্ধিশালী ভারত গঠনের জন্য ভারত-সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৪৮০০ কোটি টাকা নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় হইবে :

১।	কৃষি এবং সমাজ-উন্নয়ন	৫৬৫ কোটি টাকা
২।	সেচ এবং বন্যানিরোধ	৪৫৮ ,, ,,
৩।	বিদ্যুৎশক্তি	৪৪০ ,, ,,
৪।	শিল্প	৮৯১ ,, ,,
৫।	পরিবহণ	১৩৮৪ ,, ,,
৬।	সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ এবং পুনর্বাসন	৯৪৬ ,, ,,
৭।	বিবিধ	১১৬ ,, ,,
		৪৮০০ ,, ,,

শিল্প এবং পরিবহণ ব্যবস্থার জন্যই সবচেয়ে বেশী অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে। আধুনিক যুগ শিল্পের যুগ। শিল্পের উন্নতি ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অসম্ভব। সেই কারণেই শিল্পের উপর বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশালকায় দামোদব, ময়ূরাক্ষী, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পবিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ হইলে ভারতের জনসাধারণ আগামী দিনে অধিকতর সমৃদ্ধি ও উন্নততর জীবন আশা কবিতে পারে।

অনুশীলনী

১। জাতীয়তা বলিতে কি বোঝ?

২। ভারতে কিভাবে জাতীয়তার বিকাশ হইয়াছে?

৩। আবেদন-নিবেদন হইতে ভারত কিভাবে "স্বরাজ" এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর স্তরে পৌছিল?

৪। চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে মতভেদের কারণ কি?

৫। স্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্ধীজির অবদান কি?

৬। বামপন্থী জাতীয়তা কাহাকে বলে? ইহা কি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়াছে?

৭। গণ আন্দোলন কাহাকে বলে? বঙ্গভঙ্গ এবং অসহযোগ-আন্দোলন কি গণ-আন্দোলন?

৮। পাকিস্তান দাবী মানে কি? ইহার ফলাফল কি?

৯। স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য কি?

১০। আগামী দিনে ভারতের সামনে প্রধান কর্তব্য কি কি?

আমাদের সমাজজীবন

ায় খণ্ড

আমাদের সমাজজীবন

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পরিবার ও সমাজ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার এক অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আদিম যুগে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিয়া শিকার অথবা ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত, তখনই তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাহাড়ের গুহায় কিংবা বড় বড় হ্রদের উপর আস্তানা তৈয়ার করিয়া মানুষের এক একটি পরিবার বাস করিত। সেই আদিম যুগে সমাজ গড়িয়া উঠে নাই, সামাজিক রীতি-নীতিরও কোন বালাই ছিল না। পরিবারই তখন মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, পারিবারিক বন্ধন, রক্তের বন্ধনই মানুষের ঐক্যের ভিত্তি। রক্তের বন্ধন হইতেই পরিবারভুক্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা অনুভব করিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধির ফলে এক-একটি পরিবার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিবারগুলির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে গোষ্ঠী বা clan। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মীয়-সম্পর্ক—জ্ঞাতি-সম্পর্ক। গোষ্ঠীগুলির বিশ্বাস—একই পূর্বপুরুষ হইতে তাহাদের উৎপত্তি। ধীরে ধীরে কয়েকটা গোষ্ঠী মিলিয়া একটি উপজাতি বা Tribe গড়িয়া উঠে। আজও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, ভারতের বিভিন্ন অংশে এইরূপ উপজাতিদের দেখিতে পাই, যথা—আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান, ভারতের সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি।

ধীরে ধীরে আদিম যুগের মানুষের মধ্যে সমাজ গড়িয়া উঠিতে থাকে। যেদিন হইতে মানুষ পশুপালন ও চাষবাস শিখিল, সেদিন হইতেই তাহাদের জীবনধারায় একটি বিরাট পরিবর্তন আসিল। আদিম কালের সেই যাযাবর অবস্থা আর থাকিল না। পশুপালন ও চাষবাসেব সুবিধার জন্য মানুষ দল বাঁধিয়া এক জায়গায় বসবাস করিতে সুরু করিল; ইহা হইতেই গ্রামেব উৎপত্তি। কুড়ুল ও কোদালের সাহায্যে মানুষ বনজঙ্গল সাফ করিয়া চাষ-আবাদে মন দিল। আস্তে আস্তে মানুষ তাহাব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দিকে নজর দিল। খাবাব জিনিস পুঁজি করিয়া রাখিবার জন্য এবং বাঁধিবার কাজে হাঁড়িকুড়িব প্রয়োজন দেখা দিল। তখন কুমাবের চাকে নরম মাটি দিয়া নানারকম ঘটিবাটি হাঁড়ি প্রভৃতি তৈয়ারী হইতে লাগিল। মেয়েরা এক নূতন বিদ্যা শিখিল—সূতাকাটা ও কাপড়-বোনা। স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্য সে ঘর বাঁধিল। এইভাবে মানুষেব গ্রাম্য জীবনের সুরু হইল। কোথায়ও বিভিন্ন গোষ্ঠী, আবার কোথায়ও বিভিন্ন উপজাতি মিলিয়া মানুষের সমাজজীবন গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষের মধ্যে পরিবার ও সমাজেব বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা কেহই এই বন্ধন অস্বীকার করিতে পাবি না। আমরা সকলেই পরিবারের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বাস করি। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র লইয়া পরিবার, আবার অনেকগুলি পরিবার লইয়া গ্রাম বা সহরের সমাজ। কিন্তু পরিবার বা সমাজ আমাদের কি প্রয়োজন পূরণ করে?

পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনীয়তা

পারিবারিক জীবনে আমরা সকলে মোটামুটি অভ্যস্ত বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুঝা যায়। স্নেহ, মায়া, দয়া, ভালবাসা মানুষের

সহজাত বৃত্তি। পারিবারিক জীবন না থাকিলে, মানুষের মধ্যে এই সুকোমল বৃত্তিগুলি না থাকিলে, মানুষ ও বন্য জীবজন্তুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

পরিবারের মত সমাজও আমাদের নানা প্রয়োজন পূরণ করে। সামাজিক জীবনের সহিতও আমরা অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত। পূজাপার্বণ, আমোদ-অনুষ্ঠান, বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি বাদ দিয়া আমরা সুখী জীবন যাপন করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল দেশেই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান যে টিকিয়া আছে, তাহাই মানুষের জীবনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। শুধু পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া মানুষ আনন্দ পায় না, পরিবারের বাহিরে যে বৃহত্তর সমাজ রহিয়াছে, উহার সহিতও সে পরিচিত হইতে চায়। এই পরিচিতির মধ্য হইতেই বিকাশ লাভ করে সামাজিক বন্ধন, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান। সভ্য সমাজের ভিত্তি এই অদৃশ্য সামাজিক বন্ধন। সামাজিক বন্ধন না থাকিলে সভ্য সমাজও ভাঙ্গিয়া পড়িবে ; সমাজে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, যাহার যেমন খুশী সে সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিবে।

পারিবারিক জীবনের সমস্যা

পরিবারের মধ্যে বাস করিলেও, পারিবারিক জীবন আমাদের কাম্য হইলেও, এই জীবনের নানা সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলি বাদ দিয়া পারিবারিক জীবনের উন্নতির কথা ভাবা যায় না।

ভারতের পারিবারিক জীবনের বিশেষ গড়নটি প্রথমেই বোঝা দরকার। এদেশে যৌথ-পরিবার প্রথা প্রচলিত। একই পরিবারে বাস করেন বাবা-মা, ভাই-বোন এবং আরও অন্যান্য আত্মীয়। ইউরোপের

পরিবার কিন্তু সতন্ত্র ধরনের। ওদেশে বাবা-মা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের লইয়া পরিবার গঠিত। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পরে সন্তানেরা স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে। ভারতে যৌথ-পরিবার থাকিবার ফলে আমাদের মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতির বন্ধন এবং মনের উদারতা বিকাশলাভ করে। জীবনধারণের ব্যয়ের তুলনায় আয় তাল রাখিতে পারে না বলিয়া বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করার অনেক সুবিধা। আবার এই ব্যবস্থার ফলে নানা সমস্যাও আত্মপ্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মাত্র দুই একজনের আয়ের উপর গোটা পরিবারটি নির্ভরশীল, ফলে রোজগারের ভাবনা অনেকেরই করিতে হয় না। নিজের পায়ে নিজের দাঁড়াইতে হইবে—এই চেতনা জন্মলাভ করে না। অভাব-অনটন বাড়িবার সংগে সংগে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং যৌথ-পরিবার শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। বড় বড় সহরে বাসস্থানের সমস্যাও ব্যাপক। বড় পরিবারের উপযোগী বাসস্থান সংগ্রহ করাও খুবই কঠিন। যাহারা নিরিবিলি বাস করিতে চান, তাহাদের পক্ষে ছোট বাড়ীতে বিরাট পরিবারের মধ্যে বাস করা অসহনীয় মনে হইতে পারে। পরিবারের মধ্যে সকলে সমান হয় না। কেহ একটু স্বার্থপর, কেহ বদরাগী, কেহ বা আত্মভোলা, এ হেন পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই বর্তমানে ভারতে যৌথ-পরিবার প্রথা ভাঙ্গনের মুখে।

যৌথ-পরিবার অবস্থার চাপে ভাঙ্গিয়া পড়িলেও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। মা-বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, ছোট ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাই-এর দায়িত্ব—সমাজে এইগুলির মূল্য খুবই বেশী। সুখের বিষয় আমাদের সমাজে এই মূল্যবোধ আজও লোপ পায় নাই।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের শিক্ষা

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন চলিয়া আসিতেছে, উহা হইতে আমরা কি শিখিতে পাই? পারিবারিক জীবন হইতেই শৈশবে আমাদের চরিত্র গঠিত হয়। পরিবারের গুরুজনদের শিক্ষা, চরিত্র, সাধনা, ভদ্র ব্যবহার, বিনম্র স্বভাব, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে বিপুল সাহায্য করে। ঠিক তেমনি কুশিক্ষা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি, মিথ্যাচারণ পরিবারে একবার বাসা বাঁধিলে ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ ঘটে।

সামাজিক জীবনে আমরা বহু লোকের সংস্পর্শে আসি, উৎসব-অনুষ্ঠানে মিলিত হই। ইহার ফলে আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা বিকাশলাভ করে। সমাজের কথা, সমাজের সমস্যার কথা আমরা বুঝিতে শিখি। সকলে মিলিয়া সমাজের উন্নতি না করিতে পারিলে সুস্থ সমাজজীবন গড়িয়া উঠিবে না—এই ভাব আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া সে বাঁচিতে পারে না—এই কথার তাৎপর্য সমাজজীবন হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। আমরা স্বেচ্ছায় সামাজিক নিয়মকানুন ও রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে শিখি। আমরা বুঝি যে এই সকল নিয়মকানুন, রীতি-নীতি না মানিয়া চলিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। সমাজের কেহ যদি গুণ্ডামি, চুরি-ডাকাতি, অসদাচরণ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির আশ্রয় লয়, সমাজের আর দশজন উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এই ভাবেই সামাজিক জীবন হইতে আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা গড়িয়া উঠে। এই চেতনা যত বলিষ্ঠ হইবে, সামাজিক জীবন ততই সুস্থ ও আনন্দময় হইবে।

সুস্থ সমাজজীবনের উপাদান

সুস্থ সমাজজীবন আমাদের সকলেরই কাম্য। বর্তমান যুগে আর্থিক সচ্ছলতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া সুস্থ সমাজজীবন গঠন করা যায় না। কিন্তু শুধু এইগুলিই যথেষ্ট নয়। সুস্থ সমাজজীবনের জন্য আরও প্রয়োজন মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা, প্রীতির বন্ধন, ধৈর্য ও সাহস। কোন পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা থাকিতে পারে, কিন্তু পরিবারের লোকজনদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন না থাকিলে উহা কি একটি সুখী পরিবার হইতে পারিবে? পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা সমস্যা আছে, ঐ সমস্যাগুলি দূর করিবার জন্য আমরা যদি ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় না দেই, তাহা হইলে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব? আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা যদি বিকাশলাভ না করে, তাহা হইলে গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষার প্রসার, রাস্তাঘাটের সংস্কার, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি কি করিয়া হইবে? আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা অত্যন্ত দুর্বল বলিয়াই গ্রাম বা সহরের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

অনুশীলনী

১। সমাজ বলিতে কি বোঝ? মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন?

২। পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব কি?

৩। পারিবারিক জীবন হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি?

৪। তুমি কি যৌথ-পরিবার পছন্দ কর? কেন কর? যৌথ-পরিবারের সমস্যাগুলি কি?

৫। সামাজিক চেতনা বলিতে কি বোঝায়? সুস্থ জীবন-গঠনে ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকসমাজের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

মানুষ চায় সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়িয়া তুলিতে। যখন হইতে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া গ্রামে ও নগরে বসবাস সুরু করিয়াছে, তখন হইতেই তাহার এই প্রচেষ্টা। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবনকে আরও সুন্দর, আরও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য নানা প্রক্রিয়া চালাইতেছে। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশই সমাজজীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করিবার জন্য স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

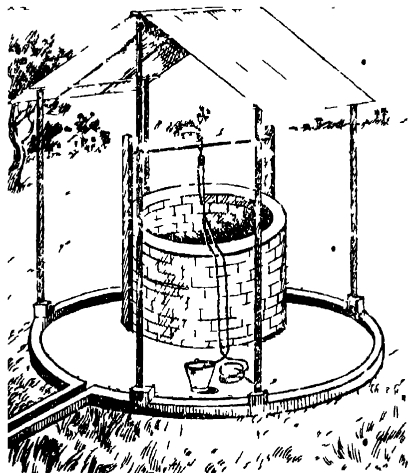
স্বাস্থ্যরক্ষাব জন্য কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজন, যথা—পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ জল, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, মহামারীর কবল হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি। ইহার কোন একটি ব্যবস্থা বাদ পড়িলে আমাদের জীবনে নানা বিপত্তি ঘটিতে পারে।

জল সরবরাহ

বিশুদ্ধ পানীয় জল যে সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রামের স্বাস্থ্য খারাপ হইবার প্রধান কারণ—বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব। নিদারুণ জলসঙ্কট পশ্চিমবঙ্গেব গ্রাম্য জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীগুলি শুকাইয়া যায়; টিউবওয়েল বা নলকূপের ব্যবস্থা বহু গ্রামেই নাই। বর্ষার সময় ময়লা কর্দমাক্ত জলে পুকুর ও ডোবা ভরিয়া যায়। কাঁচা কূপে মাটি চোঁয়াইয়া মাঠের জল

প্রবেশ করে। চারিদিকে নানা প্রকার রোগ ছড়াইয়া পড়ে। গ্রাম্য জীবনে তখন হাহাকার পড়িয়া যায়।

গ্রামে পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য গত কয়েক বৎসরে তাই টিউবওয়েল বা নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় নলকূপের সংখ্যা খুবই অল্প। হাজার হাজার গ্রামে হাজার হাজার নলকূপ স্থাপনের সমস্যাটাও অবশ্য ক্ষুদ্র নয়। নলকূপ ছাড়া গ্রামে সংরক্ষিত পুষ্করিণী কিংবা পাকা কূপ খননের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। পাকা কূপ গ্রামে বিশেষ উপযোগী। পাকা কূপের চারিদিকে ইটের উচু গাঁথুনি, এবং পাশে জল নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা থাকে বলিয়া বর্ষাকালেও ইহার জল ভাল থাকে।



পাকা কূপ

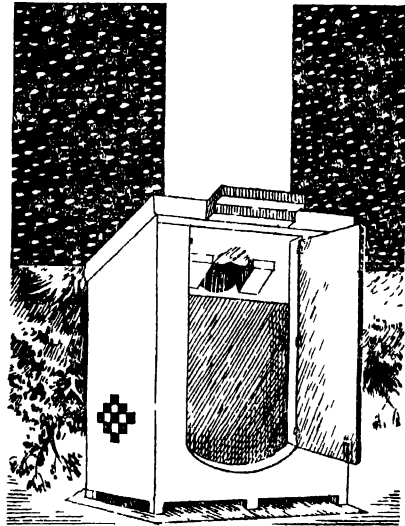
বড় বড় সহরে কলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। এই জল একটি বিশেষ প্রণালীতে পরিশুদ্ধ বা ফিল্টার করা হয়। কলিকাতার পলতায় বিরাট জলাধার আছে। পাম্পের সাহায্যে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া উহা ফট্‌কিরীর সাহায্যে থিতাইয়া ফিল্টার-বেডের উপর দেওয়া হয়। তারপর এই জল একটা বড় চৌবাচ্চায় পড়ে। ঐ চৌবাচ্চায় জল বিশুদ্ধ করিয়া কলে ছাড়া হয় এবং উহা সহরের বাড়ী বাড়ী পৌছায়।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলে কিন্তু জল সরবরাহের ব্যবস্থা খুবই শোচনীয়। বস্তিবাসীরা পুকুর বা রাস্তার কল হইতে জল সংগ্রহ করে। বস্তিতে গেলে কলের সামনে জলের জন্য মানুষের লম্বা লাইন চোখে পড়িবে।

ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

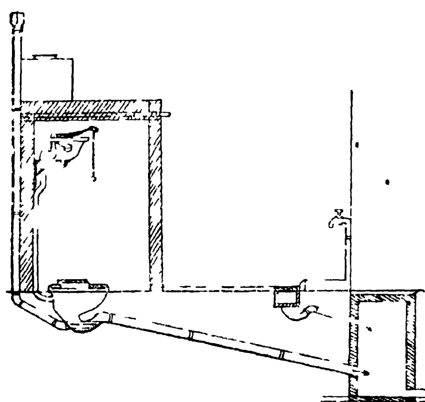
পানীয় জল সরবরাহের ন্যায় ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা (Sanitation) ও পরিচ্ছন্ন সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য। গ্রামে ও সহরের মহল্লায় মহল্লায় নালা-নর্দমার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই নালা-নর্দমা দিয়া ময়লা জল, আবর্জনা ইত্যাদি নিষ্কাশিত হইতে পারে। নালা-নর্দমা না থাকিলে বর্ষাকালে পথঘাট কর্দমাক্ত হয়।

মলমূত্র নিষ্কাশনের কাজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রামদেশে ইহার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নাই। গ্রামবাসীরা মাঠে কিংবা ডোবা ও পুষ্করিণীর ধারে মলত্যাগ করে। ফলে বর্ষার সময় গ্রামের পরিবেশ খুবই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। আজকাল গ্রামে ট্রেঞ্চ পায়খানা, গর্ত পায়খানা প্রভৃতি নির্মিত হইতেছে। গ্রামে এইরূপ পায়খানা তৈরীর ভার গ্রামবাসীকেই গ্রহণ করিতে হয়। বাংলার হাজার

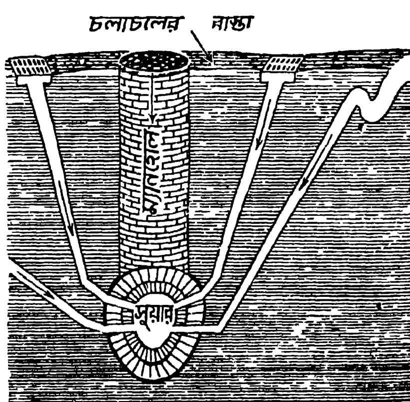


গর্ত পায়খানা

হাজার গ্রামে এইরূপ পায়খানা তৈয়ার করা ইউনিয়ন বোর্ড বা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। মফঃস্বল সহরে পাকা পায়খানার ব্যবস্থা আছে। পৌরসভা হইতে মেথর দৈনিক ময়লা সরাইয়া লয়। কলিকাতায় ময়লা নিষ্কাশনের উন্নত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কলিকাতায় রাস্তাগুলির নীচে অসংখ্য বড় বড় "ড্রেন পাইপ" আছে। এই পাইপ বা নলের মধ্য দিয়া সহরের যাবতীয় ময়লা নিষ্কাশিত হইয়া নদী বা দূরের কোন জমিতে গিয়া পড়ে। মাটির তলায় আছে সিউয়ার (Sewer), তরল ময়লা ইহার সাহায্যে নিষ্কাশিত হয়। বড় রাস্তার গায়ে স্থানে স্থানে আছে ম্যান্‌হোল। এই ম্যান্‌হোল বা মানুষের গর্ত দিয়া মেথর নীচে নামিয়া যায় এবং সিউয়ার পরিষ্কার করে। সিউয়ার অপরিষ্কার থাকিলে ময়লা নিষ্কাশিত হইতে পারে না বলিয়া এই ম্যান্‌হোলের ব্যবস্থা আছে বর্ষার সময় রাস্তায় জল জমিলে



ড্রেন পায়খানা



সিউয়ার

ম্যান্‌হোলগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়, রাস্তার জল উহার মধ্য দিয়া নীচে চলিয়া যায়। কলিকাতার পায়খানাকে বলে ড্রেন পায়খানা। পায়খানার ঘরে দেওয়ালে স্থাপিত হয় জলের পাত্র। চীনামাটির গামলায় মলত্যাগ করিতে হয়। এই গামলার নীচে একটি জলপূর্ণ নল থাকে। মলত্যাগের পরে দেওয়ালে রক্ষিত ছোট জলপাত্রটির হাতল টানিলেই চীনামাটির গামলা জলে ভরিয়া যায় এবং মল ভাসাইয়া উহা সিউয়ারে ফেলে।

জীবনরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা

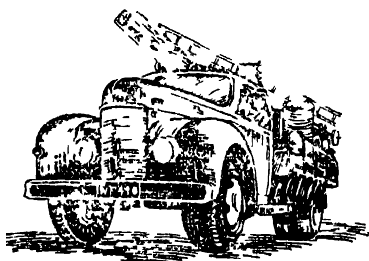
রোগ ও মহামারীর কবল হইতে লোকসমাজকে রক্ষা করা স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্তমান যুগে ইহার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বসন্ত, কলেরা. টাইফয়েড প্রভৃতি মহামারীর বিরুদ্ধে টিকা নিবার ব্যবস্থা আছে। সময়মত টিকা নিলে এই সকল মহামারীর হাত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা আজ সম্ভব। দুঃখের বিষয় গ্রামের লোক তো বটেই, সহরের শিক্ষিত লোকেরাও সময়মত টিকা নেন না; ফলে মহামারিতে আক্রান্ত হন। এই রোগগুলি খুবই ছোঁয়াচে বলিয়া দ্রুত গ্রামে ও সহরের মহল্লায় মহল্লায় ছড়াইয়া পড়ে। প্রতি বৎসর অসংখ্য মানুষ এই রোগগুলিতে আক্রান্ত হয়। অথচ সময়মত টিকা নিলে এই রোগগুলির আক্রমণ হইতে অনায়াসে রক্ষা পাওয়া যায়।

রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Health Centre) প্রভৃতি গ্রাম ও সহরে স্থাপিত হইতেছে। অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে এই সকল চিকিৎসালয়ে নানা প্রকার রোগের চিকিৎসা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞান দিন দিনই উন্নত

হইতেছে। বহু মারাত্মক রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কল্যাণে লোকসমাজ ইহার সুফল ভোগ করিতে পারে। অবশ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া আজও প্রয়োজনের তুলনায় দেশে এইগুলির সংখ্যা খুব কম। গ্রাম বা মফঃস্বল সহরে যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই অদ্যাবধি নাই। কলিকাতা সহরেও চালু হাসপাতাল-গুলিতে রোগীদের শয্যার (beds) সংখ্যা খুবই কম। ফলে বহু রোগীকেই হাসপাতাল হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। যক্ষ্মার হাসপাতাল সম্পর্কে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যক্ষ্মার দ্রুত প্রসার গ্রাম ও সহরের হাজার হাজার পরিবারের সমস্ত আনন্দ কাড়িয়া লইতেছে, কিন্তু তথাপি যক্ষ্মা-হাসপাতালের সংখ্যা, এবং হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা আজও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

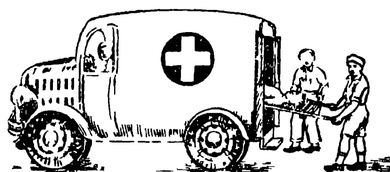
দুর্ঘটনা হইতে রক্ষার ব্যবস্থা

সমাজে বাস করিতে গেলে, বিশেষ করিয়া বড় বড় সহরে, দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। বাড়ীতে হঠাৎ আগুন লাগিতে পারে, খেলাধূলায় হাত-পা ভাঙ্গিতে পারে, মোটর গাড়ীতে মানুষ চাপা পড়িতে পারে। বড় বড় সহরে অগ্নিকাণ্ড, মোটর দুর্ঘটনা তো প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনা। দুর্ঘটনা হইতে লোক-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই ফায়ার ব্রিগেড ও য়্যাম্বুল্যান্সের সৃষ্টি। ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল সংবাদ পাইলেই আগুন নিভাইতে



ফায়ার ব্রিগেড

ছুটিয়া আসে। যে পথ দিয়া যখন দমকল চলে উহার উপর সকল চলমান গাড়ী তখন থামিয়া যায়। দমকলের কর্মিগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও আগুনের গ্রাস হইতে মানুষ ও তাহার সম্পত্তি রক্ষা করেন। আহত বা রোগাক্রান্ত মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিবার কাজ করে য়্যাম্বুল্যান্স। হাত-পা-ভাঙ্গা মানুষ, কিংবা মোটর দুর্ঘটনায় আহত মানুষ, কিংবা রোগাক্রান্ত মানুষকে য়্যাম্বুল্যান্স হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। সংবাদ পাইলেই য়্যাম্বুল্যান্সের গাড়ী ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে। এই ব্যবস্থা থাকিবার ফলে প্রতিদিন বহু মূল্যবান জীবন রক্ষা পায়।

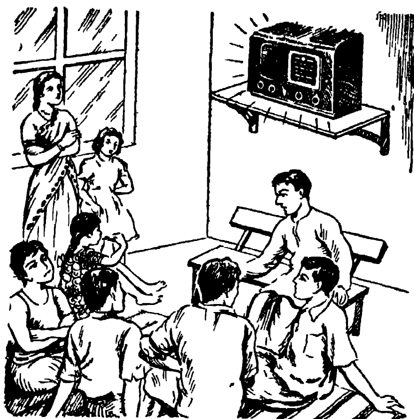


য়্যাম্বুলান্স

আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা

মনের সহিত দেহের নিবিড় সম্পর্ক। মন ভাল না থাকিলে দেহ ভাল থাকে না। নিরানন্দ মন লইয়া কাজকর্মেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। তাই সমাজজীবনের সুস্থ বিকাশের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বালক ও যুবক, ছেলে ও মেয়ে সকলের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে, আন্দামানের লোকসমাজের মধ্যে আনন্দ-অনুষ্ঠানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীরা এবং আন্দামানের আদিবাসীরা উৎসব-অনুষ্ঠানে দল বাঁধিয়া নাচে, গান করে। ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী পূর্ণিমার ধবধবে জ্যোৎস্নায় নাচিয়া গান করিয়া মনের আনন্দে মাতিয়া উঠে। জীবনে আনন্দের মূল্য কি দরিদ্র আদিবাসীরা

তাহা জানে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মধ্যে অবশ্য ঐরূপ উদ্দাম নৃত্যগীতের ব্যবস্থা নাই; তবে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন আমরাও করিতে পারি। গ্রাম ও সহরের মহল্লায় খেলাধূলা, ক্লাব ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা যায় এবং অনেক স্থানে ইহার ব্যবস্থা আছে। আজকাল ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী গ্রামে গ্রামে বই সরবরাহ করে।



রেডিও

স্কুলের মাঠে বা গ্রামের মাঠে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হইতেছে। লাইব্রেরী-ঘরে বা খেলার মাঠের একাংশে রেডিও রাখিতে পারিলে ভাল হয়। রেডিওতে ছেলেমেয়েরা গানবাজনাও শুনিবে, আবার আধুনিক জগতের গতিধারার সহিত পরিচিতও হইবে। ক্লাব ও লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে মাঝে মাঝে বিতর্ক-সভা, আলোচনা-সভা, আবৃত্তি, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, নৃত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করা যাইতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা না থাকিলে তরুণ-তরুণীরা বিপথগামী হইতে পারে অন্যদিকে আমোদ-অনুষ্ঠান, বিতর্ক-সভা, আলোচনা-সভা প্রভৃতির মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মনকে সতেজ ও সচেতন করা যায়।

শিক্ষা

সুস্থ সমাজজীবন গঠনের জন্য স্বাস্থ্যপরিকল্পনার মত শিক্ষার ব্যবস্থাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশ সম্পর্কে এই উক্তি বিশেষ

ভাবে প্রযোজ্য, যেহেতু এদেশে অশিক্ষা ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যাপক। ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে শতকরা ১০০ জনই নাম স্বাক্ষর করিতে জানে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা কি? পশ্চিম-বঙ্গে শতকরা মাত্র ২৪·৫ জন শিক্ষিত, অর্থাৎ নামটা সহি করিতে জানে, আর শতকরা ৭৫ জন একেবারে অশিক্ষিত। আবার এই শিক্ষিতের হার কলিকাতায় বেশী। কলিকাতায় শতকরা প্রায় ৫৩ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে, কিন্তু গ্রামদেশে শতকরা ৮০ জনই অশিক্ষিত। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে অশিক্ষা আরও ব্যাপক। এই রাজ্যে শতকরা মাত্র ১২·৭ জন মেয়ে শিক্ষিতা, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০ জনই নিরক্ষর। এই অবস্থা যে খুবই ভয়াবহ তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নয়। কিন্তু সকলে এই সহজ কথাটি বুঝিলেও ইহা মর্মান্তিক সত্য যে, স্বাধীনতালাভের পর বিগত দশ বৎসরের মধ্যেও নিরক্ষরতা এদেশে উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায় নাই। আজও স্বাধীন ভারতের শতকরা প্রায় ৭৫ জন নিরক্ষর।

এই অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই নিরক্ষরতা হ্রাস করা সম্ভব, গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি ভারতের কোথায়ও ইহা প্রবর্তিত হয় নাই এবং সরকার বলিতেছেন যে, ইহা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ইহার প্রবর্তন সময়সাপেক্ষ।

গত কয়েক বৎসরে দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়াছে এবং প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সনে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫,২০৯ টি এবং

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫,৫৪,৭৫৮ জন। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা বলা যায় না। আজও এমন গ্রাম আছে যেখানে একটিও প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। বেশীর ভাগ স্কুলগৃহই জীর্ণশীর্ণ, দীর্ঘকাল উহাদেব সংস্কার হয় নাই। সহর হইতে অনেক দূরে, গ্রাম-গ্রামান্তবে শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিবার মত শিক্ষক-শিক্ষিকারও একান্ত অভাব। বেতনের হার সামান্য হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তি পাওয়াও খুব কঠিন। অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণও সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না।

মাধ্যমিক শিক্ষারও কিছু উন্নতি হইয়াছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা সর্বাধিক। ১৯৫৪ সনে ইহাদেব সংখ্যা ছিল ১,৪১৮। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইহা রাজ্যেব সর্বত্র সমান ভাবে প্রসারিত হয় নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বেশীব ভাগই কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর—এই পাঁচটি জেলায় আবদ্ধ। বাকী ৯টি জেলায় স্কুলের সংখ্যা মাত্র ৩৫০টি। মাধ্যমিক শিক্ষার সবচেয়ে শোচনীয় দিক হইল এই যে, প্রতি বৎসরই এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে যে বিবরণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সন পর্যন্ত মোট ২,৪৯,৪৬৬ জন পরীক্ষার্থী ছিল, উহাদের মধ্যে পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীব সংখ্যা, ১,৩৬,০২৯ জন। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বৎসর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছে। এত বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সময়, পরিশ্রম ও অর্থ এইভাবে প্রতি বৎসব নষ্ট হইতেছে।

ইহারই প্রতিকারের জন্য কারিগরী শিক্ষা ও বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের দিকে সরকার এবং দেশের নেতারা গুরুত্ব দিতেছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল ছাত্রেরই শিক্ষার সকল দিকে সমান আগ্রহ থাকে না। কোন কোন ছাত্রের কারিগরী শিক্ষায় বেশ আগ্রহ থাকে, কিন্তু অন্যদিকে তেমন আগ্রহ বা মেধা থাকে না। তাহা ছাড়া বর্তমান যুগে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্বও অসীম। কারিগরী শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বাবলম্বী হইবার একটা সুযোগ লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া নানাবিধ কারিগরী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকে; যথা—সেলাই-শিক্ষা, কাগজ তৈয়ার, মাদুর ও দড়ির দ্বারা তক্তপোষ নির্মাণ, লোহা লক্করের কাজ ইত্যাদি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়েব জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন। তাই ২৪-পরগণা জেলায় হাবড়ার অন্তর্গত বাণীপুরে একটি শিক্ষণ-কেন্দ্র (Training School) স্থাপিত হইয়াছে, উহার নাম 'The People's (Janata) College'। দার্জিলিং জেলায় কালিম্পঙেও আর একটি অনুরূপ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালনা করিবেন।

অনুশীলনী

১। লোকসমাজের জীবনে স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২। গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা কি কি? তোমার গ্রামে এই সকল সমস্যা তুমি কিভাবে সমাধান করিবে?

৩। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আছে কি? উহার সমস্যা কি কি?

৪। তুমি কি কি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা পছন্দ কর? যুক্তি দিয়া তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

৫। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা কি?

৬। সহরের তুলনায় গ্রামে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী কেন? গ্রামে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য তুমি কি কি ব্যবস্থা চাও?

৭। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, লাইব্রেরী ও স্কুল-গৃহের গুরুত্ব কি?

৮। বুনিয়াদী শিক্ষা কাহাকে বলে? বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুমি অনুভব কর কি? কেন কর?

৯। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ কর—

১। কলিকাতা সহরে যাবতীয় ময়লা — এর মধ্য দিয়া নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

২। কলিকাতার রাস্তায় জল জমিলে — খুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। সংবাদ পাইলেই — আগুন নিভাইতে ছুটিয়া চলে।

৪। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইলে — এর সাহায্য লইতে হয়।

৫। ভারতের মধ্যে — মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা সর্বাধিক।

৬। সেলাই, কাগজ তৈরী ইত্যাদি শিক্ষা — দেওয়া হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

জনসাধারণ ও সরকার

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমাদের ভাবতীয় রাষ্ট্রেব একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে। বাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ এবং তাঁহাদের সহকারীদেব লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত। সংবিধানে ও বিভিন্ন আইনে ভারতীয় রাষ্ট্রেব যে উদ্দেশ্য ও নীতি ঘোষিত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকাবের কাজ উহা কাযে পরিণত করা। ভারতের মত প্রত্যেক দেশেই সরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং জনসাধারণেব মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করেন।

নির্বাচন

কিন্তু এই সরকার গঠিত হয় কিরূপে? আধুনিক যুগে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ সরকারকে পরিবর্তন করিতেও পারে। কোন দেশের সরকার তাই অপরিবর্তনীয় নয়।

আমাদের দেশে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচন হয়। গত নিবাচনে কংগ্রেস দল কেরালা বাদে সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সবকার গঠন করিয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে ব্রিটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) এবং আমেরিকায় ডেমোক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক দলের সরকার ছিল। বর্তমানে ব্রিটেনে শ্রমিক দলের বদলে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) এবং আমেরিকায় রিপাব্লিকান দলের (Republican Party) সরকার গঠিত হইয়াছে। আগামী নির্বাচনে ভারতে, ব্রিটেনে বা আমেরিকায় বর্তমান সরকারের পরিবর্তন ঘটাইয়া

অন্য কোনও দল সরকার গঠন করিতে পারে। অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে জনসাধারণ তাহাদের দেশের সরকারকে পরিবর্তন করিতে পারে।

ভোটের অধিকার

প্রত্যেক সভ্যদেশেই নাগরিকদের ভোটের অধিকার থাকে। ভোটের অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকার বলেই নাগরিক দেশের সরকার গঠনে তাহার মত ও ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। ভোটের অধিকার আছে বলিয়াই নাগরিক সরকার গঠনে, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি,ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যান্য নানা কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ভোটের এই মূল্যবান অধিকার না থাকিলে রাষ্ট্রে নাগরিকদের কোন সত্তাই থাকিত না। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নিধন, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। অবশ্য যে ব্যক্তি উন্মাদ, দেউলিয়া বা কোন মারাত্মক অপরাধে দণ্ডিত, সে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। বর্তমানে জনসাধারণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে, সর্বজনীন ভোটাধিকার তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে।

নাগরিকদের অধিকার

শুধু ভোটদানই নয়, নাগরিকদের আরও নানা অধিকার বর্তমানে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আইন দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। ভোট দানের অধিকারের মত এই অধিকারগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকারগুলি কি?

(ক) **মত প্রকাশের অধিকার :**—নাগরিক স্বাধীনভাবে তাহার

মত প্রকাশ করিতে পারে। সমাজ ও সরকারের দোষত্রুটির সমালোচনা করিবার অধিকার তাহার আছে। বাক্য দ্বারা এবং লেখা দ্বারা সাধারণত এই মত প্রকাশিত হয়। তাই বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রত্যেক সভ্যদেশেই স্বীকৃত। অবশ্য বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হইলে উহা খর্ব কবিবার অধিকারও রাষ্ট্রের আছে।

(খ) **সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার:** সংঘবদ্ধ না হইলে নাগরিক শুধু একক প্রচেষ্টায় তাহার দাবি পূরণ করিতে পারে না। রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার নাগরিকদের অবশ্যই থাকে। অবশ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার কাহারও নাই।

(গ) **সংস্কৃতির অধিকার:** প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়া জীবনে উন্নতি অসম্ভব। প্রত্যেক সভ্য দেশ নাগরিকদের এই অধিকার স্বীকার করে।

(ঘ) **ধর্মবিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার:** আধুনিক রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। নাগরিক নিজ বিশ্বাস মত যে কোন ধর্ম অনুসরণ করিতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তাহাদের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা রাষ্ট্র স্বীকার করে।

(ঘ) **সম্পত্তির অধিকার:** প্রত্যেক নাগরিক আইনসম্মত উপায়ে সম্পত্তি অর্জনের এবং উহা ভোগের অধিকারী। তবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত বা খর্ব করিতে পারে। জনসাধারণ ও সমাজের স্বার্থে ভারত সরকার বর্তমানে আইন করিয়া জমিদারি প্রথার

উচ্ছেদ করিয়াছেন, ইহাতে জমিদারের জমিদারির সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার খর্ব হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর কয়েকটা সভ্য দেশ বড় বড় কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের ঐ সকল কারখানা-সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু উহাতে সমাজ ও জনসাধারণের কল্যাণ হয়।

উপরে উল্লিখিত অধিকারগুলি **সামাজিক অধিকার** (Civil Rights) নামে অভিহিত হয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে নাগরিক শান্তিপূর্ণ ও সভ্য জীবন ধারণ কবিতে পাবে না। নাগরিক কতকগুলি **রাষ্ট্রীয় অধিকার** (Political Rights) ভোগ কবে, যাহার দ্বারা সে রাষ্ট্রের বৃহত্তর জীবনে ও শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। নাগরিকদের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় অধিকাবগুলি হইল ঃ

(ক) **রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাস করিবার অধিকার ঃ** প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে কোন স্থানে বাস করিতে পারে।

(ক) **নির্বাচন করিবার** এবং **নির্বাচিত করিবার অধিকার :** নাগরিক শুধু ভোটদান করিবার অধিকারীই নয়, সে জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়া রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতেও পারে। শুধু ভোটের অধিকার পাইলেই রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পূর্ণ হয় না, তাই নাগরিককে নির্বাচিত হইবার অধিকারও আইনে স্বীকৃত হয়।

(গ) **আবেদন করিবার অধিকার ঃ** যে কোন নাগরিক সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং আইনসভার নিকট আবেদন করিয়া তাহার অভিযোগ জানাইতে পারে।

(ঘ) **সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার ঃ** সকল নাগরিকের নিকট সরকারী চাকরি পাইবার পথ উন্মুক্ত হইবে। অবশ্য চাকরীর জন্য তাহার যোগ্যতা থাকা চাই। যোগ্যতা থাকিলে শ্রেণীগত বা

বর্ণগত কারণে কাহাকেও চাকরি পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না।

মৌলিক অধিকার

ভারতের সংবিধান ভারতীয় নাগরিকের কতকগুলি **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Rights) স্বীকৃত হইয়াছে। এই অধিকারগুলি ভারতীয় নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রে নাগরিকের গুরুত্ব কতখানি, উহারই প্রমাণ এই মৌলিক অধিকারগুলি। এই মৌলিক অধিকার কেহ খর্ব করিবার চেষ্টা করিলে আমরা (অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকেরা) আদালতে বিচার প্রার্থনা করিতে পারি। ভারতীয় নাগরিকদের কয়েকটা প্রধান মৌলিক অধিকার নিম্নরূপ ঃ

(১) **আইনের চক্ষে সমতা ঃ** ধর্ম, বর্ণ বা স্ত্রী-পুরুষ বিচারে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে না। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার।

(২) প্রত্যেক নাগরিকের পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা থাকিবে।

(৩) অপেক্ষাকৃত সবলেরা অপরকে শোষণ করিতে পারিবে না। মানুষ লইয়া ব্যবসা, বেগার খাটান, অস্পৃশ্যতা আইনত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) প্রত্যেক নাগরিক ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে।

(৫) প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে।

এই অধিকারগুলিকে মৌলিক বা বুনিয়াদী অধিকার বলা হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, এই অধিকারগুলির উপর ভিত্তি করিয়া নাগরিকের জীবন পরিপূর্ণ বিকাশের পথ পায় এবং নাগরিক শান্তিপূর্ণ ও সভ্য জীবন যাপন করিতে পারে। রাষ্ট্রের আইনসভা ও বিচারালয়ের বিশেষ দায়িত্ব থাকে, এই মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার।

নাগরিকের কর্তব্য

নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি তাহাব কতকগুলি কর্তব্যও আছে। কর্তব্য ছাড়া অধিকার নাই। এই কর্তব্য পালন ব্যতীত অধিকার ভোগ করা যায় না। নাগরিকের অধিকার-গুলির মধ্যে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার অন্যতম, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু এই বলিয়া কেহ যদি গুণ্ডামি-খুন-রাহাজানির জন্য সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দাবি করে, তবে উহা গ্রাহ্য হইবে না। কারণ, তাহা হইলে অপর নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপনেব অধিকার বিপন্ন হইবে। বাক্-স্বাধীনতা নাগরিকদের একটি মূল্যবান অধিকার। কিন্তু নাগরিক যদি প্রতিবেশী বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিবার বাক্-স্বাধীনতা দাবি করে, তবে উহা গ্রাহ্য হইবে না। কেননা তাহা হইলে আর একজন নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের অধিকার কি করিয়া রক্ষিত হইবে? নাগরিক অপর একজন নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ অধিকার রক্ষা বা ভোগ করিতে পারে না। তাই নাগরিককে অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিবার জন্য নাগরিককে যে কর্তব্যগুলি পালন করিতে হয় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল ঃ

১। **রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার**ঃ আমি যে রাষ্ট্রের নাগরিক উহার প্রতি অবশ্যই আমার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। রাষ্ট্র বিপন্ন হইলে উহা রক্ষা করা এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়াও নাগরিকের কর্তব্য।

২। **আইন মানিয়া চলা**ঃ নাগরিক তাহার অধিকারগুলি আইনের মাধ্যমেই ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্র যদি আইন দ্বারা নাগরিকের অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি না দেন, তাহা হইলে নাগরিক আদৌ তাহার অধিকার ভোগ করিতে পারে না। তাই প্রত্যেক নাগরিককেই আইন মানিয়া চলিতে হয়।

৩। **নিয়মিত কর দেওয়া**ঃ নাগরিকের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করে। ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। শাসনকার্য চালাইবার জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? নাগরিকদের প্রদত্ত কর হইতেই রাষ্ট্রের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। নাগরিকদের উপর সেই কর ধার্য হয়। ধার্য কর নিয়মিত না দিলে রাষ্ট্র পঙ্গু হইয়া পড়ে। তাই নিয়মিত কর দেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

৪। **সৎভাবে ভোট দেওয়া**ঃ ভোট দেওয়া নাগরিকদের একটি মূল্যবান অধিকার, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নাগরিকের ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়। তাই ভোট দেওয়া নাগরিকদের কর্তব্যও বটে। কিন্তু এই ভোট যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে প্রদান করা উচিত। অর্থের লোভে বা অন্য কোন কারণে নাগরিক যদি অনুপযুক্ত ও অপদার্থ ব্যক্তিদের ভোট দেয়, তাহা হইলে তো এই সকল অনুপযুক্ত ও অপদার্থ ব্যক্তিরাই সরকার পরিচালনা করিবে। তাহার ফলে দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাই সৎভাবে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে নাগরিকের ভোট দেওয়া উচিত।

৫। **রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা** ঃ নাগরিকদের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাটের উন্নতি, বাসস্থান প্রভৃতি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সকল উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা নাগরিকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ; কেননা এই সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন হইবার উপর তাহার শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপন করা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

দলের ভূমিকা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই সবজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। জনসাধারণ ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন করে। কিন্তু জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিবে কে? জনসাধারণকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিবে কে? বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি এই ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দলগুলির নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। তাহাদের লক্ষ্য সরকাব দখল করিয়া নির্দিষ্ট কর্মসূচী কার্যে পরিণত করা।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভোটের সময় আমরা একাধিক দল দেখি কেন? ইহার কারণ এই যে, দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। স্বার্থ বিভিন্ন বলিয়া বিভিন্ন দল গঠিত হয়। সমাজের সকলের স্বার্থ এক হইলে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী না থাকিলে বিভিন্ন দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ থাকে না। বিভিন্ন শ্রেণী উহাদের স্বার্থ পূরণের জন্য পৃথক পৃথক দলের মধ্যে সংগঠিত হয়। ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ লেবর পার্টি গঠিত হইয়াছে। ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠনের জন্য

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, লেবর পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য তো প্রায় একই রকম, তাহা হইলে ইহারা পৃথক দল হিসাবে সংগঠিত হইয়াছে কেন?, ইহার কারণ এই যে, লক্ষ্য মোটামুটি একরকম হইলেও লক্ষ্য পূরণের পথ বিভিন্ন হইতে পারে; ফলে মতবিরোধ ঘটে এবং বিভিন্ন দল গঠিত হয়।

ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষে প্রধান দলগুলি হইল—কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, জনসংঘ, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য মুস্লিম লীগ নামে একটি বড় দল ছিল। এই দল পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতায় দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষের বৃহত্তম দল কংগ্রেস। ইহার লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব আছে বলিয়া কংগ্রেস মনে করে না। উভয় শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমেই দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে বলিয়া কংগ্রেস বিশ্বাস করে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কমিউনিস্ট পার্টি। এই দলেরও উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই দল ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলির লক্ষ্যও সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ কি হইবে, তাহা লইয়া ইহাদের কমিউনিস্ট পার্টির সহিত মতবিরোধ আছে। হিন্দু মহাসভা এবং জনসংঘ প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগঠিত হইয়াছে।

আধুনিক লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন

রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কি, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন জানা দরকার বর্তমানে কিভাবে বিভিন্ন দেশে লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত হয়।

সাধারণত দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলি উহাদের কর্মসূচীর পিছনে জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। কেননা জনসাধারণের সমর্থন না পাইলে তাহারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে তাই ইহারা সভা, পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে দলের কর্মসূচী প্রচার করে। দলের নেতারা সভায় বক্তৃতা করেন, পুস্তিকায় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দল বিশেষভাবে কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। তখন দেশের বিভিন্ন অংশে সভার ধূম পড়িয়া যায়।

প্রত্যেক সভ্যদেশেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলিও অনেক সময় দলীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করে। সংবাদপত্র লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দৈনিক সংবাদপত্র মারফত লোকসমাজ দেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানিতে পারে। ইহার ফলে তাহাদের চেতনা জাগ্রত হয়। আজকাল রেডিও হইতেও নানা রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা প্রচারিত হয়। রেডিও শুনিয়াও লোকসমাজ দেশ ও বিদেশের নানা রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র ও রেডিও—ইহাদের উপর লোক-সমাজের রাজনৈতিক জীবনের ভালমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। সুস্থ রাজনৈতিক জীবন গঠনের জন্য ইহাদের দায়িত্ব অপরিসীম। দলীয় স্বার্থ পূরণের জন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচার, কুৎসা রটনা, গুণ্ডাবাজির আশ্রয় প্রভৃতি লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্কিল আবর্তে ঠেলিয়া দিবে। নির্বাচনের সময়ে মারামারি, গুণ্ডামি, খুনজখম প্রভৃতি ঘটিতে দেখা যায়। ইহাতে লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন সুস্থ বিকাশের পথ পায় না, উহার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় না। উপযুক্ত লোকের বদলে একদল অপদার্থ, গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের হাতে রাজনৈতিক জীবনের নেতৃত্ব চলিয়া যায়। ইহারা দেশের কল্যাণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত বা দলীয় বা গোষ্ঠীগত স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে। ফলে দেশে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করে। অপর দিকে সুস্থ রাজনৈতিক জীবন লোকসমাজের চেতনা বৃদ্ধি করে, যোগ্য লোক পুরোভাগে আসে, দুর্নীতিপরায়ণ ও অপদার্থ দল বা ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতায় সহজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। এই রাজ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং অনেকগুলি সংবাদপত্র লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত করে। কলিকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে কিংবা বিভিন্ন পার্কে প্রায় প্রতিদিন সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্বে মাঝে মাঝে শোভাযাত্রা বাহির হয়, ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্রগুলি নানা রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রচার করে। কলিকাতায় রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে বহু ইস্তাহার আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এই রাজ্যে রাজনৈতিক কারণে গুণ্ডাবাজি, মারামারির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রাজনৈতিক দলাদলির ফলে কত

লোক হতাহত হইয়াছে! রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুণ্ডার দল গঠনের সংবাদও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এইগুলি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে খুবই অশুভ লক্ষণ।

গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ :

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত শাসনের নামই গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনসাধারণের নেতৃত্ব ও অংশ গ্রহণই বড় কথা। গণতন্ত্রে জনসাধারণের নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থাকে, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। গণতন্ত্রে জনসাধারণই সরকার নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সংখ্যালঘিষ্ঠকে মানিয়া চলিতে হয়।

শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারিত হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়া চলিবে, অপরের উপর নিজের মত চাপাইবার চেষ্টা না করিয়া ধৈর্য সহকারে তাহার মতামত শুনিতে হইবে, পারিবারিক জীবনে কিংবা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা লইয়া সকলের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যক্তি শুধু নিজের স্বার্থ বা মতামতকেই চরম সত্য বলিয়া মনে করিবে না, সমাজ ও পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ ও মতামতকেও সমান গুরুত্ব দিবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, গর্বান্ধ ও উদ্ধত, গণতান্ত্রিক সমাজে তাহার স্থান থাকিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত সবল বা ধনী ব্যক্তি যদি তাহার পদমর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর জুলুম করেন কিংবা শোষণ করেন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।

আমাদের দেশে আমরা কি দেখি? আমাদের সমাজজীবনে গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে, পারিবারিক জীবনে আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রায়ই অনুসরণ করি না। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা আমাদের মধ্যে আজও পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করে নাই। আমরা কি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কার? আমরা কি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়িয়া দেশ-বিদেশের বাজনৈতিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করি? পারিবারিক জীবনে কোন সমস্যার সৃষ্টি হইলে উহার সমাধানের জন্য আমরা কি পরিবারের সভ্যদের সহিত উহা আলোচনা করি? কোন বারওয়ারি পূজাপার্বণ অনুষ্ঠানের সময় আমরা কি পাড়ায় সকলের মতামত অনুযায়ী কাজ করিবার চেষ্টা করি? গ্রামে বা সহরেব পাড়ায় পাড়ায় ছোটখাট বিষয় লইয়া দলাদলি কি প্রায়ই ঘটে না? দলাদলির সুযোগ গ্রহণ করিয়া গ্রামের কোন মাতব্বর ব্যক্তি কি অনেক সময় একজন স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মত ব্যবহার করেন না? মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাচারিতা গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী, সমাজ-জীবনের পক্ষেও উহা কল্যাণকর নয়।

অনুশীলনী

১। আজকাল সব দেশেই মাঝে মাঝে নির্বাচন হয় কেন? নির্বাচন কি নাগরিকের পক্ষে সুবিধাজনক?

২। ভোটের অধিকার কি সর্বজনীন হওয়া উচিত? যাহারা শিক্ষিত শুধু তাহাদের ভোটের অধিকার থাকা কি ভাল নয়?

৩। নাগরিকের অধিকার বলিতে তুমি কি বোঝ? এই অধিকারগুলি না থাকিলে নাগরিকদের কি ক্ষতি হইত?

৪। নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকারগুলি কি কি? এই অধিকারগুলি নাগরিক কিভাবে ভোগ করিতে পারে?

৫। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক কি কর্তব্য ছাড়া অধিকার নাই—ইহা কি সত্য?

৬। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? দলের ভূমিকা কি?

৭। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হয় কেন? ইহার সার্থকতা কি? বাংলা দেশের প্রধান দলগুলির লক্ষ্য কি?

৮। রাজনৈতিক চেতনা বলিতে কি বোঝ? কিভাবে লোকসমাজে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে?

৯। পশ্চিম বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

১০। গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ কি? সামাজিক জীবনে কিভাবে ইহা প্রয়োগ করা যায়?

অশুদ্ধ বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ:

১। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২। পশ্চিমবঙ্গে আইন সভার নির্বাচনে ধনী-নির্ধন পুরুষরা ভোট দিতে পারে।

৩। নারীগণ ভোট দিতে পারে, কিন্তু নির্বাচিত হইতে পারে না।

৪। ভারতে নাগরিকগণ যে কোন ধর্ম অনুসরণ করিতে পারে না।

৫। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংখ্যালঘিষ্ঠের মত মানিয়া চলা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা

আমাদের দেশ বিরাট। ইহা কয়েকটা প্রদেশে বিভক্ত, আবার প্রদেশগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত, জেলাগুলি মহকুমা, ইউনিয়ন ও গ্রামে বিভক্ত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—এই বিরাট দেশে শাসনকার্য কিভাবে চলে? সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায়, সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। আমরা আর একটি অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব। কিন্তু কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাহা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন নয়। উহারা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতাই অধিক। নাগরিক জীবনের সহিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে গঠিত—কোন সহর বা জেলা বা মহকুমা বা গ্রামের সীমানার মধ্যেই ইহাদের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। প্রধানত জনকল্যাণমূলক কাজই ইহাদের করিতে হয়। ব্রিটিশ আমলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের এক অংশ নির্বাচিত, এক অংশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। বর্তমানে প্রায় সকলেই নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যরা কিন্তু লোকসভা বা বিধানসভার সদস্যদের মত সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত হন না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ভোটদাতাদের নির্দিষ্ট সম্পত্তিগত বা শিক্ষাগত যোগ্যতা

থাকা চাই। অবশ্য পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

সরকার আইন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির কর্তব্য ও ক্ষমতা স্থির করিয়া দেন। ইহা ছাড়া, ইহাদের কাজের তদারক করা বা প্রয়োজন হইলে ইহাদের বাতিল করিয়া দিবার ক্ষমতাও সরকারের আছে।

নিজ নিজ এলাকার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ছোটখাটো সরকারের মত। কতকগুলি বিষয়ে বিধি-উপবিধি প্রণয়ন করা বা আদেশ জারি করার ক্ষমতা ইহাদের আছে। কতকগুলি বিশেষ ধরণের কর ইহারা ধার্য করিতে পারে। কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডে ছোটখাটো ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলারও বিচার হয়। তবে এই সবকিছু কাজই সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে থাকিয়া করিতে হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—**নগর প্রতিষ্ঠান** ও **গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠান**। মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড হইল নগর-প্রতিষ্ঠান। জেলা বোর্ড, লোকাল বা তালুক বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ হইল গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠান।

মিউনিসিপ্যালিটি

একমাত্র ক্যাণ্টনমেণ্ট সহর ছাড়া যে কোন সহরকে রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত করিতে পারেন। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য বা কমিশনারের সংখ্যা নয় জনের কম বা ত্রিশ জনের বেশী হইবে না। (কোথায় কতজন কমিশনার থাকিবেন, তাহা রাজ্য সরকার স্থির করেন। কমিশনারগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। তবে

রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কয়েকটি আসন নির্দিষ্ট রাখিতে পারেন। নবগঠিত মিউনিসিপ্যালিটিতে রাজ্য সরকার দুই বৎসরের জন্য কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন।) কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান এবং এক বা একাধিক সহকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। কমিশনারদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে তাঁহাদের পদ হইতে অপসারিত করা যায়। ইহারা সকলেই অবৈতনিকভাবে কাজ করেন। চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মকর্তা। ইহা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজের জন্য সেক্রেটারী, ইঞ্জিনীয়ার, হেলথ্ অফিসার, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর প্রভৃতি কর্মচারিগণ নিযুক্ত হন। মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার রাজ্য সরকারের আছে। অযোগ্যতা, কাজে ক্রমাগত গাফিলতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকার কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে বা তাহার কোন বিভাগকে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। কতিপয় ক্ষেত্রে সরকার কমিশনারদেরও পদচ্যুত করিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য টিকা দেওয়া, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, ময়লা ও জল নিকাশের ব্যবস্থা করা, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা ইত্যাদি। (২) সহরবাসীদের সুখ-সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করা, রাস্তায় জল ও আলো দেওয়া, উদ্যান নির্মাণ করা, বাড়ীঘর নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা, মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা, অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা, বাজারের ওজন ও মান নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। (৩) শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা ও পরিচালনা করা, লাইব্রেরীতে সাহায্য দান করা ইত্যাদি।

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস বহুবিধ। সহরের প্রতি জমি ও বাড়ীর উপর মিউনিসিপ্যালিটি একটি কর ধার্য করে। ইহা ছাড়া, মিউনিসিপ্যাল এলাকাব মধ্যে সকল ব্যবসা ও বৃত্তির উপরও কর ধায করা হয়। গাড়ী ও পশুর মালিকদেরও কর দিতে হয়। ব্যবসার জন্য সহরে যে মাল আমদানি-রপ্তানি হয়, তাহাব উপর মিউনিসিপ্যালিটি কর বসাইতে পারে। ইহার নিজস্ব সম্পত্তি, যেমন বাজাব, ডাকবাংলো ইত্যাদি হইতেও কিছু আয় হয়। সর্বোপরি, প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থসাহায্য করেন এবং মিউনিসি-প্যালিটিও সরকারের অনুমতি লইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। মিউনিসিপ্যালিটির আয় উহার কর্মচারীদের বেতন ও বিবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়।

কর্পোরেশন

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিন মহানগরীর মিউনিসি-প্যালিটিকে কর্পোরেশন বলা হয়। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনই সবচেয়ে বড়। ইহার আয় বার্ষিক প্রায় ৬ কোটি টাকা। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। বর্তমান কর্পোরেশন ১৯৫১ সালের আইন অনুসারে গঠিত।

কর্পোরেশনের সদস্যদের কাউন্সিলর এবং সভাপতিকে মেয়র বলে। কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলরের সংখ্যা ৭৬ জন। ইহাদের মধ্যে ৭৫ জন নির্বাচিত, বাকি একজন হইলেন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। কাউন্সিলরগণ ৫ জন অল্ডারম্যান, ১ জন মেয়র ও ১ জন ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত করেন। কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। মেয়রই কর্পোরেশনের প্রধান কর্তা। কর্পোরেশনেব

বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য নয়টি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হয়। প্রতি কমিটিতে ১২ জন করিয়া সদস্য থাকেন। রাজ্যসরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের একজন প্রধান কর্মকর্তা বা কমিশনার নিযুক্ত করেন। কর্পোরেশনের সমস্ত কর্মচারী এই কমিশনারের অধীন। কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশনার কর্পোরেশনের কার্য পরিচালনা করেন। সরকার যে কোনও সময় কমিশনারকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কাউন্সিলরদের অধিকাংশ দাবি করিলেও সরকার কমিশনারকে অপসারণ করিতে বাধ্য।

ছোট সহরে মিউনিসিপ্যালিটিকে যে সব কাজ করিতে হয়, কর্পোরেশনও সেই সকল কাজ করে। তবে কর্পোরেশনের এলাকা অনেক বড় এবং সেখানকার জনসংখ্যাও অনেক বেশী বলিয়া উহার দায়িত্ব আরও অনেক গুরুতর।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আয়ের যেসব উৎস আছে, কর্পোরেশনেরও সেই সব সূত্র হইতে আয় হয়। তবে কর্পোরেশনের আয় স্বভাবতই অনেক বেশী।

ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ

যে সব সহরে সেনানিবাস থাকে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির পরিবর্তে ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড স্থাপিত হয়। এই বোর্ডে কিছুসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হন; কিন্তু উহার পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ।

জেলা বোর্ড

প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা বোর্ড আছে। উহার সদস্য-সংখ্যা ৯ জনের কম বা ৩৩ জনের বেশী হইতে পারিবে না।

বর্তমানে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। যে সব জেলায় লোকাল বোর্ড নাই, সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ চার বৎসরের জন্য জেলা বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথা প্রচলিত। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য সরকার জেলা বোর্ডে আসন সংরক্ষণ করিতে পারেন। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান এবং এক বা একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান কর্তা। তিনি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সেক্রেটারী, ইঞ্জিনীয়ার, হেলথ অফিসার প্রভৃতি বেতনভোগী স্থায়ী কর্মচারীদের সাহায্যে বোর্ডের কার্য পরিচালন করেন। বোর্ডের কাজ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। রাজ্য সরকারের নির্দেশে তাঁহারা বোর্ডের চেয়ারম্যান বা কোনও সদস্যকে অপসারিত করিতে পারেন, এমন কি প্রয়োজন হইলে বোর্ডকে বাতিল করিতেও পারেন।

গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, রোগের প্রতিকার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি জেলা বোর্ডের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া ডাকবাংলো, হাট-বাজার প্রভৃতি স্থাপন করা, নদীবহুল জেলায় খেয়া পারাবারের ব্যবস্থা করা, বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময় আর্তদের সাহায্য করা ইত্যাদি আরও বিবিধ দায়িত্ব জেলা বোর্ডকে গ্রহণ করিতে হয়।

জেলা বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইল রোড সেস্ বা পথকর। আয়ের অন্যান্য উৎসের মধ্যে আছে রাস্তা, পুল প্রভৃতির শুল্ক, জেলা বোর্ডের ফেরীঘাট, মোটর গাড়ীর উপর ট্যাক্স, খোঁয়াড়, হাসপাতাল, ডাকবাংলো প্রভৃতির আয়। মিউনিসিপ্যালিটির মত জেলা বোর্ডও সরকারী সাহায্য পাইতে পারে এবং সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ

সংগ্রহ করিতে পারে। কর্মচারীদের বেতন দিতে ও উল্লিখিত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করিতে এই আয়ের সময় অর্থ ব্যয় হয়।

লোকাল বোর্ড

লোকাল বোর্ড একটি মহকুমার এলাকার মধ্যে কাজ করে। সেইজন্য ইহা মহকুমা বোর্ড বা তালুক বোর্ড নামেও পরিচিত। অন্যূন ৬ জন সদস্য লইয়া ইহা গঠিত। সদস্যগণ চেয়ারম্যান ও সহকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

লোকাল বোর্ড জেলা বোর্ডের অধীন। নিজ এলাকার মধ্যে জেলা বোর্ডের কাজ সম্পন্ন করাই ইহার কাজ। ইহার আয়েব কোন পৃথক ব্যবস্থা নাই, জেলা বোর্ড ইহাকে অর্থসাহায্য করে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সবনিম্ন স্তরে হইল ইউনিয়ন বোর্ড। এক বা একাধিক পাশাপাশি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন বোর্ড থাকে।

ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা ৬ হইতে ৯ জন পর্যন্ত হইতে পারে। ব্রিটিশ আমলে বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কতৃক মনোনীত হইতেন। বর্তমানে সকল সদস্যই নির্বাচিত হন। প্রতি চার বৎসর অন্তর অন্তর বোর্ডের নির্বাচন হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী ভোট দিতে পারেন না। এই নির্বাচনের ভোটার হইতে হইলে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত যোগ্যতা থাকা চাই ঃ—

(১) গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে; (২) বয়স কমপক্ষে ৩১ বৎসর হইতে হইবে; (৩) বার্ষিক অন্তত ছয় আনা ইউনিয়ন বোর্ডের কর অথবা আট আনা সেস্ দিতে হইবে অথবা স্কুল ফাইন্যাল বা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

বোর্ডের সদস্যগণ চার বৎসরের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত করেন। সভাপতিই বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজকর্ম তদারক করা ও হিসাব পরীক্ষা করার দায়িত্ব সার্কেল অফিসারের। সরকার কতকগুলি কারণে বোর্ডের সভাপতিকে অপসারিত করিতে বা বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা বোর্ডের অন্যতম প্রধান কাজ। দফাদার ও চৌকিদারদের মারফৎ বোর্ড এই কাজ করে।

ইহা ছাড়া বোর্ডকে গ্রামের জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। এইজন্য দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, টিকা দেওয়া, বনজঙ্গল পরিষ্কার করা ইত্যাদি বিবিধ কাজের ভার বোর্ডকে লইতে হয়।

জনশিক্ষা বিস্তার করাও বোর্ডের কাজ। এইজন্য বোর্ডকে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিতে ও পরিচালিত করিতে হয়। পশু-মড়ক নিরোধ করা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা ইত্যাদি আরও বহুবিধ কাজ বোর্ডকে করিতে হয়।

ইহা ছাড়া, ছোটখাটো ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারও ইউনিয়ন বোর্ডকে করিতে হয়।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারি কর। গ্রামের সম্পত্তির মালিকদের উপর এই কর ধার্য করা

হয়। আদালত হিসাবে কাজ করিয়া মামলার ফী, জরিমানা ইত্যাদি বাবদ বোর্ডের কিছু আয় হয়। আয়ের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে আছে খোঁয়াড়, ফেরীঘাট ইত্যাদি হইতে আয় এবং জেলা বোর্ড ও সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য।

বোর্ডের এই আয়ের প্রায় অর্ধেক ব্যয় হয় চৌকিদার, দফাদারদের বেতন দিতে। বাকি অর্ধেক ব্যয় হয় জনকল্যাণমূলক কাজে ও বিবিধ খাতে।

পঞ্চায়েৎ

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে। যেখানে পঞ্চায়েৎ আছে, সেখানে ইউনিয়ন বোর্ড নাই। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটে পঞ্চায়েৎ নির্বাচিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল

আইনসভার বিগত অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল উত্থাপিত হইয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন হইবে।

পঞ্চায়েৎ বিল অনুসারে একেবারে নীচে থাকিবে গ্রামসভা, উহার উপরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর থাকিবে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ। বিচারসংক্রান্ত কিছুকিছু ক্ষমতা ন্যায় পঞ্চায়েতের হাতে থাকিবে।

গ্রামসভা

গ্রামে যাঁহারা আইনসভার ভোটার-তালিকাভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া গ্রামসভা গঠিত হইবে। গ্রামসভার এলাকা, অর্থাৎ কোন্ কোন্ গ্রাম লইয়া গ্রামসভা গঠিত হইবে উহা পরে সরকার

ঠিক করিয়া দিবেন। ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, নূতন আইন অনুসারে গ্রামের নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই গ্রামসভার সভ্য হইবেন।

গ্রামসভা বৎসরে দুইবার সাধারণ সভা আহ্বান করিবে। বাৎসরিক সাধারণ সভায় উহা বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যবিবরণী আলোচনা করিবে।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ :

গ্রামসভা উহার সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করিবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্যসংখ্যা ৯ জনের কম এবং ১৫ জনের বেশী হইবে না। রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কিছু সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন। মনোনীত সভ্যদের সংখ্যা পঞ্চায়েতের মোট সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না। মনোনীত সভ্যগণের ভোটাধিকার থাকিবে না।

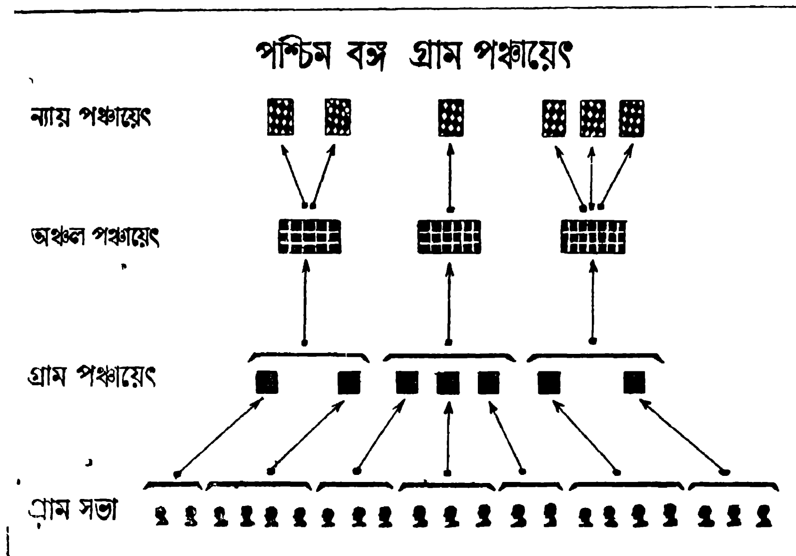
গ্রাম পঞ্চায়েৎ ইহার সভ্যদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ এবং একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ, উহার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষের কার্যকাল চার বৎসর।

গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি উহাদের এলাকায় পানীয় জল, নালা-নর্দমার ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের সংস্কার, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি কাজ করিবে। এইগুলি ছাড়া রাজ্যসরকারের নির্দেশে ইহারা প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রসূতি-কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, সেচ ব্যবস্থা, অকর্মণ্য ও দুঃস্থদের যত্ন প্রভৃতি আরও বিভিন্ন

রকমের কাজ করিবে। অবশ্য এই শেষোক্ত কাজগুলির জন্য রাজ্যসরকার পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিবেন।

অঞ্চল পঞ্চায়েৎ

কয়েকটি সংলগ্ন গ্রামসভা লইয়া এক একটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকা, এবং কোন্ কোন্ গ্রাম সভা লইয়া উহা গঠিত হইবে তাহা সরকার ঠিক করিবেন।



গ্রামসভার সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রাম পঞ্চায়েৎ অঞ্চল পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করিবে। গ্রামসভার প্রতি ২৫০ জন সভ্যের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচনের পদ্ধতি সরকার ঠিক করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়েৎ উহার সভ্যদের মধ্য হইতে একজন প্রধান এবং একজন উপপ্রধান নির্বাচন করিবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের কার্যকাল চার বৎসর।

অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি সম্পত্তির মালিকদের উপর কর, রেট বা চৌকিদারি ট্যাক্স, পথকর প্রভৃতি ধার্য এবং আদায় করিবে। উহারা শান্তি-রক্ষার জন্য দফাদার ও চৌকিদারের নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের ব্যয়ভার বহন করিবে। উহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করিবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন সম্পাদক থাকিবে। এই সম্পাদক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

ন্যায় পঞ্চায়েৎ

সরকারের অনুমতি পাইলে প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ এক বা একাধিক ন্যায় পঞ্চায়েৎ গঠন করিতে পারিবে। ন্যায় পঞ্চায়েতে পাঁচজন বিচারক থাকিবেন। এই বিচারকগণ গ্রামসভার সভ্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। ন্যায় পঞ্চায়েতের হাতে উহার এলাকার ছোটখাটো দেওয়ানী [illegible] এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের বিচারের ভার ন্যস্ত থাকিবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সহর বা মহকুমা বা গ্রামের সীমানার মধ্যে যে সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করে তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি ভারত সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি নূতন পরিকল্পনার প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার নাম 'সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা' বা Community Development Project। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৫২ সনের ২রা অক্টোবর হইতে এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে এবং বর্তমানে ক্রমশ উহার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা এই খাতে ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই লোকসমাজের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। আজও সহরের তুলনায় গ্রামের সংখ্যা অনেক গুণ বেশী।



বারুইপুর সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার একাংশ

গ্রামেই দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টির বাস। স্বভাবতই গ্রামের উন্নয়নের সহিত লোকসমাজের উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার

প্রধান লক্ষ্য গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। কৃষির উন্নতি, সেচের ব্যবস্থা, কুটীরশিল্পের উজ্জীবন, রাস্তাঘাটের সংস্কার, নূতন নূতন রাস্তাঘাটের নির্মাণ, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় এক শত বা কোথায়ও দুই শত গ্রাম লইয়া একটি **সমাজ-উন্নয়ন ব্লক বা কেন্দ্র** স্থাপিত হইতেছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলায় এইরূপ ১১টি ব্লকের কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই ব্লকগুলি হইল : চব্বিশ পরগণার বারুইপুর ও হাবড়া; বর্ধমানের শক্তিগড় ও গুসকরা; বীরভূমের আহ্‌মদপুর, মহম্মদবাজার, নলহাটি; মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম; নদীয়ার ফুলিয়া; বাঁকুড়ার সোনামুখী; কোচবিহারের দিনহাটা। অর্থাৎ ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার কয়েকটি অঞ্চল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার উহা শেষ নয়, সুরু। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও অনেক অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন ব্লক প্রসারিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে।

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজে তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। জনসাধারণ অর্থদান করিবেন, শ্রমদান করিবেন। উন্নয়নের কাজে তাহারা নিজেরা অংশ গ্রহণ করিবেন। সরকারও অর্থসাহায্য করিবেন। বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কাজের জন্য শুধু সরকারী কর্মচারীই নয়, জনসাধারণের নির্বাচিত কমিটিও থাকিবে। প্রতিটি ব্লকে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া 'ব্লক পরামর্শদাতা কমিটি' (Block Advisory

Committee) গঠিত হইবে। অর্থাৎ জনসাধারণ ও সরকারের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টাই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাণ।

বহুমুখী কাজ

বিভিন্ন ব্লকে বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। প্রত্যেক ব্লকে একটি ছোট সহর (Township) স্থাপিত হইবে। সহরে আধুনিক ঘরবাড়ী, বিজলী বাতী, পাকা নালা-নর্দমা, পানীয় জল প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিবে। নানা রকম জিনিসপত্র তৈয়ারীর জন্য ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হইবে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্রসূতি-কেন্দ্র প্রভৃতিও থাকিবে। ইহার ফলে বিভিন্ন ব্লকের জনসাধারণ সহুরে জীবনের সুখসুবিধার সহিত পরিচিত হইবে। গ্রাম্য জীবনে তাহারা অভ্যস্ত, সহুরে জীবন কিরূপ তাহাও তাহাদের জানা উচিত। তাই প্রতিটি ব্লকে সহর স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রতিটি ব্লকে এই ছোট সহরটিকে কেন্দ্র করিয়া থাকিবে গ্রামাঞ্চল। বেশীর ভাগ মানুষই স্বভাবত এই গ্রামাঞ্চলেই বাস করিবে। এই গ্রামাঞ্চলেও জনসাধারণেব সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন -মূলক কাজ চলিবে; যথা—কৃষির উন্নতি, পশুপক্ষী পালন. সেচের জন্য খালকাটা এবং নলকূপ নির্মাণ, পতিত জমি উদ্ধার, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামের কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি।

বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়ন কার্য

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলিতেছে। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত এই সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্মে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে জনসাধারণ

প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শুধু অর্থদানই নয়, জনসাধারণ শ্রমদানও করিয়াছেন।

১৯৫৯ সনে বিধানসভার মার্চ মাসের অধিবেশনে সমাজ-উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ এই রাজ্যে সমাজ-উন্নয়ন কার্যের ক্রমোন্নতির বিবরণ দিয়াছেন। ইতোমধ্যে ১৩৫টি অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন ব্লক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইভাবে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৪০ ভাগ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আগামী চার বৎসরে বাকী ৬০ ভাগ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

কৃষি

কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্লকে ৩,৬৬৭ মণ বীজ ও ৫৬,৯৭৬ মণ সার বন্টিত হইয়াছে। অভাবের দিনে কৃষকের ঋণ প্রয়োজন। এই ঋণ গ্রহণ করিয়া কৃষক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে। বিভিন্ন ব্লকের কৃষকদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩১,৯৭৫ টাকার স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ বণ্টন করা হইয়াছে। গ্রামের পোড়ো জমিতে বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে।

পশুপক্ষী পালন

গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসী হাঁস, মুরগী, গরু-ছাগল প্রভৃতি পশুপক্ষী পালন করেন তাহা আমরা জানি। গ্রাম হইতেই এই সকল পশুপক্ষী সহরে আমদানি হয়। কিন্তু পশুপক্ষীর চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকিলে পশুপক্ষীর মধ্যে মরক লাগিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গো-মরক প্রায়ই ঘটে। তাহাতে কৃষকের সর্বনাশ হয়। প্রতিটি ব্লকে সেইজন্য একটি পশুচিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পশুপক্ষীকে বিভিন্ন রোগের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সেচ

জল না হইলে চাষ হয় না। সেচের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। বিভিন্ন ব্লকে ছোট ছোট খাল কাটিয়া কিংবা মজা খালের সংস্কার করিয়া সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ধমানের শক্তিগড়ে মরা বেহুলা খালকে বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে। শক্তিগড়ের পিপাসিত চাষের মাঠকে জলসিঞ্চিত করিতেছে বেহুলা নদী। চাষের জল সরবরাহের জন্য নলকূপও বসান হইতেছে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে হাজার হাজার বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপকরণ যে কত সামান্য তাহা গ্রামে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা একটি বড় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রতিটি ব্লকে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে, ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিবার জন্য বাড়ী বাড়ী ডি. ডি. টি. ছড়ানোর ব্যবস্থা আছে। নদীয়ার ফুলিয়া ব্লকে একটি ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে. এই কেন্দ্রে দশটি শয্যা আছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর কবল হইতে গ্রামবাসীকে বাঁচানোর জন্য ব্যাপকভাবে টিকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বাস্থ্যের সহিত পানীয় জল সরবরাহের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিভিন্ন ব্লকে অসংখ্য কূপ এবং নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে পানীয় জল সরবরাহের জন্য।

শিক্ষা

শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিক্ষার ব্যবস্থাও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত। বিভিন্ন ব্লকে পূর্ব হইতেই যে সকল বিদ্যালয় ছিল উহার পরিচালনার

ভার বর্তমানে ব্লকগুলিই গ্রহণ করিয়াছে। বিদ্যালয়গুলির সংস্কারেরও ব্যবস্থা হইতেছে। নূতন নূতন বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বিভিন্ন ব্লকে নৈশ বিদ্যালয়ে বয়স্ক গ্রামবাসীদের অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা আছে।

কুটীরশিল্প

কুটীরশিল্প গ্রামবাসীর জীবিকার অন্যতম উৎস। বাংলার কুটীরশিল্প একদিন খুবই সমৃদ্ধ ছিল। ইংরাজ আমলে কুটীরশিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। কুটীরশিল্প ধ্বংস হইবার ফলে গ্রামবাসীদের জীবিকার জন্য শুধু চাসবাসকেই অবলম্বন করিতে হয়। বিভিন্ন ব্লকে কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য তাই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ফুলিয়া ব্লকে প্রায় একলক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তর হইতে ভ্রাম্যমাণ দল বিভিন্ন ব্লকে বয়নশিল্প, চামড়া-পাকাই শিল্প, তালগুড় শিল্প প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাস্তাঘাট

ঝাড়গ্রাম, বারুইপুর এবং ফুলিয়া—এই তিনটি ব্লকে রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। গ্রামবাসীরা শ্রমদান করিয়া গ্রামে গ্রামে কাঁচা রাস্তা বানাইয়াছেন। এইভাবে প্রায় ৫৪ মাইল নূতন কাঁচা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে।

উপরের বিবরণী হইতে আমরা সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝিতে পারি। বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্গত শত শত গ্রামের চেহারাই পাল্টাইয়া যাইতেছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহনের উন্নতি গ্রামবাসীকে নবজীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। স্মরণ

রাখা প্রয়োজন যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে গ্রামবাসীর সচেতন সহযোগিতার উপর। শুধু কর্মচারীদের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। তাই গ্রামবাসীদের সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

অনুশীলনী

১। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কি? ইহার বৈশিষ্ট্য কি?

২। মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রামপঞ্চায়েতে সরকারের প্রতিনিধি থাকার সার্থকতা কি?

৩। মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানত কি কি কাজ করে?

৪। ভারতবর্ষে গ্রামপঞ্চায়েৎ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৫। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি?

৬। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ-উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয় কেন?

৭। বিভিন্ন ব্লকে কি কি কাজ হয়?

৮। কোন একটি উন্নয়ন ব্লকের কার্যাবলীর বিবরণ লিখ।

অশুদ্ধ বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :

১। ভারতে প্রতি সহরে কর্পোরেশন আছে।

২। প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যরা নির্বাচিত হন।

৩। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

৪। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হন।

৫। সরকার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের পদচ্যুত করিতে পারেন না।

৬। গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্য হইতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতের অবস্থা যাহা ছিল আজ তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তখন ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি দেশ। ১৯৪৬ সনের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট "ভারতীয় স্বাধীনতা আইন" নামে একটি আইন পাস করে। সেই আইনবলে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সনেব ২৭শে জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান-সভাব (Constituent Assembly) সিদ্ধান্তবলে ভাবত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচন হয়। জাতি-বর্ণ-শ্রেণী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেই ভোট দিবার অধিকারী। আইন অনুসারে যাহাদেব ২১ বৎসর বয়স তাহাদেরই প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য করা হইবে। নাগরিকদের ভোটেই লোকসভা এবং রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। ভোট গোপনে দিতে হয়। এই প্রথাকে 'ব্যালট ভোট' (Vote by Ballot) বলা হয়। গোপন ভোটের সুবিধা এই যে, প্রতিপত্তিশালী ও ধনী লোকেরা ভোটদাতাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, ভোটদাতারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে।

নির্বাচন ব্যবস্থা



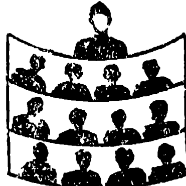
প্রতি ৫ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন হয়। কম পক্ষে ২১ বছর যাদের বয়স তাদেরই ভোটের অধিকার আছে।



রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করেন।

ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন

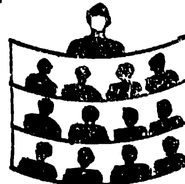




লোকসভা

ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন





রাজ্যবিধানসভা

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, কতকগুলি রাজ্য লইয়া ইহা গঠিত। ভারতের অঙ্গীভূত রাজ্যগুলিকে ইংরাজীতে State বলে। তাই আমাদের সংবিধান ভারতকে বলা হইয়াছে 'Union of states' বা সংক্ষেপে Indian Union। বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মোট ১৪টি রাজ্য লইয়া গঠিত ; যথা—অন্ধ্র, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ।

এইগুলি ছাড়া আরও ৭টি রাজ্য আছে যাহাদের অবস্থা কিছুটা স্বতন্ত্র। এই রাজ্যগুলি হইল—দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা ও মাল দ্বীপপুঞ্জ, নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চল,—এই ৭টি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার

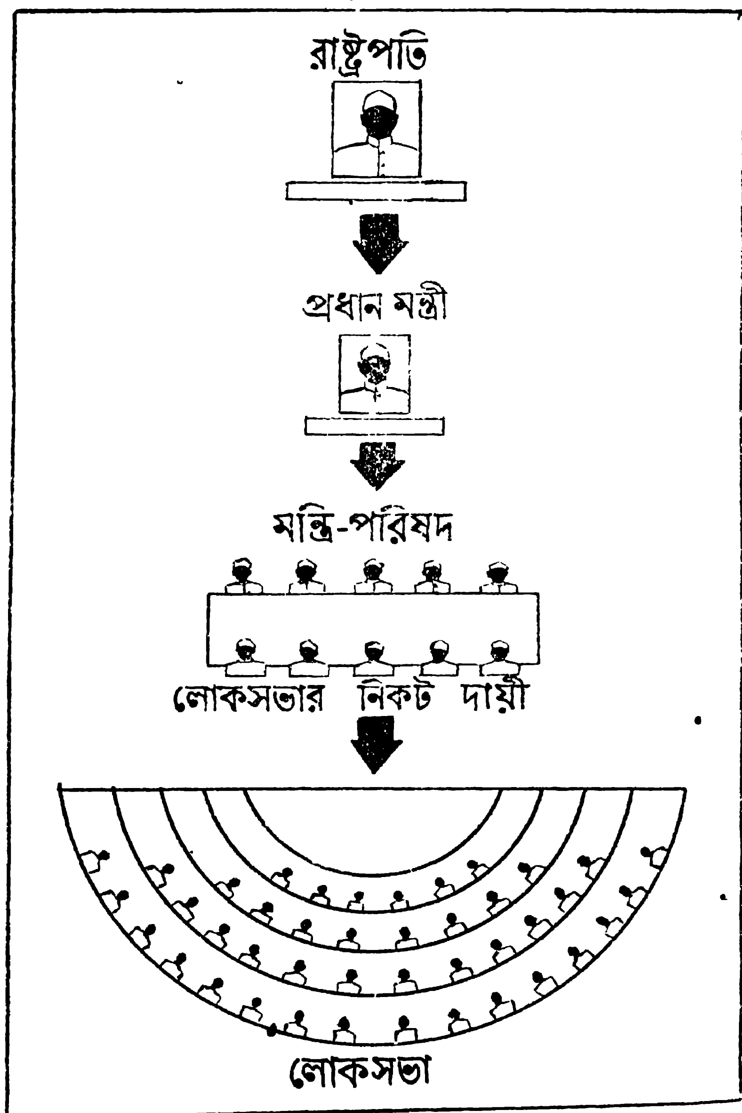
ভারতীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি বিভাগ আছে—শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ। শাসন-বিভাগ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি-পরিষদ এবং আইন-বিভাগ রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেণ্ট (বা সংসদ) লইয়া গঠিত।

আইনত রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা হইলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রি-পরিষদ আছে। কার্যত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রি-পরিষদ দেশের শাসনকার্য চালনা করে, সরকারের নীতি ও কার্যসূচী স্থির করে। অবশ্য মন্ত্রি-পরিষদের এইসব কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারই নামে দেশ শাসিত হয়। সরকারের নির্দেশ, হুকুম ইত্যাদি তাহার নামেই জারী হয়। তিনিই রাজ্যপাল, চীফ কমিশনার, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ, কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল, নির্বাচন কমিশনার, বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। ইহাদের বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার হাতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব কর্মচারীদের মনোনয়ন করেন মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার মনোনীত ব্যক্তিদের অনুমোদন করেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ কোন গোলযোগের কারণে ভারত বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। জরুরী অবস্থায় তিনি স্বয়ং শাসনবিষয়ক নিদেশ দিতে পারেন। কোন রাজ্যে শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভব হইতেছে না মনে করিলে, তিনি সেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদ

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের লইয়া মন্ত্রি-পরিষদ গঠিত হয়। লোকসভার দলগুলির মধ্যে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রি-পরিষদের প্রধান ব্যক্তি। কোন্ মন্ত্রীকে কোন্ দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে তাহা তিনিই স্থির করেন। তিনি লোকসভারও নেতা। মন্ত্রি-পরিষদের বিভিন্ন দপ্তর আছে, যথা—স্বরাষ্ট্র দপ্তর, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, অর্থ দপ্তর, বৈদেশিক দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ইত্যাদি। বিভিন্ন দপ্তরের ভার


কেন্দ্রীয় সরকার
রাষ্ট্রপতি
প্রধান মন্ত্রী
মন্ত্রি-পরিষদ
লোকসভার নিকট দায়ী
লোকসভা

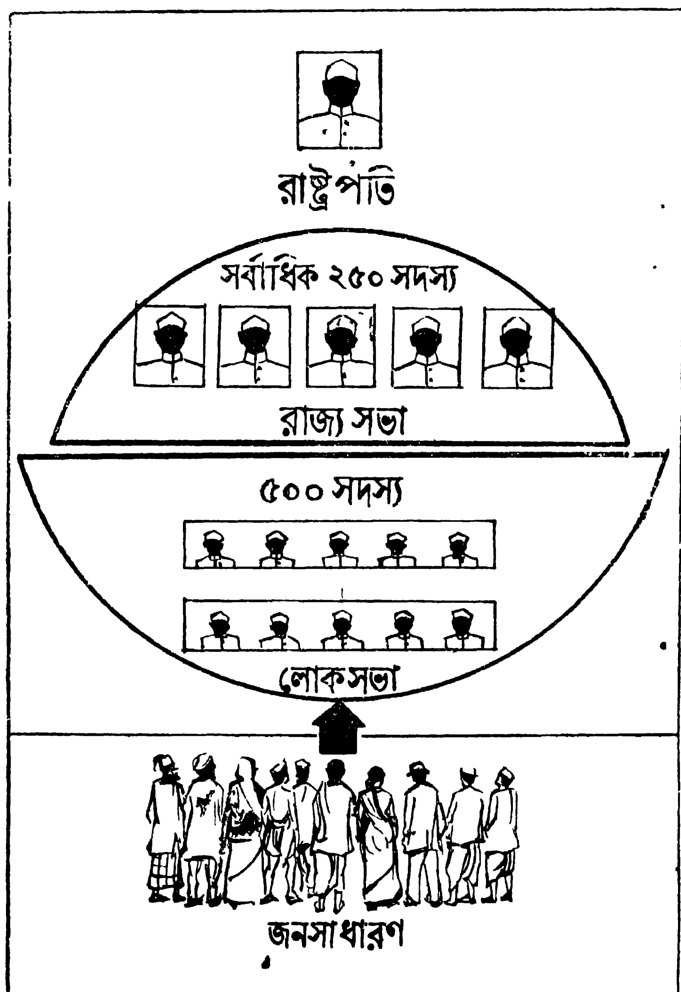
বিভিন্ন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তরের কাজ পরিচালনা করেন। নীতিগত প্রশ্নে কিন্তু মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের তখন সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদের অনুমোদন লইতে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পুলিশের সংখ্যা বাড়াইবার আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু পুলিশের হাতে নাগরিকদের বিনা বিচারে আটক করিবার ক্ষমতা দিতে হইলে তাঁহাকে সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। ইহার ফল কি হইয়াছে? ইহার ফলে শাসনসংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রি-পরিষদকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিতে হয়, কোন মন্ত্রী খেয়াল-খুশিমত কাজ করিতে পারেন না। লোকসভার নিকট মন্ত্রি-পরিষদের যৌথ দায়িত্ব। প্রত্যেক মন্ত্রী অপর সকল মন্ত্রীর কাজের জন্য লোকসভার নিকট দায়ী। তাই কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকসভা অনাস্থা-প্রস্তাব পাস করিলে, কিংবা তাঁহার কার্য অনুমোদন না করিলে সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদই পদত্যাগ করেন।

ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা সংসদ

রাষ্ট্রপতি এবং দুটি সদন লইয়া ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা সংসদ গঠিত। উচ্চ সদন রাজ্যসভা এবং নিম্ন সদন লোকসভা নামে অভিহিত। রাষ্ট্রপতি এবং পার্লামেণ্ট লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের আইন-বিভাগ গঠিত।

লোকসভা পাঁচ বৎসরের জন্য গঠিত হয়। ইহার সদস্য সংখ্যা ৫০০ শত। রাজ্যগুলির ভোটদাতারা ইহাদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করেন। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ, ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক তৃতীয়াংশ পদত্যাগ করে। তখন পুনরায় নির্বাচন দ্বারা এই শূন্য আসনগুলি পূরণ করা হয়। ইহার

সদস্য সংখ্যা ২৫০। ইহারা কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে ভোটদাতাদের দ্বারা



নির্বাচিত হন না। ইহাদের মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন।

অন্যান্য সদস্যগণ বিভিন্ন সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। বাজ্যের বিধান সভার সদস্যগণ ইহাদের নির্বাচিত করেন।

রাজ্য সরকার

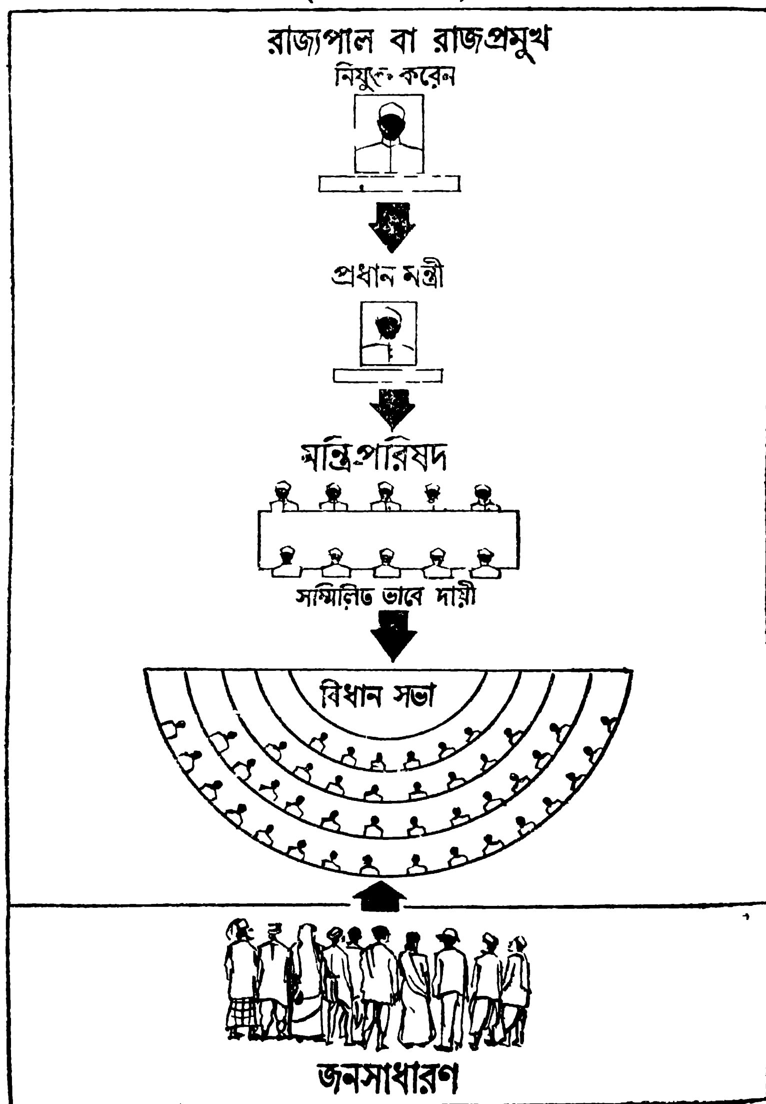
পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভারতীয় ইউনিয়ন সরকার বা রাজ্য লইয়া গঠিত। এই রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা এইভাবে চলে।

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। এই রাজ্যে একজন রাজ্যপাল আছেন, তাঁহার হস্তে রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত। তাঁহার নামেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু কাযত তিনি মন্ত্রিসভাব পরামর্শ অনুযায়ী কাজ কবেন।

বাজ্যে একটি মন্ত্রিসভা আছে। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রার পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিগণ বাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। মন্ত্রিগণ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর ভাগ করিয়া নেন : যথা—অর্থ-দপ্তর, শিক্ষা-দপ্তর, খাদ্য-দপ্তর, সাহায্য ও পুনবাসন বিভাগ, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগ, পূত বিভাগ, কৃষি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ ইত্যাদি। মন্ত্রিগণ রাজ্যের আইনের প্রস্তাব রচনা করিয়া আইন সভায় পেশ করেন। রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব, নূতন কর (Taxes) ইত্যাদি মন্ত্রীরা স্থিব করেন, অবশ্য এই বিষয়গুলি আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। মন্ত্রীরা ইচ্ছামত কর ধার্য করিতে পারেন না ; কিংবা কোনও আইন চালু করিতে পারেন না।

আইনসভাই আইনকানুন পাস করে। পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার দুটি সদন—বিধানসভা ও বিধান পরিষদ। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ২৩৮ জন। ইহারা ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ

রাজ্য সরকার
(ক ও খ শ্রেণী)



নির্বাচিত হন। কিন্তু এই নির্বাচনে ভোটদাতারা অংশ গ্রহণ করেন না। বিধানসভার সদস্যগণ ইহাদের নির্বাচন করেন। এই প্রথাকে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা বলে। বিধান পরিষদ একটি স্থায়ী সদন। রাজ্যপাল ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। তবে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং নূতন নির্বাচন দ্বারা এই শূন্য আসনগুলি পূরণ করা হয়। সাধারণত বিধান সভা কোন আইনের খসড়া বা বিল (Bill) পাস করিয়া উহা বিধান পরিষদে প্রেরণ করে। যদি বিধান পরিষদ বিলটি অগ্রাহ্য করে বা তিন মাসের মধ্যে বিলটি পাস না করে, তাহা হইলে উহা বিধান সভায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিধান সভা বিলটি পাস করিলে, বিধান পরিষদ অনুমোদন করুক বা না করুক, উহা আইনে পরিণত হইবে। অর্থবিষয়ক বিল বিধান সভায় প্রথম উত্থাপিত হইবে। বিধান সভায় গৃহীত হইলে উহা বিধান পরিষদে প্রেরিত হইবে। বিধান পরিষদ ১৪ দিনের মধ্যে এই বিল গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারে। পরিষদ ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি পাস করিলে, উহা সরাসরি সভ্যগণের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হইবে।

রাজ্যের মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে বিধান সভার নিকট দায়ী। বিধান সভার সদস্যগণ কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিলে কিংবা তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের খসড়া অগ্রাহ্য করিলে, সমগ্র মন্ত্রি-সভাই পদত্যাগ করে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন

আমরা দেখিয়াছি যে ভারতীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট বা সংসদ সারা দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে; আবার রাজ্যগুলির আইনসভাও নিজ নিজ রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে পার্লামেণ্ট এবং কোন বিষয়ে রাজ্যের আইন সভা আইন

পাস করিবে ? উভয়ে কি একই বিষয়ে আইন পাস করিবে ? উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কি ভাবে হইবে ?



আমাদের সংবিধান এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে সারা ভারতের এক স্বার্থ, এক সমস্যা। এই সকল বিষয়ে কেবল মাত্র পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী। আমাদের সংবিধানে এই বিষয়ের ৯৭টি বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাকে বলা হয় Union List, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের খাস এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের তালিকা। এই তালিকাভুক্ত ৯৭টি বিষয়ের মধ্যে আছে—দেশরক্ষা, সামরিক ও বিমানবাহিনী, যুদ্ধ ও শান্তি, বৈদেশিক সম্পর্ক, রেলপথ, মুদ্রাব্যবস্থা, ডাক-তার-বেতার, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি। এই তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, কেন ইহা কেন্দ্রের খাস এক্তিয়ারভুক্ত। দেশরক্ষার ব্যবস্থা স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকার করিতে পারেন, একটি প্রাদেশিক রাজ্য উহা পারে না। রেল গাড়ী সারা ভারতের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, তাই রেলবিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। সারা ভারতে একই মুদ্রাব্যবস্থা, (টাকা, আনা, পয়সা) প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাই মুদ্রাব্যবস্থা কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত। অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ, ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। এই সকল বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়নের অধিকারী। সংবিধানে এইরূপ ৬৬টি বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাকে বলা হয় State list, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের তালিকা। এই তালিকাতে আছে, পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান, কৃষি, ভূমিরাজস্ব, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই সমানভাবে সংশ্লিষ্ট। এই সকল বিষয়ে উভয়ই আইন করিতে পারে। সংবিধানে এই ধরনের ৪৭টি বিষয়ের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাকে বলা হয় Concurrent List বা যুগ্ম-তালিকা। ইহাতে আছে—ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কারখানা ও শ্রমিক সমস্যা, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ইত্যাদি। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোন বিরোধ বাধিলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনই বলবৎ হইবে। পার্লামেন্ট প্রয়োজনবোধে রাজ্যতালিকাভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতেও পারিবে।

দৈনন্দিন শাসনকার্য

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কি ভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই সুবিশাল দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য কি ভাবে চলে? আইনকানুন কি ভাবে কার্যে পরিণত হয়? কাহারা এইগুলি কার্যে পরিণত করেন।

মন্ত্রিগণ আইনকানুনের খসড়া রচনা করেন, আইনসভা ঐগুলি অনুমোদন করিলে তবে আইনকানুন পাস হয়। তারপর আসে আইনকানুন দেশে চালু করার কাজ। কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন দপ্তর স্থাপিত হয়। এই দপ্তরগুলির কাজ আমরা পূর্বে বলিয়াছি। বিভিন্ন দপ্তরে একজন মন্ত্রী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপমন্ত্রী থাকেন। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সাধারণ একদল কর্মচারী থাকেন। বিভিন্ন বিভাগে এইরূপ হাজার হাজার কর্মচারী নিযুক্ত হন। তাঁহারাই দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। রাজধানী-

নয়াদিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট ভবনে এইরূপ শত শত কর্মচারী প্রতিদিন বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্ম করিয়া চলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসে এবং নবনির্মিত দৈত্যকায় নূতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে ও রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শত শত কর্মচারী কাজ করেন। বিভিন্ন বিভাগে একজন সেক্রেটারী (বা সম্পাদক), একজন ডেপুটি সেক্রেটারী এবং একদল কর্মচারী থাকেন। বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ইহাদের সাহায্যে দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। কর্মচারীদের মধ্যে একদল কেন্দ্রীয়ভাবে রাইটার্স বিল্ডিংস্ বা নূতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে কাজ করেন, আর একদল জেলায় জেলায় কাজ করেন। এই সকল কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, বিভাগীয় কর্মচারীদের দায়িত্ব বিরাট। ইহাদেরই উপর আইনকানুন রূপায়ণের ভার। কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ বা অযোগ্য হইলে কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা আসিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। এই রাজ্যে বাস্তুহারা সমস্যা অতি জটিল এবং দুরূহ। বাস্তুহারা পুনর্বাসনের জন্য তাই একটি বিভাগ আছে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা এই বিভাগ হইতে ব্যয় হয়। বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব এই বিভাগের উপর। একজন মন্ত্রী, একজন উপমন্ত্রী, কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই বিভাগে কাজ করেন। ইহারা যদি বাস্তুহারাদের জন্য গৃহনির্মাণের টাকা আত্মসাৎ করেন; ইহারা যদি অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ কণ্ট্রাক্টর বা ঠিকাদার নিয়োগ করেন; ঠিকাদাররা যদি গৃহগুলি এমনভাবে নির্মাণ করেন যে এক বৎসরের মধ্যেই ঐ সকল গৃহের ছাদে বা দেওয়ালে ফাটল ধরে; বাস্তুহারা কলোনীতে যদি ১০০ শত টিউবওয়েল খননের জন্য টাকা লইয়া কর্মচারীরা মাত্র ৫০টি টিউবওয়েল খনন করেন—এইরূপ

বহু সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে যদি কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ হন। অবশ্য দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রমাণিত হইলে, তাঁহাদের শাস্তির বিধান আছে। দুর্নীতি দমনের জন্য সরকার তাই দুর্নীতিদমন বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন।

শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ

আমাদের শাসনযন্ত্রের মূল ঘাঁটি হইল জেলার শাসন-ব্যবস্থা। কি ভাবে দেশ শাসিত হইবে মন্ত্রীরা সেই নীতি নির্ধারণ করেন, আর সেই নীতি অনুসারে জেলার দৈনন্দিন শাসনকার্য চালান জেলা শাসকেরা।

জেলা শাসকদের বলা হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁহার প্রথম কাজ হইল জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। জেলার পুলিশ বিভাগের ভার থাকে পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডেন্টের উপর। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। কালেক্টর হিসাবে জেলা শাসকের কাজ হইল জেলার ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য কর সংগ্রহের কার্য পরিচালনা করা। জেলার আয়-ব্যয়ের হিসাব তাঁহাকেই প্রস্তুত করিতে হয়। জেলাশাসককে তাই সরকারের "চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-মুখ" বলা হয়।

প্রত্যেক জেলা আবার কতকগুলি মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমা শাসকের নাম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা Sub Divisional Officer (S. D. O.)। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি একাধিক কর্মচারী আছেন। প্রত্যেক মহকুমা আবার কতকগুলি সার্কেলে এবং প্রত্যেক সার্কেল কতকগুলি থানায় বিভক্ত। সার্কেলে একজন করিয়া সার্কেল অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর থাকেন। প্রতি থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হইলেন থানার দারোগা।

বিচার বিভাগ

আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে এই সুবিচার পাইতে পারেন, তাহার জন্য কেন্দ্র হইতে একেবারে গ্রাম পর্যন্ত সুবিস্তৃত এক বিচার-ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্ট, আর সর্বনিম্ন স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিচার-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ধরা যাক। এই রাজ্যে হাইকোর্ট হইল সর্বোচ্চ আপীল আদালত। হাইকোর্টের নীচে প্রত্যেক জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য একাধিক বিচারালয় আছে। জেলা সহরে ও মহকুমা সহরে মুন্সেফের আদালত আছে। এই সব আদালতে দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য জেলা সহরে এক বা একাধিক সাবজজ থাকেন। ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য জেলা ও মহকুমা সহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। জেলার প্রধান বিচারক জেলা ও দায়রা জজ।

সাব জজ ও জেলা জজদের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা চলে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ধরনের মামলার আপীল হাইকোর্ট গ্রহণ করে।

যদি কোন বিষয়ে একজন নাগরিক হাইকোর্টেও সুবিচার না পায় তাহা হইলে কি হইবে? সে তখন সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পারে। ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের যে কোনও মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক যেসব আদেশ জারী করা হয়, ভারতের অন্য সমস্ত আদালত তাহা মানিতে বাধ্য।

অনুশীলনী

১। ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এই কথার অর্থ কি ?

২। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা কেন বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। রেল-ডাক-তার, কৃষি, ভূমিরাজস্ব, দেশরক্ষা—এইগুলিব মধ্যে কোন্‌টি কেন্দ্রের এবং কোন্‌টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত ?

৪। পশ্চিমবঙ্গের আইনকানুন কি ভাবে পাস হয় ?

৫। মন্ত্রিগণ কি কি কাজ করেন? একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন কেন ?

৬। বিধান সভার কাজ কি ?

৭। রাইটার্স বিল্ডিংসে একদল কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে কেন ? রাজ্যের শাসনকার্যে ইহাদের গুরুত্ব কি ?

৮। আদালত থাকাতে নাগরিকদের কি সুবিধা হইয়াছে ?

৯। জেলার শাসন-ব্যবস্থা কি ভাবে চলে ?

১০। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

অশুদ্ধ বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ

১। আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই।

২। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক যে সব আদেশ জারী করা হয়, ভারতের অন্য সমস্ত আদালত তাহা মানিতে বাধ্য নহে।

৩। প্রতি থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হইলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

৪। রাজ্যের মন্ত্রিসভা সম্মিলিত ভাবে বিধান সভার নিকট দায়ী নহে।

৫। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ নহে, ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়।

৬। আইনত ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা হইলেন প্রধানমন্ত্রী।

৭। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন।

৮। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা আইন কানুন পাস করে।

৯। মন্ত্রিসভা ইচ্ছামত কর ধার্য করিতে পারে।

১০। মন্ত্রিসভা রাজ্যপালের নিকট সম্মিলিত ভাবে দায়ী।

১১। দেশরক্ষা, রেলপথ, মুদ্রাব্যবস্থা, পুলিশ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যের আইনসভা আইন প্রণয়ণ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্ক

সহস্র সহস্র বৎসব ধবিয়া এই পৃথিবীব বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন লোক-সমাজ এক সুখী, সমৃদ্ধ ও সুন্দব জীবন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কবিতেছে। প্রাকৃতিক পবিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় এবং ঐতিহাসিক কাবণে তাহাদেব জীবনযাত্রা বিভিন্ন হইয়াছে। কোন কোন লোকসমাজ আধুনিক বিজ্ঞানকে মানুষেব প্রয়োজনে ব্যবহাব কবিযা, কৃষি ও শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে উন্নত কবিয়া এত উন্নত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকাব লোকসমাজগুলি কিন্তু আজও সাধাবণভাবে অনুন্নত অবস্থায় বহিয়াছে। আধুনিক যুগে বেলপথ, জলপথ ও বিমানপথেব বিপুল উন্নতিব ফলে বর্তমানে পৃথিবীব লোকসমাজগুলি পবস্পবেব কাছাকাছি আসিয়াছে, তাহাবা এখন সহজে এবং দ্রুত নিজেদেব মধ্যে সংযোগ স্থাপন কবিতে পাবে। অন্যান্য প্রাকৃতিক অঞ্চল হইতে তাহাবা প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পবিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি আমদানি কবিয়া নিজেদেব চাহিদা পূবণ কবিতে পাবে। এক দেশেব সাংস্কৃতিক সম্পদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্য দেশেব মানুষ লাভ কবিতে পাবে। বহির্বিশ্বেব সহিত সম্পর্কস্থাপন তাই আজ প্রতিটি দেশেরই পক্ষে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহির্বিশ্বেব সহিত সম্পর্কস্থাপনেব মাধ্যমেই পৃথিবীব বিভিন্ন লোকসমাজ বর্তমানে নিজেদেব জীবনযাত্রা উন্নত করিতে পাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাই বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইহা কিন্তু আধুনিক যুগের একটি বৈশিষ্ট্যই নহে। প্রাচীন ও মধ্য-যুগেও পৃথিবীর নানা দেশের সহিত নানাভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা কি দেখি? খ্রীষ্টের জন্মের ৩২৫ বৎসর পূর্বে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের সময় হইতে প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি গ্রীসের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণেই গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি। ভারত হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চীন দেশ হইতে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎ-সিঙ ভারতে আসিয়াছিলেন, আবার ভারত হইতেও একদল পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রোম এবং ভারতের মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সেই সুদূর অতীতে যানবাহনের ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত থাকা সত্ত্বেও ভারতের সহিত গ্রীস, রোম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্যযুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। এই যুগে আরব ও তুর্কী, পারসিক ও মোঙ্গল, পর্তুগীজ ও ইটালীয় প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আরব, পারস্য, মিশর, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। আধুনিক যুগে যান-বাহনের উন্নতির ফলে দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ, রুশ, আমেরিকান প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতের সম্পর্কস্থাপন অনেক সহজ হইয়াছে। এই ভাবেই প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত নূতনভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে অগ্রসর হইয়াছে।

রাজনৈতিক সম্পর্ক

বর্তমান যুগে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে কিভাবে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করিবে, উহাই রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয়। নানা কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ বাধিতে পারে, এই সকল বিরোধের প্রশ্নে দেশের মনোভাব কি হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে অন্য দেশগুলি কোন্ পক্ষে যোগদান করিবে, কিংবা নিরপেক্ষ থাকিবে তাহা স্থির করিতে হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং উহার পরিণতিতে রক্তাক্ত যুদ্ধের বিষয় আমরা পড়ি। বর্তমান যুগে তাই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপর দেশের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে।

স্বাধীন ভারত পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স লোকতন্ত্রী চীন, প্রভৃতি শক্তিশালী দেশগুলি এবং প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারত দূতাবাস (Embassy) স্থাপন করিয়াছে। দূতাবাসে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং একদল কর্মচারী কাজ করেন। রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই ভারত বিভিন্ন দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিও ভারতে দূতাবাস স্থাপন করিয়াছে। রাজধানী নয়া দিল্লীতে ইংলণ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, লোকতন্ত্রী চীন, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশগুলির দূতাবাস আছে।

রাজনৈতিক সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক। পাকিস্তান ও ভারত দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। পাকিস্তানে বহু হিন্দু এবং মুসলমান বাস করে। ইহাদের উপর যদি কখনও জুলুম ও অত্যাচার চলে, যদি ইহাদের সম্পত্তি হরণের কখনও কোন ষড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চলে তাহা হইলে ইহার প্রতিকারের উপায় কি? রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানে কোন অপ্রাতিকর ঘটনা ঘটিলে ভারত ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে উহা অবহিত করেন এবং তাঁহার মাধ্যমে পাকিস্তানের সরকারের সহিত যোগাযোগ করেন; ভিসা, পাসপোর্ট, সম্পত্তি স্থানান্তর প্রভৃতি বিবিধ জটিল, অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির এইভাবেই মীমাংসা হয়।

পাকিস্তানের মত ইংলণ্ড, আমেরিকা, ব্রহ্ম, সিংহল, মালয় প্রভৃতি দেশেও বহু ভারতীয় বাস করে। ঐ সকল ভারতীয় ভারতীয় দূতাবাসের মারফত তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভদ্রভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যেকার নানা বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে।

অবশ্য এমন বিষয় আছে যাহা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, উহা রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে আলোচনা করা কিংবা মীমাংসা করা সম্ভব নয়। তখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সরাসরি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি যথা গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকার ঘানা, মালয় প্রভৃতি দেশের প্রধান মন্ত্রীরা, একটি সম্মেলনে মিলিত হন, উহার নাম কমনওয়েলথ সম্মেলন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতারা বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করেন। তোমরা নিশ্চয়ই

জান যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করিয়া আসিয়াছেন, আবার সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, গ্রেট ব্রিটেন, ভিয়েৎনাম, জাপান, ব্রহ্ম, সৌদি আরব, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রনেতারা ভারতে সফর করিয়া গিয়াছেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক

শুধু রাজনৈতিক সম্পর্কই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে। এক সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দিনের পর দিন সম্প্রসারিত হইতেছে। এক দেশের পণ্য সম্ভার অন্য দেশে রপ্তানি হইতেছে। পণ্য আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমেই পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজ দৈনন্দিন জীবনের নানা চাহিদা পূরণ করে। ভারত হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ চা ও পাটজাত দ্রব্য পায়, আবার আমেরিকা, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলি হইতে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলি যন্ত্রপাতি, কলকব্জা (যথা ইঞ্জিন, বয়লার, কাপড়ের কল, ইত্যাদি) আমদানি করে। এই বাণিজ্যধারা ব্যাহত হইলে বিভিন্ন লোকসমাজগুলির জীবনে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিবে। সুখী ও উন্নত জীবন গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হইতে লোকসমাজগুলি তখন বঞ্চিত হইবে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। পূর্বে ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ। ফলে ভারতের পক্ষে স্বাধীন

ভাবে অন্য দেশের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় নাই। ব্রিটেনের স্বার্থে, ব্রিটেনের সুবিধামত ভারতের বাণিজ্য চলিত। বর্তমানে ইহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারত ভারতবাসীর জীবনকে উন্নত করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিচালিত করিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত ভারত বাণিজ্য-চুক্তি (Trade agreement) করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ফলে ঐ সকল দেশের সহিত ভারতের নিয়মিত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলিতেছে।

শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সোভিয়েট রাশিয়া, জার্মানী ও ইংলণ্ডের সহিত চুক্তি করিয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েট রাশিয়া মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ভিলাইতে একটি সুবৃহৎ ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করিতেছে। সম্প্রতি এই কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সোভিয়েট রাশিয়াই এই কারখানা নির্মাণের সম্পূর্ণ খরচ বত মানে বহন করিয়াছে। ইহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (Long-term loan) হিসাবে গণ্য হইবে। ভারত-সরকার কিস্তিতে কিস্তিতে এই ঋণ সুদসহ পরিশোধ করিবেন। পশ্চিম জার্মানীর সাহায্যে ভারত-সরকার উড়িষ্যার অন্তর্গত রুরকেল্লায় এবং ব্রিটেনের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দুর্গাপুরে আরও দুটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিতেছে। রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানাটির উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে।

বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতে বাণিজ্যাবাস (Trade agencies) স্থাপন করিয়াছে। উহাদের মারফতেই ভারত-

সরকার বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক নানা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহা অনেক দেশেরই নাই। ঋণ সংগ্রহ করিয়া এই প্রয়োজন পূরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ব-ব্যাঙ্ক (World Bank) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে ঋণ দেয়। ভারত বিশ্ব-ব্যাঙ্ক হইতে প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করিয়াছে এবং বর্তমানে করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুন্নত দেশগুলিকে ঋণ প্রদান করে। ভারত উক্ত দেশ হইতেও প্রচুর ঋণ সংগ্রহ করিয়াছে। অবশ্য এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

শুধু অর্থনৈতিক উন্নতিই নয়, সাংস্কৃতিক উন্নতিও সভ্য মানুষের একান্ত কাম্য। দেশবিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত ধারার সহিত পরিচিত হইয়া লোকসমাজগুলি নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিতে পারে। ইহারই জন্য বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। নিজ দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া ভাল, কিন্তু তাই বলিয়া অপর দেশের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার মনোবৃত্তি সর্বদা নিন্দনীয়। পশ্চিমের সংস্কৃতির যাহা কিছু ভাল, তাহা গ্রহণ করিয়াই আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করিতে পারি।

স্বাধীন ভারত বিদেশের সংস্কৃতিকে অচ্ছুত মনে করে না। বিদেশের সংস্কৃতির সহিত ভারতবাসীকে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা তাই ভারত সরকার করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, লোকতন্ত্রী বুলগেরিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সাংস্কৃতিক

প্রতিনিধিদল ভারতে আসিয়াছেন ঐ সকল প্রতিনিধিদল নৃত্য, নাটক, গান-বাজনা, চিত্রকলার প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবাসীকে তাহাদের দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করিয়াছেন। আবার ভাবত হইতেও বহু প্রতিনিধিদল বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। পৃথিবীব বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (film) এদেশে প্রদর্শিত হয়। ভারতের ছায়াছবিও বিদেশে পাঠান হয়।

ভারতের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থায়ী করিবার জন্য কোন কোন দেশ ভারতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান হইল (United States Information Service সংক্ষেপে USIS)। ভারতের বড় বড় সহরে এই প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার আছে। ঐ সকল পাঠাগারে বিনা মূল্যে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট রাশিয়াও "Tass" (টাস) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন ভাষায় "সোভিয়েত দেশ" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ভাবতবাসীকে পবিচিত করিবার চেষ্টা করেন। বিদেশে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন দেশ ভারতীয় ছাত্রদেব বৃত্তি প্রদান করেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ বিদেশে অবস্থান করিয়া তাহাদের পচ্ছন্দমত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and cultural Organisation সংক্ষেপে UNESCO) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা।

এই ভাবেই বর্তমানে পৃথিবীর লোকসমাজ বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়া নিজ নিজ সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এই ধারা অব্যাহত থাকিলে পৃথিবীর মানুষ পরস্পরকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে।

ভারতের বৈদেশিক নীতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেব সহিত স্বাধীন ভারত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে আমরা উহার আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা ভারতের বৈদেশিক নীতির আলোচনা করিব।

হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া তোলাই ভারতে বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য। ভারত সরকার মনে করে যে, বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে, সুতরাং বিশ্বশান্তি অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। ১৯৫৬ সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সুবিখ্যাত "পঞ্চশীল" নীতি প্রচার করিয়াছেন। পঞ্চশীলের নীতিগুলি হইল এই যে, একটি দেশ অপর কোন দেশকে আক্রমণ করিবে না, একটি দেশ অপর দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ কবিবে না, একটি দেশ অপর দেশের সার্বভৌমত্বকে শ্রদ্ধা করিবে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ নিজেদের বিরোধের মীমাংসা করিবে ইত্যাদি। বিগত কয়েক বৎসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ "পঞ্চশীল" এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে ভারত কি ভাবে এই শান্তি-নীতি প্রয়োগ করিতেছে তাহা দেখা দরকার। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, গোয়া একটি পর্তুগীজ

উপনিবেশ। স্বাধীন ভারতের একটি অংশে বিদেশী শক্তির এই আধিপত্য আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু গোয়ার প্রশ্নে ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর লইয়া ভারতের বিরোধ আছে। কাশ্মীরের একটি অংশে পাকিস্তান সরকারের সাহায্যপুষ্ট একটি সামরিক বাহিনী আজও অধিষ্ঠিত আছে। কাশ্মীরে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া পাকিস্তান কাশ্মীর দাবি করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৭ সনে এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কিন্তু এই যুদ্ধ বন্ধ হইবার পরে ভারত কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানের চেষ্টা করিতেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত শান্ত-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী বর্তমানে দুই শিবিরে বিভক্ত—একটি শিবিরে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি, অপর শিবিরে আছে সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। ভারত কিন্তু এই দুটি শিবিরের কোনটিতেই যোগদান করে নাই। উভয় শিবিরের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলাই ভারতের নীতি।

ভারত পররাজ্য আক্রমণের বিরোধী। কোন শক্তিশালী দেশ কোন দুবল দেশকে আক্রমণ করিয়া উহার স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা করিলে ভারত আক্রমণকারী দেশের বিরোধিতা করিবে। কিছুকাল পূর্বে (১৯৫৭ সনে) ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মিশরের স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়াছিল। ভারত তখন মিশরের পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করিয়া স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি উহার শ্রদ্ধা

ঘোষণা কবিয়াছিল। বাগদাদ চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি (SEATO) প্রভৃতি সামরিক চুক্তিতে ভাবত অংশ গ্রহণ কবে নাই।

রাষ্ট্রসংঘ

তোমবা ইতিহাসের বইতে পডিযাছ যে, বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বযুদ্ধে মাবা গিয়াছে। কোটি কোটি ঘববাডী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৯৪৫ সনেব ৬ই আগস্ট আমেবিকা জাপানেব হিবোশিমা নগবে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ কবিবাব



সানফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলন

ফলে মুহূর্তেব-মধ্যে ঐ নগরী ধ্বংসস্তূপে পবিণত হয় এবং উহাব ৬০ হাজার নরনারী মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা ও রক্তপাত হইতে পৃথিবীব মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ১৯৪৫ সনেব ২৬শে জুন

সানফ্রান্সিস্‌কোতে পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organisation, সংক্ষেপে U. N. O.) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছেন। ভারত এই রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম সভ্য। পুরান লীগ অব নেশনস্‌-এর মত এই নূতন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করা এবং বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা।

রাষ্ট্রসংঘের একটি নিরাপত্তা পরিষদ (Security Coun[illegible]) আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন, মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও চীন ইহার স্থায়ী সদস্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব এই পরিষদের হাতে ন্যস্ত। কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে হইলে এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের **সর্ববাদী সম্মতি** প্রয়োজন। ইহার একজন [illegible]দস্য পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্তকে ‘ভেটো’বা বাতিল করিতে পারে। অর্থাৎ বৃহৎ পাঁচটি শক্তির মতৈক্যের উপরই কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়া নির্ভর করে। বিশ্বশান্তি রক্ষার কার্যে রাষ্ট্রসংঘ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। ইহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হইল কাশ্মীর, কোরিয়া ও [illegible]য়েৎনামের যুদ্ধ বন্ধ করা। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, রাষ্ট্রসংঘ সকল বিরোধেরই মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর দুটি শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ হয় নাই। বৃহৎ শক্তিগুলি এ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, এবং উহার পরীক্ষা চালাইতেছে। উহারা বিরাট সামরিক বাহিনী পুষিতেছে এবং আধুনিক নানা মারণাস্ত্রে সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করিতেছে। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সামরিক খাতে প্রচুর অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছে। সামরিক চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ জোট গঠিত হইয়াছে যথা বাগদাদ চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি ইত্যাদি।

অর্থাৎ পৃথিবীতে যুদ্ধের বিপদ কাটে নাই, আবার আর একটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া মানুষ এবং উহার সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধের বিপদ থাকিলেও মানুষের চেতনাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভীষণ ধ্বংসলীলার স্মৃতি মানুষের অন্তরে গাঁথা আছে। পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষ বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ক্রমশ মানুষের মধ্যে বিশ্বমানবতা-বোধ জাগ্রত হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া মানুষ আজ এক সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের জন্য আগ্রহশীল। মানুষের মধ্যে বিশ্বমানবতাবোধ আরও দৃঢ়, আরও শক্তিশালী হইলে পৃথিবী যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইবে, এক সুন্দর আনন্দময় জগৎ গড়িয়া উঠিবে।

অনুশীলনী

১। ভারত বিভিন্ন দেশে দূতাবাস স্থাপন করিয়াছে কেন?

২। রাষ্ট্রদূতদের কি কি কাজ করিতে হয়?

৩। বিদেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করিয়া ভারতের কি সুবিধা হইতেছে?

৪। ভারত কোথা হইতে ঋণ সংগ্রহ করে?

৫। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কি ভাবে রক্ষিত হয়?

৬। ভারতের বৈদেশিক নীতি যে শান্তিকামী তাহার প্রমাণ কি?

৭। গোয়া ও কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের নীতি কি তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

৮। মানুষ যুদ্ধ চায় না কেন? বিশ্বশান্তি মানুষের প্রয়োজন কেন?

৯। বিশ্বশান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কি?

১১। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :

১। বিদেশের সহিত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভারত রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশে———স্থাপন করিয়াছে।

২। শিল্প ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারত বিভিন্ন দেশের সহিত——— করিয়াছে।

৩। সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে———তে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৪। রুরকেল্লায———সাহায্যে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

৫। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে শিল্পোন্নতির জন্য———ঋণ দেয়।

৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রাষ্ট্র-সংঘ———নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছে।